

CUK-1105228-44-P3062

সংখ্যা-২-৪

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা)

[চতুস্তত্রিংশ ভাগ]

756.3
.025

44



পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

২৪৩১, আপার সাকুলার রোড,
কলিকাতা।

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত।

১৯৪৪ বঙ্গাব্দ

P 30692

চতুশ্চত্বারিংশ ভাগের

সূচীপত্র

—:0:—

প্রবন্ধ	লেখকের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৪৭
কবি পীতাম্বর মিত্র ও জনমেজয় মিত্র— ঐ	...	১০
কালীপ্রসন্ন সিংহ— ঐ	...	৮২
ক্যাপ্টেন জেম্‌স্‌ ষ্টুয়ার্ট— ... ঐ	...	৬০
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য— ... ঐ	...	১১
(প্রথম বাঙালী সাংবাদিক)		
গৌড়েশ্বরের আদেশে রচিত বিজ্ঞানন্দর—আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ	...	২২
চণ্ডীদাস (আলোচনা)—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিহঙ্গলভ	...	৩৩
বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৪৬
বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের বয়স—ডক্টর শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত ডি এম্‌সি	...	১৮৬
বৌদ্ধ অপদান—ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম্‌ এ, বি এল, পি-এচ্‌ ডি	...	৬৮
মল্লসারুলে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাত্ত্বশাসন—শ্রীনীলগোপাল মজুমদার এম্‌ এ...	...	১৭
সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম্‌ এ	...	৩৯
সে কালের ব্রাহ্মণপণ্ডিত—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৫
হিন্দুজ্যোতিষে শককাল—ডক্টর শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত ডি এম্‌-সি	...	১১৯
হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান—শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল এম্‌ এম্‌-সি	...	১৫১

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য

প্রথম বাঙালী সাংবাদিক

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যাহাদের আলোচনার বিষয় তাঁহাদের গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের নাম অপরিচিত নহে। বাঙালীর মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম স্থাপন করেন, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'বাঙ্গাল গেজেট'ই বাঙালী-পরিচালিত বাংলা সংবাদপত্র। ছুংখের বিষয়, গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে এ-পর্য্যন্ত বিস্তৃত আলোচনা হয়নি,—উপকরণের অভাবই বোধ হয় তাহার কারণ। কিন্তু সেকালের সংবাদপত্রাদি অনুসন্ধান করিলে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য এখনও সংগ্রহ করা অসম্ভব নিস্থের সংগ্রহও প্রাচীন সংবাদপত্রাদি হইতে করা হইয়াছে।

শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানার কম্পোজিটর

গঙ্গাকিশোরের বাড়ী ছিল শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী বহরা গ্রামে। তিনি প্রথমে জিটর-রূপে শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় প্রবেশ করেন। এইখানে তিনি খানার কাজ বিশেষভাবে শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। শ্রীরামপুরে কিছুদিন করিবার পর তিনি স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিবার মানসে কলিকাতায় আসেন।

কলিকাতায় পুস্তক-বিক্রয়ের ব্যবসা

কলিকাতায় আসিয়া গঙ্গাকিশোর পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসারে হাত দিলেন। তখনও কোন বাঙালীর নজর পড়ে নাই। শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' গঙ্গাকিশোর লিখিয়াছিলেন :—

এতদেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গালী পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথমোক্তোগ কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে ইহা দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এত অল্প কালের মধ্যে এতদেশীয় লোকেরদের ছাপার কর্মের এমত উন্নতি হইয়াছে। প্রথম যে পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার নাম অন্নদামঙ্গল শ্রীরামপুরের ছাপাখানার এক জন কর্মকারক শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য তাহা বিক্রয়ার্থে প্রকাশ করেন। (৩০ জানুয়ারি ১৮৩০)

গঙ্গাকিশোর প্রথমে ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানায় বাংলা বই ছাপিতে সুরু করেন; তন্মধ্যে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' উল্লেখযোগ্য; ইহাই বোধ হয় ছাপার হরফে সচিত্র বাংলা পুস্তক। ইহা ছাড়া স্বরচিত দুই-তিনখানি পুস্তকও তিনি প্রকাশ দিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তকের বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। গঙ্গাকিশোরের প্রকাশিত পুস্তকগুলির কাটতি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল; তিনি কলিকাতায় একটি আপিস ও বইয়ের

দোকান খুলিলেন। একটি বিশেষ উপায়ে পুস্তকের ব্যবসায়ে তাঁহার বিলম্ব হইয়াছিল। তিনি বাংলা দেশের প্রধান প্রধান শহর ও পল্লীগ্রামে প্রতিনিধি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; তাহারাই তাঁহার পুস্তকগুলির বিক্রয় বাড়াইয়া দিয়াছিল।

কলিকাতায় দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

দেশীয় লোকদের মধ্যে বাবুরাম নামে এক জন হিন্দুই সর্বপ্রথম খিদিরপুরে দেব অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ ছাপিবার জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র আত্মমানিক ১৮০৬-৭ স্থাপন করেন। তাঁহার ছাপাখানা সংস্কৃত যন্ত্র নামে পরিচিত ছিল। বাবুরাম সারস্বত ব্রাহ্মণ, নিবাস মীর্জাপুরের ত্রিলোচন ঘাটে। এই ছাপাখানার মুদ্রাবন্দন পাল নামে এক জন সদগোপ।

বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্রটি ১৮১৪-১৫ সনে কোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্রজভাষা লল্লুলাল কবি নামে এক জন গুজরাটী-ব্রাহ্মণ কিনিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হইবে। লল্লুলালের ছাপাখানাও সংস্কৃত যন্ত্র নামে পরিচিত ছিল, এবং পূর্বোক্ত বন্দন পালই

* ১৮০৭ সনেও খিদিরপুরে বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যাইতে কৌলজ্যকর আজায় মুদ্রিত, বিদ্যাকর মিশ্রের হৃচিনময়িত 'অমরকোষ'। 'হেমচন্দ্রকোষ'ও বাবুরাম কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮০৮ তারিখে কোর্ট উইলিয়ম কলেজে ৭ম বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষে ভির্জি লর্ড মির্টো যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্র সম্বন্ধে এই অংশটি আছে :—

A printing press has been established by learned Hindoos, furnishes complete founts of improved Nagree types of different sizes, for the print books in the Sunskrit language. This press has been encouraged by the to undertake an edition of the best Sunskrit Dictionaries, and a compilation of the Sunskrit rules of Grammar. The first of these works is completed, and the second, which is in considerable forwardness, will form a valuable of Sunskrit Philology. It may be hoped, that the introduction of printing among the Hindoos, which has been thus begun by the institution of a Sunskrit press, will promote the diffusion of knowledge among this and very ancient people ;..... (Roebuck : *Annals* etc., p. 155.)

† ১৮১৪ সনে প্রকাশিত লল্লুলাল কবি-সঙ্কলিত 'সভাবিলাস' নামক হিন্দী পুস্তকের শেষে এই পরিচয় পাওয়া যায়।

‡ এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে। প্রথমতঃ উভয় মুদ্রাযন্ত্রের নামের সাদৃশ্য; বাবুরাম মুদ্রাকর ছিলেন, সেই বন্দন পালই লল্লুলালেরও মুদ্রাকর ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ১৮১৪ সনের জানুয়ারি মুদ্রিত লল্লুলাল কবি-সঙ্কলিত 'সভাবিলাস' ছাড়া বাবুরামের সংস্কৃত যন্ত্রে তৎপরবর্তী কালে মুদ্রিত কোন পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তৃতীয়তঃ লল্লুলাল কবির সংস্কৃত যন্ত্রে ১৮১৫ সনে (সংবৎ তুলসীদাসের 'বিনয়পত্রিকা' নামগরি অক্ষরে মুদ্রিত হয়; এই ছাপাখানায় তৎপূর্বে মুদ্রিত আর কোন সন্ধান এখনও পাই নাই।

মুদ্রাকর ছিলেন।* সংস্কৃত বা হিন্দী পুস্তক ছাড়া বাংলা পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থাও ললুলাল করিয়াছিলেন। তাঁহারই মুদ্রাযন্ত্রে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রথম গ্রন্থ ‘জ্যোতিষ-সংগ্রহসার’ ১৮১৭ সনের জাল্ফারি মাসে মুদ্রিত হয়। এই পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় আছে :— “শ্রীযুক্ত কবীশ্বর শ্রীমদন পালেনাক্ষিতম্”। ললুলালের সংস্কৃত যন্ত্র পটল-ডাকায় অবস্থিত ছিল।

তখন পর্য্যন্ত কোন বাঙালীই মুদ্রাযন্ত্র-প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন নাই। বাংলা বই ছাপিতে হইলে তখন লালবাজারে হিন্দুস্থানী প্রেস, ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস, ডিম্ভজার, অথবা শ্রীরামপুর মিশনরীদের ছাপাখানার শরণাপন্ন হইতে হইত। গঙ্গাকিশোর একটি বাংলা মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপনে অগ্রণী হইলেন। পুস্তকের ব্যবসায়ে তিনি পূর্বেই কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন; তাহার উপর এই কার্য্যে স্বগ্রামবাসী হরচন্দ্র রায়কে অংশীদার-রূপে পাওয়ায় তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন; এই হরচন্দ্র রায় রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গঙ্গাকিশোরের মুদ্রাযন্ত্রটি—সম্ভবতঃ বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত বলিয়া— ‘বাঙ্গালি প্রেস’, বা ‘বাঙ্গালা যন্ত্র’ নামে পরিচিত ছিল, এবং ইহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮১৭ সন বলিয়া মনে হইতেছে।†

বাঙালী-পরিচালিত প্রথম সংবাদপত্র

মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের পর গঙ্গাকিশোরের দৃষ্টি পড়িল সংবাদপত্র-প্রকাশের উপর। তিনি দেখিলেন, এ যাবৎ কেহই বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন নাই। বাঙালীর একখানি বাংলা সংবাদপত্র হইলে অনেক পাঠক জুটিতে পারে। গঙ্গাকিশোর ও তাঁহার অংশীদার হরচন্দ্র রায় ‘বাঙ্গাল গেজেট’ নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়া ইংরেজী সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করিলেন :—

* ১৮০২ সনে ললুলাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে ব্রজভাষার মুদ্রাশী নিযুক্ত হন। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, ১৮২৪ সনে চাকুরি হইতে বিদায় লইয়া আত্মা ফিরিবার সময় তিনি মুদ্রাযন্ত্রটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। গুজরাটী হইলেও তিনি ও তাঁহার স্বজনবর্গ আত্মা-গোকুলপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেন। ১৮২৫ সনে ললুলালের মৃত্যু হয়।

† রামমোহন রায়-কৃত কঠোপনিষদের অনুবাদ ১৮১৭ সনের আগষ্ট মাসে “বাঙ্গালি প্রেসে” মুদ্রিত হয়। এতদ্বিধ ১৮১৮ সনের জুলাই মাসে রাধামোহন সেনের ‘দক্ষীতত্তরঙ্গ’ “বাঙ্গালি প্রেসে” মুদ্রিত হইয়াছিল; ইহার মুদ্রাকর যে গঙ্গাকিশোর ছিলেন তাহার প্রমাণ অল্পতর পাওয়া যাইবে। অধিকন্তু গঙ্গাকিশোরের স্বরচিত ‘ভগবদ্গীতা’র ভাষ্যার্থ “বাঙ্গালা যন্ত্রে” ১৮২৪ সনে মুদ্রিত হইয়াছিল। “বাঙ্গালি প্রেস” গঙ্গাকিশোরেরই মুদ্রাযন্ত্র ছিল—এই অনুমান সত্য হইলে, উহা যে ১৮১৭ সনে স্থাপিত, তাহা মনে করা সম্ভব হইবে; কারণ ১৮১৬ সনে নিজের মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় গঙ্গাকিশোর তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানায় মুদ্রণ করাইয়াছিলেন। পরে গঙ্গাকিশোর ও হরচন্দ্র রায় ‘বাঙ্গাল গেজেট’ নামে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করিলে তাঁহাদের মুদ্রাযন্ত্রটি সাধারণতঃ “বাঙ্গাল গেজেট যন্ত্রালয়” নামে পরিচিত হইয়াছিল।

HURROCHUNDER ROY begs leave to inform his Friends and the Public in general, that he has established a BENGALÉE PRINTING PRESS, at No. 45, Chorebagaun Street, where he intends to publish a WEEKLY BENGAL GAZETTE, to comprise the Translation of Civil Appointments, Government Notifications, and such other Local Matter, as may be deemed interesting to the Reader, into a plain, concise, and correct Bengalee Language; to which will be added the Almanack, for the subsequent Months, with the Hindoo Births, Marriages, and Deaths.

Advertisement for insertion in this Gazette, will be received at 2 Annas per line. English and Persian, the same Price.

Gentlemen wishing to become Subscribers to this Weekly Publication will be pleased to send their Names to HURROCHUNDER ROY, at his PRESS, No. 45, Chorebagaun Street, where every information will be thankfully received.

The Price of Subscription is 2 Rupees per Month, Extras included. Calcutta, 12th May, 1818.

এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হয় ১৪ই মে ১৮১৮ তারিখের 'গবর্নমেন্ট গেজেটে'। খুব সম্ভব পরবর্তী জুন মাসের প্রথমার্ধে 'বাঙ্গাল গেজেট' প্রকাশিত হয়। ইহা প্রতি-শুক্রবারে বাহির হইত। কাগজখানি প্রকাশিত হইয়া বাইবার পর ৯ জুলাই ১৮১৮ তারিখের 'গবর্নমেন্ট গেজেটে' হরচন্দ্র রায় আর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহাতে কার্যালয়ের ঠিকানা "১৪৫ নং চোরবাগান স্ট্রীট" দেওয়া আছে। ইতিমধ্যে ২৩ মে তারিখে শ্রীরামপুর হইতে মিশনরীরা 'সমাচার দর্পণ' নামে বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। মিশনরীরা দাবি করেন 'বাঙ্গাল গেজেট'-প্রকাশের এক পক্ষ আগে তাঁহারা 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই দাবি সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও, স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙালী-কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত এবং কলিকাতার সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্রের সম্মান 'বাঙ্গাল গেজেট'রই প্রাপ্য। 'বাঙ্গাল গেজেট' বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই, প্রায় এক বৎসর চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়। ইহার কারণ গঙ্গাকিশোরের সহিত তাঁহার অংশীদারের অবনিবনা। কাগজখানির প্রচার রহিত হইলে গঙ্গাকিশোর ছাপাখানাটি স্বগ্রাম বহরায় লইয়া যান। এই প্রসঙ্গে ১৮২০ সনে শ্রীরামপুরের ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রথম সংখ্যায় বাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম:—

The first Hindoo who established a press in Calcutta was Babooram, a native of Hindoosthan. . . He was followed by Gunga Kishore, formerly employed at the Serampore press, who appears to have been the first who conceived the idea of printing works in the current language as a means of acquiring wealth. To ascertain the pulse of the Hindoo public, he printed several works at the press of a European, for which having obtained a ready sale, he established an office of his own, and opened a book-shop. For more than six years, he continued to print in Calcutta various works in the Bengalee language, but having disagreed with his coadjutor, he has now removed his press to his native village. He appointed agents in the chief

towns and villages in Bengal, from whom his books were purchased with great avidity; and within a fortnight after the publication from the Serampore press of the Sumachar Durpun, the first Native Weekly Journal printed in India, he published another, which we hear has since failed.—“On the effect of the Native Press in India,” pp. 134-35.

উপরিউক্ত অংশ হইতে জানা যাইতেছে, গঙ্গাকিশোর একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং অংশীদারের সহিত অবনিবনার ফলে তিনি ছাপাখানাটি স্বগ্রামে লইয়া গিয়াছিলেন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে গঙ্গাকিশোরের মৃত্যু হয়। ১৮৩১ সনের ৬ জুন তারিখের ‘সমাচার চন্দ্রিকা’র প্রকাশ :—

৮গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য বিনি প্রথম অন্নদামঙ্গল পুস্তক ছবি সহিত ছাপা করেন...।

গঙ্গাকিশোরের মৃত্যুর পরেও অনেক দিন যাবৎ তাঁহার “বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ে”র অস্তিত্ব ছিল। ১৭৬৬ শকে (=১৮৪৪ সনে) মুদ্রিত ‘ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ॥ প্রকৃতিখণ্ড ॥ তন্ত্রাষা রামলোচন দাস কর্তৃক পঞ্চছন্দে বিরচিত’ পুস্তকের আখ্যাপত্রে আছে :—“গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যমহাশয় ঐ বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ে শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়শ্রদ্ধাভ্যাস্তানুসারে ছাপা হইল বহরা গ্রামে”।

হরচন্দ্র রায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গঙ্গাকিশোরের সহিত পৃথক হইবার কিছু দিন পরেই তিনি নিজ কলিকাতায় একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। সরকারী দপ্তরে প্রকাশ, ২১ এপ্রিল ১৮২৩ তারিখে বাংলায় একখানি ‘অ্যানুয়েল অ্যাটর্ন্যানাক’ বা বার্ষিক পঞ্জিকা বাহির করিবার জন্ত তিনি “মুদ্রাকর ও প্রকাশকরূপে ৯.নং আড়পুলি, কলিকাতা হইতে” লাইসেন্সের জন্ত সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন; আরও জানা যায়, এই বার্ষিক পঞ্জিকার স্বত্বাধিকারী ছিলেন হরচন্দ্র রায়, সিমুলিয়া-নিবাসী মদনমোহন মিস্ত্রী ও মদনগোপাল মজুমদার। নব-প্রবর্তিত প্রেস আইনের জন্তই সরকারের অনুমতি লওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল।

হরচন্দ্র রায়ের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত একখানি পুস্তক সম্প্রতি আমি দেখিয়াছি। ইহা ১৮২৪ সনে প্রকাশিত রামরত্ন ত্রায়পঞ্চানন-রচিত ‘ভগবতী গীতা’। পুস্তকখানির শেষ কয় ছত্র এইরূপ :—

মুদ্রিত হইল শেষে

কলিকাতার একদেশে

শ্রীযুৎ হরচন্দ্র রায়ের আপিসে।

ছাপা হইল আড়কুলি তার নাম

পশ্চিমে কালির ধাম

•খ্যাত দত্তপুরী পূর্ব পাশে ॥

১৮২৫ সনে “মোং আড়পুলি শ্রীহরচন্দ্র রায়ের প্রেসে” যে-সকল পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল তাহারও তালিকা পাওয়া যায়।*

* ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা,’ ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ৮২ দ্রষ্টব্য।

গঙ্গাকিশোরের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

গঙ্গাকিশোর অনেক প্রাচীন গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ, এবং নিজেও কোন কোন গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের যেগুলির সন্ধান বা উল্লেখ এ-যাবৎ পাওয়া গিয়াছে তাহার একটি তালিকা দিলাম :—

(১) ১৮১৬ সনে গঙ্গাকিশোর ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ (পৃ. সংখ্যা ৩১৮) প্রকাশ করেন। ইহার এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে। ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮১৬ তারিখের ‘গবর্নমেন্ট গেজেট’ পত্রে এই পুস্তকের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

মে^o ফেরিস এন কোম্পানি সাহেবের
ছাপা খানায় সিদ্ধ প্রকাশ হইবেক
অন্নদা মঙ্গল ও বিদ্যা সুন্দর পুস্তক
অনেক পণ্ডিতের দ্বারা শোধিয়া শ্রীযুত
পদ্মলোচন চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য* মহাস
য়ের দ্বারা বঙ্গী ভাষায় উত্তম বাঙ্গলা
অক্ষরে ছাপা হইতেছে পুস্তকের প্রতি
উপক্ষেপে একই প্রতিমুখি থাকিবেক মূল্য
৪ টাকা নিরূপণ হইল জাহার লইবার
ইচ্ছা হয় আপন নাম ঐ ছাপাখানায়
কিন্মা এই আপিষে শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর
ভট্টাচার্য্যের নিকট পাঠাইবেন ইতি—

* পদ্মলোচন চূড়ামণি নদীয়ার এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিত। তিনি কিছু দিনের জন্ত ভারতে আগত প্রথম বাপটিষ্ট মিশনারী জন্ টমাসের পণ্ডিত ছিলেন। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৭৯৫ তারিখে মদনাবতী হইতে লিখিত একখানি পত্রে জন্ টমাস লিখিয়াছিলেন :—

I have a pundit to assist me in the translation, whose name is Podo Loson, a native of that famous metropolis of Bengal Learning, Nuddea.—*Periodical Accounts...*i. 205.

টমাসের জীবনীপাঠে জানা যায়, পদ্মলোচন চূড়ামণি একটি ইংরেজী খ্রীষ্টসদ্বীতের অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন (C. B. Lewis : *The Life of John Thomas*, 1873, p. 276.) অনূদিত সদ্বীতটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

হে স্বর্গের শুভা প্রভু খ্রীষ্ট।

অবিরাম তোমার গুণের তেজ।

স্বর্ণ ও মতালোকের রাজ

নাম তোমার লইতে কেন লাজ।

খ্রীষ্টনামে লজ্জা জন্মিলে।

হউক সন্ধ্যার তারা দর্শনে।

অমৃত কিরণ তেজে তার।

মোর মনস্তম তাড়িবার।

এই পুস্তকে ৬ খানি চিত্র আছে; প্রায় সবগুলিই লাইন-এনগ্রেভিং। চিত্রের ব্রকগুলি রামচাঁদ রায়ের (হরচন্দ্র রায়ের আত্মীয়?) তৈয়ারি। ইহার পূর্বে আর কোন সচিত্র বাংলা বই এখনও আমার নজরে পড়ে নাই। পুস্তকের আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

Oonoodah Mongul, / exhibiting / the / Tales / of / Biddah and Soonder. / To which is added, / The / Memoirs / of / Rajah Prutapadityu. / Embellished / with Six Cuts. / Calcutta : / From the Press of Ferris and Co. / 1816. /

(২) ১৮১৬ সনে গঙ্গাকিশোর আরও একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহা বাংলা ভাষায় একখানি ইংরেজী ব্যাকরণ; কেহ কেহ ইহাকে বাঙালীর লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন। পুস্তকের আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

A / Grammar, / in / English and Bengalee : / containing / what is necessary to the knowledge / of the / English Tongue. / To which is added / a / Translation of Words / from / one to three Syllables, / laid down in a plain and familiar way. / By Gungakissore, Bhutachargee. / Calcutta : / From the Press of Ferris and Co. / 1816. / [পৃ. সংখ্যা ২১৬]

এই ইংরেজী ব্যাকরণ বাংলায় প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গঙ্গাকিশোর লিখিয়াছেন :—

এতদেশীয় প্রায় অনেক বালকগণ ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া অত্যন্ত কাল পরে তাঁহারদিগের উহাতে অলস তাচ্ছল্য এবং অশ্রদ্ধা জন্মে তাহার কারণ এই অভিপ্রায় হয় যে বালকত্ব বর্ষ হেতু তাঁহারদিগের বুদ্ধির তরলতা প্রযুক্ত ও মনের চঞ্চলতা প্রযুক্ত ঐ ব্যাকরণের যে পাঠ তাঁহারদিগের গুরু ও বহু জনেরা দেন তাহা মোনে রাখিতে পারেন না অতএব শুংরাং তাঁহারদিগের অলসাদি জন্মাইতে পারে যেহেতুক

খ্রীষ্টার্থে লজ্জা জন্মিলে।

হউক রাজির লাজ মধ্যাহ্নেতে।

যিশু পোহাতি তেজোময়।

দর্শনে সনন্তম যায়।

কি লাজ সে প্রিয় বন্ধুতে।

মোর কণ্ঠে পূর্ণ মুক্তি হয়।

নয় লজ্জিত হইলে লজ্জা এই।

মোর অধিক প্রেম না হওনেতে।

খ্রীষ্টার্থে লজ্জা উচিত হয়

মোর দোষে আপন যদি নয়।

অভাব ভয় ক্রন্দন অপমান।

ও কামা মঙ্গল প্রাণের ত্রাণ।

তা নহিলে হতা তারক নাম।

মোর দর্প হবে অন্তপাম।

মোর বড় আহ্লাদ তুষ্ট এই।

মোরার্থে যিশু লজ্জিত নহে।

তার বিধিতে প্রবৃত্ত হই।

তার দ্বন্দ্ব লজ্জা সর্ব্ব লই।

তার বাক্য বলি সর্ব্ব ঠাই।

তার আজ্ঞা মাননে নির্ভয়।

—‘যিশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেষ

গীত’।—প্রথম ইংলণ্ডীয় স্বর।

১৫শ গীত। (পৃ. ১৮-১৯)

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে, ১৮০১ সনের মে মাসে পদ্মলোচন চূড়ামণি মাসিক ৪০ টাকা বেতনে ডক্টর উইলিয়ম কেরীর অধীনে এক জন সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই কক্ষে তিনি অনেক দিন নিযুক্ত ছিলেন।

মনুষ্যেরদিগের মন যে বিষয় কঠিন এবং শ্রম সাধা হয় তাহাতে অক্লেশে প্রবিষ্ট হয় না বিশেষত বালকগণদিগের অতএব আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে ইংরাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের আপনাত্ত ভাষাতে সংগ্রহ থাকিলে যে সকল বালকেরা ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ করিতে বাঞ্ছা করিবেন তাহারদিগের অতি শুভসাধা হইতে পারে একারণ যথাসাধ্য এক সংক্ষেপ ইংরাজী ব্যাকরণের অর্থ আমারদিগের সাধু ভাষাতে সংগ্রহ করা গেল...

শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের

পরোপকৃত্যে কৃতঃ—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ঠিক এই বৎসরেই (১৮১৬) রামচন্দ্র-রচিত ‘ইঙ্গলিষ দর্পণ’ নামে বাংলা ভাষায় আর একখানি ইংরেজী ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়।* এই রামচন্দ্র ছিলেন—রামচন্দ্র রায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন সহকারী পণ্ডিত।

(৩) গঙ্গাকিশোর “ভাষার্থসহ” একখানি ‘ভগবদগীতা’ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮২৪ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে। তাহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

শ্রীশ্রীহরিঃ ॥ / ভিগবদগীতা ॥ / ॥ নমো ভগবতে বাহুদেবায় ॥ / অষ্টাদশ অধ্যায় সংস্কৃত
মূলগ্রন্থ ॥ / [এবং] গদ্যরচিত ভাষার্থ সংগ্রহ ॥ / শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের প্রকাশিত ॥ /
বাঙ্গালা যন্ত্রে / দ্বিতীয়বার মুদ্রাক্ষিত হইল ॥ / মোকাম বহরা ॥ / সন ১২৩১ সাল /
[পৃ. সংখ্যা ২১৬]

(৪) “কলিকাতার বাহিরে মোং বহেড়াতে শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যকৃত দ্রব্যগুণ ভাষা” ১৮২৪ সনে প্রকাশিত হয়।†

(৫) রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে ‘চিকিৎসার্ণব’ নামে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের একখানি পুস্তক পাইয়াছি। ইহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি। আখ্যাপত্রে পুস্তকের প্রকাশকালটি কীটদষ্ট, তবে ছাপা দেখিয়া মনে হয় ১৮২০ সনের কাছাকাছি ইহা মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীহর্গা / শহায় ॥ চিকিৎসার্নব ॥ / নাদীজ্ঞান নিরূপণ ॥ / অরলক্ষণ ॥ / পাঁচন
ও ঔষধাদি / এবং / দ্রব্যাদি শোধন প্রকরণ / মুদ্রাক্ষিত হইল / কলিকাতা /
[পৃ. সংখ্যা ৩ নির্ধক + ২ + ৭২]

পুস্তকের গোড়ার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ; ইহা হইতে গ্রন্থকারের নামধাম জানা যাইবে :—

গুরুপদে রাখি মতি বন্দোদেব গণপতি তুষ্টি হন ভগবতি তবে অতি শীঘ্রগতি পূরে
অভিলাস ॥ জগৎ জননি যারে তুষ্টি হন এ সংসারে সেজন সকল পারে অনাআসে করিতে
প্রকাশ ॥ চিকীৎসার্নব নাম গ্রন্থ অতি গুণধাম চিন্তা করি অবিরাম দেখি চিত্ত হবে চমকিং ।
ভানায় কোমলমিষ্টি গ্রন্থ যে নূতনমষ্টি কিছুদিন করি দৃষ্টি মুখ বৈদ্য হইবে পণ্ডিত ॥

* ‘ইঙ্গলিষ দর্পণ’ ও তাহার রচয়িতা সম্বন্ধে ১৩৩১ সালের ৪র্থ সংখ্যা এবং ১৩৪০ সালের ৪র্থ সংখ্যা ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’ দ্রষ্টব্য।

† ‘দেবদপত্রে সেকালের কথা’, ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ৭৬।

নাড়িপ্রকাশানুসারে যদি নাড়ী বোধ করে চিকীৎসা করিতে পারে এ কারণে নাড়ীজ্ঞানে করি নিরূপিত ॥ না থাকিলে নাড়ীবোধ হবে কেন রোগবোধ মূর্থ বৈজ্ঞ করে জ্ঞেয় বিষবড়ি দিয়া করে হিতে বীপরীৎ ॥ ব্যাধিতে গীড়িত লোক নানামতে পায় শোক তার কিছু করি যোগ উপায় কারণ ॥ বৈজ্ঞকের শাস্ত্রমত পাঁচনাদি আছে কত তার মধো সার যত এই গ্রন্থে করি নিরূপণ ॥ যে জ্বরে যে অধিকার বিস্তারিয়া কব তার সভাকার উপগার হবে অতিশয় ॥ ঔষধী নানামত বিস্তারিয়া কব কত অল্পে করি গুণশত শাস্ত্রমত করিব নির্ণয় ॥ হরধনি তিরে ধাম ধন্য সে বহরাগ্রাম গঙ্গাকিশোর নাম দ্বিজদিন অতি ॥ চন্দ্রভেজ করি চুর তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর ভুবনে দ্বিতীয়শূর মহারাজা তাঁর অধিকারেতে বসতি ॥ গ্রন্থে কোন থাকে ভুল গুণিগণ দিবে কুল দোষছাড়া নাহি মূল সাধুজনে আছে প্রকাশ ॥ অল্প দোষে স্বধাকরে কি করিতে পারে তারে গঙ্গাধর ধরে শিরে অঙ্ককার ঘোরতরে অনামাসে করয়ে বিনাশ ॥

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক (১৮১৯-২০) রিপোর্টের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে (পৃ. ৪০-৪৬) এদেশের মদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর একটি দীর্ঘ তালিকা আছে। ইহা হইতে গঙ্গাকিশোরের ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তকগুলির নাম উদ্ধৃত করিতেছি :—

Gonga- bhoctee- toronginee
Lukhmee choritro
Betal-poncho-bingsoti

Title unknown

Translation of the Vedant—Rammohun Roy
 Do of Ishopunishud Do
 Do of Kenopunishud Do
 On the common actions and ceremonies of
 life.

Chanokya (slok)
Songit-toronginee

ইহা ছাড়া বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত ভগবদ্গীতার পঞ্চ অনুবাদ ১২২৬ সালে (=১৮১৯) “বঙ্গালগেজেট অফিশে ছাপা” হইয়াছিল।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি পীতাম্বর মিত্র ও জনমেজয় মিত্র

প্রায় দুই বৎসর হইল, ডক্টর স্কুমার সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৈষ্ণব-গীতিকবিতা সম্বন্ধে একখানি স্মৃহং গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানির নাম *A History of Brajabuli Literature*. ইহার ৩৩১-৩২ পৃষ্ঠায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের কবিগণের মধ্যে স্বনামধন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রপিতামহ পীতাম্বর মিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। এই বিবরণপাঠে জানা যায়, পরমবৈষ্ণব পীতাম্বর ব্রজবুলী ও বাংলায় কতকগুলি বৈষ্ণব-গীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রচিত চারিটি কবিতা তৎপৌত্র জনমেজয় মিত্রের ‘সংগীত রসার্ণব’ে স্থান পাইয়াছে।* কিন্তু ‘সংগীত রসার্ণব’ সংগ্রহ করিতে না পারায় স্কুমার বাবু স্বীয় গ্রন্থে পীতাম্বরের অথবা জনমেজয়ের রচনার নিদর্শন প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগার, রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি ও উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে ‘সংগীত রসার্ণব’ আছে। পুস্তকখানির পৃ. সংখ্যা ৭৬; ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

সংগীত রসার্ণব। / অর্থাৎ / সদা শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা শ্রবণ মননার্থে। / অভিনায়াদি রসোদধির / সংক্ষেপ পদ রত্ন / — / কীর্তন প্রণালী মতে চলিত ভাষায় / সঙ্কর্ষণ ভোগ অর্থাৎ পুষ্পিকায় / স্বীয় মনঃ সন্তোষার্থে / শ্রীজনমেজয় মিত্র কর্তৃক রচিত / এবং প্রকাশিত হইল। / কলিকাতা শূড়া। / — / কলিকাতা স্মচারণ যন্ত্রে / শ্রীলালচাঁদ বিধান এণ্ড কোং, দ্বারা বাহির হুজাপুর, ১৩ সংখ্যক ভবনে মুদ্রিত। / — / শকাব্দাঃ ১৭৮২। /

‘সংগীত রসার্ণব’ পুস্তকের ৭-৮ পৃষ্ঠায় পীতাম্বরের চারিটি কবিতা আছে; দুইটি ব্রজবুলীতে এবং দুইটি ভাষায় রচিত। কবিতা চারিটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

“নিবেদন।

মত্ পিতামহ ৬বৃন্দাবনবাসি তদ্রজোভিলাষি ভক্তি-সিদ্ধান্তাভ্যাসি ৬মহারাজ পীতাম্বর মিত্র বাহাদুর মহাশয় কৃত ব্রজ ভাষায় এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় কবিতা এবং পদ সকলের মধ্যে কএকটি এতদগ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণার্থে এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। ব্রজ ভাষায় পীতম এবং ভাষায় পীতাম্বর ভোগ অর্থাৎ পুস্তিকায় দৃষ্টি করিবেন।

* ‘বিশ্বকোষ’র “রাজেন্দ্রলাল মিত্র” প্রবন্ধে পীতাম্বর মিত্র ও জনমেজয় মিত্র সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। শ্রীযুক্ত হুণালকান্তি ঘোষ (‘গৌরপদতরঙ্গিনী’, ভূমিকা পৃ. ২৫৫-৫৬) এবং ডক্টর স্কুমার সেনের গ্রন্থে এই বিবরণটিই উদ্ধৃত হইয়াছে।

ব্রজ ভাষায় বৃন্দাবন স্মরণ।

বৃন্দাবন পুজোঁ। কুজোঁ। দিন্ রাত্ বৃন্দাবন তন মন জাপ ত্রিতাপহারণ বৃন্দাবন হিঁ।
 তাকো রজ্ নাহোঁ মেরো ভইয়া মইয়া কশম গইয়া জুবুদ্ধি বৃন্দাবন হিঁ ॥
 আচারিজ্ বৃন্দাবন মান প্রাণ বৈষ্ণ বৃন্দাবন ভাগ ভরণ রতন বৃন্দাবন হিঁ।
 পীতম সপুত বৃন্দাবন কাজ সাজ লাজরাখো বৃন্দাবন অবতো বিচার সার এহি বৃন্দাবন হিঁ ॥১॥

ব্রজ ভাষায় বলদেবজীর রূপ এবং গুণ বর্ণন।

শোয়াল বাল মিল তাল তোরে ধেনুকাসুর গাধ মারে এসে রোহিণী কুমার হেঁ।
 দেঁঞত্ বীর প্রলম্ব গারে হস্তিনা ওঠায় ডারে দুর্ঘ্যোধন কে মান্ তোড়ন্ বারে হেঁ ॥
 মোর পঙ্ক মুকুট বারে নীলপট বনমাল ধারে ছষ্টন্ কো নাশ করণ হারে হেঁ।
 বাকুণী মধুপান বারে শেষ নাগ ছত্র ধরে পীতম সো হমারে রাখবারে হেঁ ॥ ১ ॥

ভাষায় শ্রীরাধিকার দধি বিক্রয়ার্থে মথুরায় গমন।

পরে প্যারী নীলাধর : প্রকাশিত জলধর : অলকা উজল মুখ শশী।
 ক্র মানি ইন্দ্রের ধনু : সিন্দুরে উদয় ভানু : সখিগণ নক্ষত্র প্রকাশী ॥
 নয়ন চকোর সার : সৌদামিনী হেম হার : শিখে মতি বক পাতি যায়।
 গজ কুস্ত পয়োধর : বেণী শুণ্ড পাঠ পর : বাক্য রূপ সূধা বৃষ্টি তায় ॥
 কুণ্ডল পরায় কানে : দেব দ্বয় এক স্থানে : চন্দ্রার্কেতে সাজিল মণ্ডল।
 নাসায় নোলক ঝোলে : জেন সূধা বিন্দু দোলে : চন্দ্র হৈতে পড়ে অনর্গল ॥
 সাজাইল নানা মতে : কাহ্ন মন হরে যাতে : দধির পসরা করে মাথে।
 পীতাম্বর অন্ন মতি : গোপীগণ যার গতি : পশ্চাতে ধাইয়া যায় সাথে ॥

প্রশ্নোত্তর পদ।

ক্ষীর নীর বিভিন্নতা করে কোন জন। পর্বত পৃথিবী পশু কে করে সৃজন ॥
 কোন বস্তু হয় ভাই স্বর্ণ ভোগ কাম। রিষু মন্ত্রে উপাসক তার কিবা নাম ॥
 বুঝান্ন নন্দ গৃহে কার জন্ম হয়। পঞ্চ প্রশ্নোত্তর কর যদি মনে লয় ॥
 আদি ক্রমে চারি কহি শুনহ বান্ধব। যরাল বিধাতা আর স্রুতি বৈষ্ণব ॥
 পাঁচ প্রশ্নোত্তর হবে চারি মধ্যাক্ষর। ইহ লোকে পর লোকে সবার ঈশ্বর ॥
 তনে কবি কৃষ্ণ পরিধান আখ্য দাস। পঞ্চ প্রশ্ন দয়া করি পূর্ণ কর আশ ॥

পীতাম্বরের পৌত্র এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা জনমেজয় মিত্র ‘সঙ্কষণ’ ভণিতায় ব্রজবুলী ও ভাষায় যে-সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ‘সংগীত-রসার্ণবে’ তাহাই স্থান পাইয়াছে; ইহা হইতে ভাষায় রচিত চৈতন্যদেব-বিষয়ক ৯টি পদ জগদ্ধনু ভদ্র তৎসঙ্কলিত ‘গৌরপদতরঙ্গিনী’তে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সুকুমার বাবু তাঁহার গ্রন্থের ৩৬৮-৬৯ পৃষ্ঠায় ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিগণের মধ্যে জনমেজয় মিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু ‘সংগীত রসার্ণব’ সংগ্রহ করিতে না পারায় ব্রজবুলীতে রচিত তাঁহার কবিতাগুলির নিদর্শন প্রকাশ করিতে পারেন নাই। জনমেজয়-কর্তৃক ব্রজবুলীতে রচিত যে কয়টি কবিতা ‘সংগীত রসার্ণবে’ আছে, আমরা এখানে সেগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

[পৃ. ৯]

ব্রজ ভাষায় প্রাতঃ স্মরণ পদ।

বিভাষ।

রাধা কৃষ্ণ রূপ মনরে প্রেমসে নেহারো। তন মন ধন আপনা সব বাহিপনেছারো ॥
আপনা২ কহতে জাকো বাকো দূর ডারো। রাধা২ কৃষ্ণ২ রাত দেন পুকারো ॥
মোহনী স্বরূপ অরু কোঁন মন বিচারো। সঙ্কর্ষণ রাধা শ্রাম পরভূ মন কো বারো ॥ ১ ॥

বিভাষ।

ভোর ভয়ো মনুয়া মেরা জয় গোপাল বোলো। পঙ্কিগণ রাম বোলে তুতি মুহকো খোলো ॥
কেঁঙ অচেত সোতে ভাই রাম কহকে ডোলো। ঘটতে জাতে গিস্তিকে দেন কৃষ্ণ বোলে মোলো ॥
সৎ অসৎ জান বুঝ দ্রবী মোলো তোলো। সঙ্কর্ষণ ব্রজমে যায় খুব রজমে রোলো ॥ ২ ॥

শ্রাম রটো মন শ্রাম ভজো শ্রাম সে প্রিত লগাও জী।
শ্রাম বিনা কো জগমে আপনা ভাই হমরা বতাও জী ॥
শ্রাম পিতা ভাই ও মাতা বেটা উসিকো বনাও জী।
সঙ্কর্ষণ সদা চিতকো লগায়ে শ্রাম নাম তুম গাও জী ॥ ৩ ॥

পিতম পিয়া মেরো পিয়ারা প্রাণ নেছারু তায়।
জোঁ পাবক পেখে পতঙ্গ তাকো প্রেম কহায়।
পাপ পুণ্য পরকা প্রসঙ্গ ছোড়ো পিতম পায়।
সঙ্কর্ষণ আশা পুরে পিতম কো জোঁ পায় ॥ ৪ ॥

[পৃ. ১০]

রাম কেঙ মেঞ জগমে আয়া মনকা জনম কো অকারত পায়।
মায়া মোহয়ে চিতকো লগয়া বেটা ভাই অরু লোগাই ভায়।
দেখা ভালা উসে খুব জঁচায়া আপন কিসিকো নেহি দেখায়া।
সঙ্কর্ষণ কেঙ লোগ ইমায়া রাম ভজো ভাই ছোড়ো মায়া ॥ ৫ ॥

দাঁউসে মন চিত কো লাগায়ো মিত্র ওহি আপনা দাউ হেয় ।
 লোভ কর কেও দৌড়ে হেয় ভাই দাতা ওহি আপনা দাউ হেয় ॥
 ধন ইহ্ ন আপনা কেটা ন আপনা কোই না আপনা দাউ হেয় ।
 সঙ্কর্ষণ ইহ্ ধর্ত্তি ন আপনি খালি ওহ্ আপনা দাউ-হেয় ॥ ৬ ॥

দর্শন দাউজী করকে আস মিটে ন ভরকে ।
 করে উহ্ ডর কিসি নরকে যম ভাগে জিসে ডরকে ॥
 শরণ উস্কে যো ন সরকে মরে কভু ন উহ্ মরকে ।
 সঙ্কর্ষণ ছোড় চিন্তা পরকে দাউ রটাকর মুহ্ ভরকে ॥ ৭ ॥

[পৃ. ১৩] ব্রজভাষায় শ্রীবলদেবজীর জন্ম যাত্রা । বাধাই ।

আজু ব্রজ মে ভই হেয় বাধাই । দাউ জনম শুনি গোপী চলি ধাই ॥
 মাতু রোহিনী গোদ লিয়ে শিশু প্যার করত মুখ চাই ॥
 আনন্দ উৎসব নন্দ করত হেঁয় অরু যশোমতি মাই ॥
 থার বার সব নাচত গাওত কুদত মঙ্গল গাই ॥
 মাখন হর্দি দধি উর ডারত মটকে ভর ভর লাই ।
 করবে নেছাওর মনধন লেকর সঙ্কর্ষণ ঠাডহি যাই ॥

[পৃ. ১৪] ব্রজভাষায় শ্রীবলদেবজীর রূপ ।

শঙ্খতৈঁ সোপেদ রূপ, বলাদাউকি সরূপ, তাহে নীলপট পহরে হেঁ ।
 মোতেন্ কে পহরে হার, শের মুকুটকে বাহার, হাথ হল মুঘল ধরে হেঁ ।
 গলে বৈজয়ন্তি মাল, মধ পিয়ে আঁথেঁ লাল, শরণ্ শেষ নাগকো লিয়ে হেঁ ।
 চলে ধর্ত্তি লগে কাপ, দেখে বীর লগে হাঁপ, কান এক কুণ্ডল দিয়ে হেঁ ॥
 রৈবত্ কুমারী সাধ, রেবতী কি প্রাণনাথ, রূপ অরু ছবিকে নেহাল হেঁ ।
 শোভা ন কহত জাত্, জেতেহি কহিয়ে বাত্, সঙ্কর্ষণ কি আশ্রে দয়াল হেঁ ॥

দাউ কি ঝাঁকি বড়িঝাঁকি, দেখে কছু নরহে বাকি, মুরত্ এয়সি মোহনী হেঁ ।
 হুহি পাগ শর ধরে, লীলপট কটিপরে, কুন্দসি রূপ শোহাবনি হেঁ ॥
 হল মুঘল শোভে করে, কান এক কুণ্ডল ধরে, বাঁকি ছবি অরু চাহনি হেঁ ।
 বারণীপি আঁখে লাল, অলবেলি লটকেঁ বাল, আধিঃ সঙ্কর্ষণ কি বোলনি হেঁ ॥

[পৃ. ১৫] ব্রজভাষায় নন্দোৎসব । বাধাই মল্লার জয় জয়ন্তি ।

ব্রজমে বাজে বাধাই । নন্দজী ঘরভয়ে কুবর কানাই ॥ ৫ ॥
 গোপী অভূষণ পহ্নি চলতি হৈ ঘুন ঘুনঘুঙ্গর বজাই ॥
 গোপী যশোমতী গোদ বালক দেখ লেত বলাই ।
 গোয়াল মটকে দহি মক্ষণ লেকর নন্দজী ভেটন যাই ॥
 নাচত গাওত কোই দহি ভারত আনদ ধুম মচাই ।
 সঙ্কষণ ঠাড়হি সবর্তে মাক্ত লাল দেখা মুঝে মাই ॥ ১ ॥

[পৃ. ১৬] ব্রজভাষায় শ্রীগোপালজীর বাল্যলীলা ।

খেলে গোপাল লাল, আনন্দ সরূপ বাল, বাল ভাব নন্দকে অঙ্গণ মে ।
 ঘোটনোকে বলচলে, আধি আধি বোলি বোলে, ভাগে কভিগেরে দেখিয়ে ছনমে ।
 দেখে জোসোলেহি ভাগে, চন্দ্র কোহিলেনে মাগে, তোড়ে ফোড়ে উসে যোপায়ে খেলন মে ।
 মাখন অরু দহি মাই, দেতিহৈয় স্থখ পাই, খায়ে কছু ফেক দে ভবন মে ।
 গোপীষো কহে বজাই, নাচো কুবর কানাই, থাই থাই নাচে তলন মে ।
 সঙ্কষণ অরু কানাই, খেলতে হৈ দোনোভাই, ছাইরূপ সঙ্কষণ দৃগণ মে ॥

[পৃ. ৫৫-৫৬] ব্রজভাষায় উত্তর গোষ্ঠ । গৌরী ।

গোধন চরায়ে আয়ে কুবর কানাই । সখাঘেরি চৌদিগে আগে চলে ভাই ॥
 গোরজ শোভে অঙ্গ বালোপ ছাই । মাথে পগড়ি বিচ ফুলে লগাই ॥
 কানন কুণ্ডল কদম বুলাই । হাত লকড়ি বনসী ফুকত যাই ॥
 বঙ্গী শুনত গোপী দেখন আই । মোহন দেখ স্থধ বুধ খোয়াই ॥
 যশোমতী আগেবটি লেত বলাই । দীপকি থালি লিয়ে আরতী গাই ॥
 ঘর ঘর আরতী গোপী বজাই । ভায়োকি জোড়ি সঙ্কষণ মন ভাই ॥ ১ ॥

[পৃ. ৬৮] ব্রজভাষা ঝুলন । মল্লার কয়ালী তাল ।

শাবণ তিজ সোহায়নি আই । প্যারিজী মাথ ঝুলে হৈ কানাই ॥
 সখিগণ ঘেরত দেত বাকোরা কোই উপজে নুর কোই বজাই ॥
 অতর গোলাব কোই ভারত কোই লিয়ে ফুলো কি হার পহরাই ।
 বাদর গরজত দামিনী চমকত বরষত বৃন্দ ঘটা দিশা ছাই ॥
 শুনত কড়ক হিয়া কাঁপই ডরকে টোক ছপে প্যারী পিয়া গলে যাই ।
 কহত সঙ্কষণ প্যারী ছলারী ডরকি ডরাবন রহে কোঁ ডরাই ॥ ১ ॥

জনমেজয় মিত্র আরও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় ;
তন্মধ্যে দুইখানি আমার দেখিবার সুবিধা হইয়াছে। এখানে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলে
বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

নারদ পুরাণোক্ত / অষ্টাদশ মহা পুরাণীয় / অনুক্রমণিকা।। শ্রীযুক্ত জনমেজয় মিত্র কর্তৃক /
অনুবাদিত।। কলিকাতা।। পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত।। শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ, প্রকাশক।।
শকাব্দাঃ ১৭৭৭।।

মিত্র মহাশয় পুস্তকের ভূমিকা-স্বরূপ লিখিয়াছেন :—

পুরাণানুক্রমণিকা।—অর্থাৎ অষ্টাদশ মহাপুরাণীয় শ্লোক, পর্ব, খণ্ড, ভাগ এবং
উপাখ্যান নিরূপণ।

এতদেশের প্রাচীন ধার্মিক হিন্দু মহাশয়গণ স্ব স্ব গৃহে অষ্টাদশ মহাপুরাণাদি ধর্মশাস্ত্র সংগ্রহ
করণে যত্নবান হইয়া থাকেন, কিন্তু কাল এবং দুর্দ্ভাব বশতঃ শাস্ত্র সকল লোপ হওয়াতে বহু ক্ষেত্রে
সে আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া অসম্ভব, আর যে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া থাকেন তাহাও খণ্ডিত
হইয়া উঠে, কারণ এমত কোন পুরাণানুক্রমণিকা প্রচলিত নাই যাহাতে কোন পুরাণে কত
খণ্ড, কিং পর্ব, কিং ভাগ এবং কিং উপাখ্যান আছে তাহা জানিতে পারা যায়, এবং তদ্ব্যতীত
সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ হইতে পারে। যদিচ ভাগবতাদি শাস্ত্রে পুরাণের নাম এবং শ্লোক সংখ্যা
নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু তাহাতে কোন পুরাণে কি কি উপাখ্যানাদি আছে তাহা নিরূপিত হইতে
পারে না, সুতরাং শ্লোক সংখ্যায় ঐক্য হয় না। একারণ দুঃশ্রাব্য নারদ পুরাণ হইতে এতৎ
অনুক্রমণিকা উদ্ধৃত এবং নানা পুরাণের সহিত ঐক্য করিয়া বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিলাম।
ইহা দৃষ্টে বিষয় মহোদয় গণের পুণ্য সংগ্রহ করণের উপকার দর্শিতে পারিবেক, এবং কোন
পুরাণে কত শ্লোক, পর্ব, ভাগ, খণ্ড এবং কিং উপাখ্যান আছে তাহা অনায়াসে বোধ হইবেক।

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে এই পুস্তক আছে।

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতানুক্রমণিকা।। তদারস্তে।। নয়নাঞ্জন।। অর্থাৎ ভগবতভাস্ত্র
দর্শনশাস্ত্র দিবাক্ষ জন গণের জ্ঞানোজ্জ্বল স্বরূপ মহোষধ।। তথাতদেব রূপ মহাক্ষ কুপ পতিত
জলের উদ্ধারোপযোগি জ্ঞানচক্ষুঃ প্রকাশক পুস্তক / নানা শাস্ত্র পুরাণ প্রমাণ এবং যুক্তি / যুক্ত
প্রবন্ধ গোড়ীয় ভাষায় / ভাগবত ভক্তগণের আত্মার্থে।। শ্রীজনমেজয় মিত্রের দ্বারা কলিকাতা /
গুড়ায় সংগৃহীত হইল।। কলিকাতা হুচার যন্ত্রে / শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা বাহির
হুজাপুর, / চাশাধোবা পাড়ার ১৩ সন্ধ্যাক ভবনে / দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।। শকাব্দা ১৭৮১।।

এই পুস্তকখানির ৩০-৩২ পৃষ্ঠা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

দেবী ভাগবতোৎপত্তি কারণং যথা।।

যৎকালে ৬মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর পুরাণ সংগ্রহ করন তৎকালীন এতদেশীয় মহাভারতীয়
শ্লোক সংখ্যা গণনাঙ্ক লক্ষ পরিপূর্ণ না হইবার মহারাজ ৬শিবনাথ তর্কালঙ্কার ৬রামপ্রসাদ
বাচস্পতি এবং ৬রামচন্দ্রলাল চূড়ামণি এই ভট্টাচার্য্যত্রয়কে ৬কাশীধামে প্রেরণ করেন তাহার
তথায় যাইয়া দেবনাগরাক্ষর শিক্ষা করত লক্ষ শ্লোক সংগ্রহ পূর্বক নাগরাক্ষরে মহাভারত
লেখাইয়া দোষন করত আনয়ন করেন, এবং তৎ কৰ্ম্ম সাধনার্থে বারাণসীর কমিটির দেয়ান
৬দুর্গাচরণ মিত্র মহাশয়কে পত্র লিখেন, পূর্বোক্ত পণ্ডিতগণ বারাণসীতে থাকিয়া বেদান্তাদি

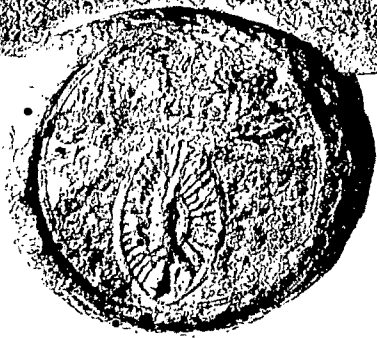
শাস্ত্র পাঠ করত গ্রন্থ সংগ্রহ করেন এবং মহারাজকে লিপি প্রেরণ করেন যে সম্প্রতি কাশীধামে এক নূতন পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে তদ্বিবরণ এই প্রাপ্তকৃত্ত মিত্র মহাশয় এক দিবস তত্রস্থিত সমস্ত পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন যে ভগবতাইদং ভাগবতং ইতিত্তনাশঙ্কনীয়ং ইহাতে বোধ হয় ভগবতীর চরিত্র বর্ণন যুক্ত ভাগবত পুরাণান্তর অবশ্য আছে আপনারা অনুগ্রহ পুরসের অনুসন্ধান করিয়া আনয়ন করুন। ইহাতে কেহই স্বীকার করিলেন না কেবল ৩রামচন্দ্র ঘুলিয়া নামক এক ব্যক্তি মহা কবিকল্প ছিলেন, তিনিই অঙ্গীকার করিলেন কিয়ত কালানন্তর তিনি শ্রীমদ্ভাগবতীয় সকল স্তব্ধাধ্যায় শ্লোকের অনুকরণ করিয়া ভগবদ্ভাষ্য স্থানে ভগবতীর চরিত্র বর্ণন পূর্বক দেবী ভাগবত নামক পুরাণ রচনা করিয়া আনিয়া দেন তাহাতে মিত্র মহাশয় মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে যথেষ্ট পারিজৈবিক দিয়া ঐ দেবী ভাগবত কাশীতে পারায়ণ করাইয়াছেন তদবধি উক্ত কল্পিত পুরাণ ক্রমশঃ সর্বত্র প্রকাশ হইয়াছে ইত্যাদি। এক্ষণে এই বিবরণে যদি কোন মহাশয়ের সন্দেহ হয় তিনি পূর্বোক্ত মহারাজের বংশধর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহাশয়ের সমীপে তত্ত্ব করিলে উল্লিখিত লিপি দেখিতে পাইবেন ইতি।

এই রূপ এক অকিঞ্চনের পিতামহ বৈকুণ্ঠ বাসী ৩রাজা পীতাম্বর মিত্র বাহাদুর মহাশয় যে সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করেন তন্মধ্যে মহাভাগবত নামক গ্রন্থের পৃষ্ঠে লিখিত আছে যথা।

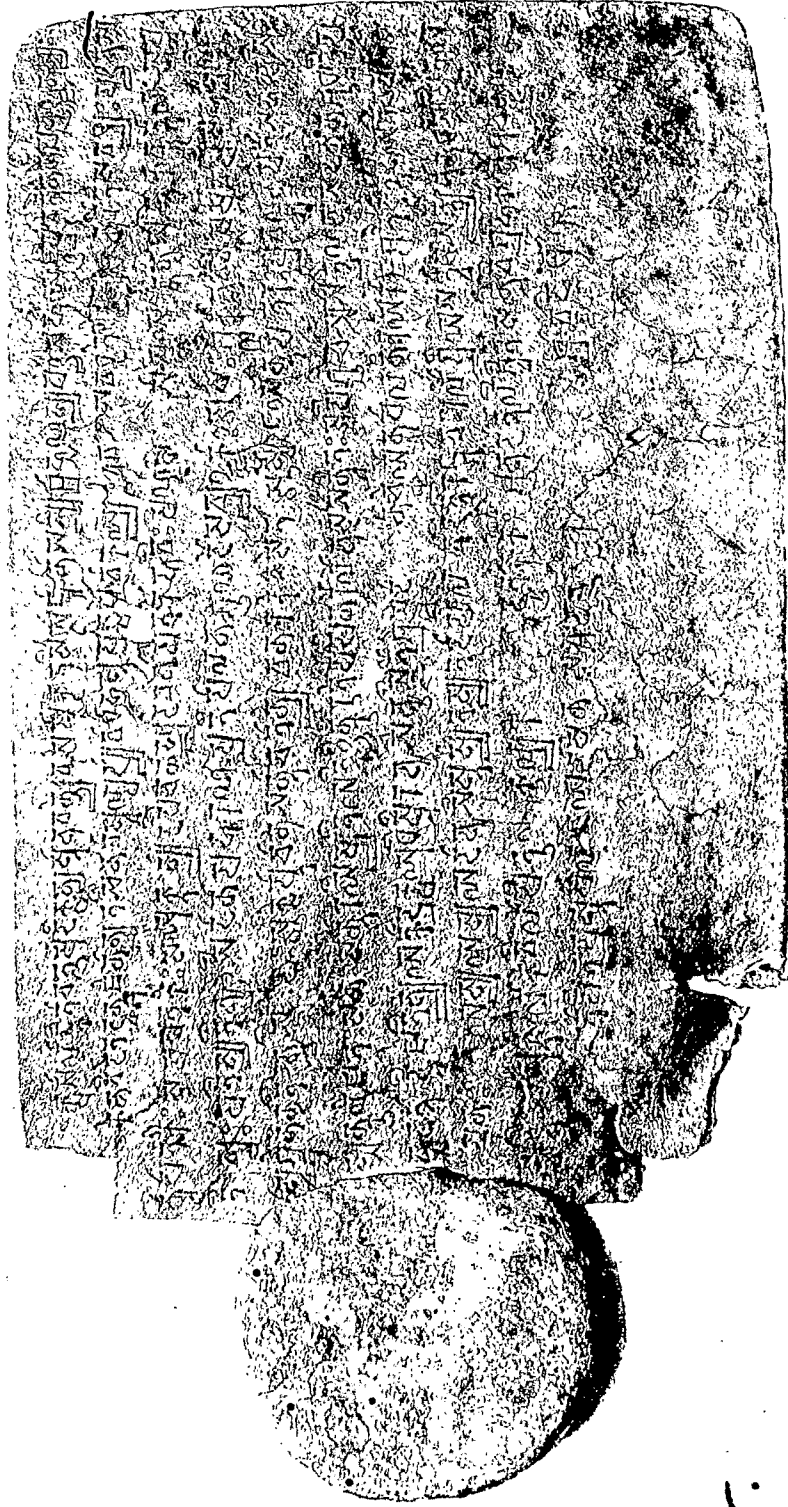
মহাভাগবত নামকো গ্রন্থঃ।

ইদং পুস্তকং ১৬৮৭ শকাব্দে গোকুল যোষাল নাম্না বিপ্রেন বেরেলন্ নামক স্নেহজ্ঞ অথবা ইংরাজস্ত দেয়ানো ভূত্বা চট্টগ্রামে স্থিত্বা কেনচিদ্ব্যাক্ষণেন দ্বারা নবা সংগ্রহং কৃত্বা কলিকাতামধ্যে আনীতং এবং হর্গাচরণ মিত্র মদন মোহন দত্তাভ্যাং সহ মন্ত্রণাং কৃত্বা গ্রন্থং প্রচলিতং কৃতবান। ইদং পুস্তকং নবা কাব্য মিতি।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



[The page contains dense handwritten text in Devanagari script, which is mostly illegible due to extreme fading and significant ink bleed-through from the reverse side. The text appears to be organized into several horizontal lines across the page.]



মল্লসারুলে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসন

এই তাম্রশাসন ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত গলসি থানার অধীন দামোদর-তীরবর্তী মল্লসারুল গ্রামে একটি প্রাচীন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আবিষ্কৃত ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশ্বর রায় উক্ত তাম্রশাসনখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে দান করিয়াছিলেন এবং তদবধি উহা পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত হইতেছে। স্বর্গগত মহাশোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ লিপির আংশিক পাঠ উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীও ইহার কিছু পাঠ উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু এ যাবৎ তাম্রশাসনখানির সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধৃত বা প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি আমাকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ উক্ত লিপির পাঠোদ্ধার করিবার এবং এতৎসম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার অনুমতি দান করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার ইংরাজী প্রবন্ধ প্রবৃত্তিবিশিষ্ট কৰ্ত্তব্য 'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। তাম্রশাসনখানি মূল্যবান্ বিবেচনায় উহার সারমর্ম সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি।

এক ঋগু চতুষ্কোণ তাম্রফলকের দুই দিকে লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। ফলকখানি প্রায় ১০ ১/২" দীর্ঘ এবং ৬ ১/২" প্রস্থ। লেখার বাম দিকে, ফলকের এক প্রান্তে, একটি গোলাকার মুদ্রা বা শীলমোহর সংযুক্ত আছে। শীলমোহরের উপর একটি দণ্ডায়মান দ্বিভুজ পুরুষমূর্তি এবং তাহার পশ্চাতে একটি চক্র উৎকীর্ণ রহিয়াছে। মূর্তির নীচে 'মহারাজবিজয়সেনস্ত' এই লিপি উন্নমিত অক্ষরে খোদিত হইয়াছে। ফলকের প্রথম পৃষ্ঠায় ১৫ ছত্র ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১০ ছত্র লিপি আছে। বঙ্গদেশে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে অক্ষর প্রচলিত ছিল, এই লিপির অক্ষর তাহার অনুরূপ। এইরূপ অক্ষর ফরিদপুরে আবিষ্কৃত ধর্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগবান্ লোকনাথ, ধর্ম এবং সাধুজনের গুণানুকীর্ণন করিয়া এই লিপির আরম্ভ হইয়াছে। ২য় ও ৩য় ছত্রে এই শাসনখানি মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের রাজ্যকালে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। এই গোপচন্দ্র ও ফরিদপুর-তাম্রশাসনের মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। ৩য় হইতে ৫ম ছত্রে বর্ধমানভুক্তির রাজকর্মচারি-বর্গকে সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে। কর্মচারিবর্গের আখ্যাগুলি যথাক্রমে এই :- কান্তীকৃতিক, কুমারামাতা, চৌরোদ্ধরণিক, উপরিক, ওজ্জ্বলিক, আগ্রহারিক, ঔর্ণস্বানিক, ভোগপতিক, বিষয়পতি, তদায়ুক্তক, হিরণ্যসামুদায়িক, পত্তলক, আবসথিক। ৫ম হইতে ৮ম পঙ্ক্তিতে এতদঞ্চলের মহত্তরগণ এবং অগ্রাশ্র সম্মানার্থ ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ আছে; যথা,—বক্তকরীথীসম্বন্ধ-অর্দ্ধকরক-অগ্রহারের মহত্তর হিমদত্ত, নিরুত্তবাটকের মহত্তর স্তবর্ণযশাঃ, কপিস্থবাটকাগ্রহারের মহত্তর ধনস্বামী, বটবল্লক

অগ্রহারের মহত্তর যষ্টিদত্ত ও শ্রীদত্ত, কোড্ডবীর-অগ্রহারের ভট্টবাসনামানী, গোধগ্রাম-অগ্রহারের মহিদত্ত ও রাজ্যদত্ত, শাল্লিবাটকের জীবস্বামী, বক্কতকের খাজি-হরি, মধুবাটকের খাজি-গোহীক, খণ্ডজোটিকার খাজি-ভদ্রনন্দী, বিদ্যাপুরীর বাহনায়ক, হরি প্রভৃতি। ইহারা এবং ‘বীথ্যধিকরণ’ একযোগে এইরূপ ঘোষণা করিতেছেন:—“মহারাজ বিজয়সেন এই (বক্কতক) বীথীসম্বন্ধ বেত্রগর্তী গ্রামের অষ্টকুল্যাবাপ-পরিমিত ভূমি আমাদিগের নিকট হইতে যথায়ুক্তভাবে ক্রয় করিয়া পঞ্চমহাযজ্ঞ-প্রবর্তনের নিমিত্ত ঋত্বেদান্তগত-বাহুচশাখাধ্যায়ী কৌণ্ডিণ্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বৎসস্বামীকে প্রদান করিতে চাহেন। এই ধর্মকার্য্যে পরমভট্টারকপাদের (অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের) পুণ্য অর্জন হইবে এবং এই দানের প্রতিপালকরূপে আমাদিগেরও কীর্ত্তি ও শ্রেয়ঃ লাভ হইবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইহার অভ্যর্থনায় পূর্ণ করা হউক, ইহা অবধারিত হইল। তদনুসারে আমাদিগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তক মহারাজ বিজয়সেনের নিকট হইতে মূল্যস্বরূপ প্রাপ্ত দীনার বীথীমধ্যে সম্যকরূপে ভাগ করিয়া এবং আমাদিগের বেত্র-গর্ত্তী গ্রামে উক্ত অষ্টকুল্যাবাপ হইতে যথোচিত দেয় উক্ত বীথীর তহশিলে অর্পণ করিয়া ভূমি গ্রহণ করিতে হইবে—ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়া উক্ত ভূমি মহারাজ বিজয়সেনকে প্রদত্ত হইল। তৎপরে তিনি ব্রাহ্মণ বৎসস্বামীকে তাত্রপট্টের দ্বারা উক্ত ভূমি দান করিলেন।” এই ভূমি ক্রয় ও দানের ব্যাপার ৮ম পঙ্ক্তিতে হইতে ১৪শ পঙ্ক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে। ১৪শ ও ১৫শ পঙ্ক্তিতে প্রদত্ত ভূমির সীমা এইরূপ নির্দিষ্ট আছে,—পূর্বে গোধগ্রাম, দক্ষিণে গোধগ্রাম, উত্তরে বটবল্লক অগ্রহার এবং পশ্চিমার্দ্ধে তাত্রগর্ত্তিকা গ্রাম। এই ভূমি চতুর্দিকে পদ্মবীজমাল্যাক্ত কীলকসমূহের দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছিল; এই কথা ১৫শ ও ১৬শ ছত্রে লিখিত আছে। তৎপরবর্ত্তী অংশে (১৭শ হইতে ২৪শ পঙ্ক্তিতে) এই দানের পক্ষে বাধা বা অপহরণ-জনিত পাপ ও প্রতিপালনজনিত পুণ্যের কথা সাতটী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ২৪শ পঙ্ক্তিতে এই তাত্রশাসনের দূতক শুভদত্ত ও লেখক সাক্ষিবিগ্রহিক ভোগচন্দ্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পুস্তপাল-জয়দাস কর্ত্তক এই তাত্রশাসন ‘তাপিত’ হইয়াছিল; ২৫শ পঙ্ক্তিতে তাহার উল্লেখ আছে। এই ছত্রের শেষে তাত্রশাসনের তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে,—সংবৎ ৩, শ্রাবণ ২৭। এই তৃতীয় সংবৎসর সম্ভবতঃ মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের রাজ্যাব্দ।

ভূমিদাতা মহারাজ বিজয়সেন মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের অধীনস্থ কর্ম্মচারী বা সামন্ত ছিলেন দেখা যাইতেছে। এই বিজয়সেন ও কুমিল্লার প্রাপ্ত মহারাজ বৈষ্ণুগুপ্তের তাত্রশাসনের দূতক মহারাজ-মহাসামন্ত বিজয়সেন অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণুগুপ্তের তাত্রশাসনের তারিখ ১৮৮ শৃংখাব্দ, অর্থাৎ ৫০৭ খৃষ্টাব্দ। বিজয়সেন বিভিন্ন সময়ে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে, বৈষ্ণুগুপ্তের ও গোপচন্দ্রের অধীনে সামন্তপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সম্ভবতঃ বৈষ্ণুগুপ্তের পরে গোপচন্দ্র রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ফরিদপুর হইতে বর্দ্ধমান জেলা পর্য্যন্ত তাহার করতলগত হইয়াছিল।

তাম্রশাসনে উল্লিখিত গ্রামগুলির অবস্থিতি বর্তমানে নিরূপণ করা কঠিন; এ সম্বন্ধে কয়েকটি অনুমানমাত্র করা যাইতে পারে। মল্লসারকল গ্রামের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত গোহগ্রাম তাম্রশাসনোল্লিখিত গোধগ্রাম হইতে পারে এবং মল্লসারকলের দক্ষিণস্থিত আমবহলা গ্রাম (অর্থাৎ সীমাসীমি) সম্ভবতঃ প্রাচীন আত্মগর্ভিকার স্থানে বিরাজ করিতেছে। মল্লসারকল ও গোহগ্রামের মধ্যবর্তী খাঁড়াজুলি খণ্ডজোটিকা নামে পরিচিত ছিল, এইরূপ প্রতীতি হয়। শাল্মলিগ্রাম বর্তমানে হয় ত মল্লসারকলে পরিণত হইয়াছে। গোহগ্রামের পূর্ববর্তী বক্তা এবং তৎসম্বন্ধিত অঞ্চল সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে বক্তকবীখী নামে পরিচিত ছিল। তাম্রশাসনের পাঠ নিয়ে প্রদত্ত হইল।

সম্মুখভাগ

- ১... (লো) কনাথঃ যঃ পুংসাং স্মৃকৃতকর্মফলহেতুঃ (।) সত্যতপোময়মুর্তি-
ল্লৌকদ্বয়সাধনো ধর্মঃ (॥ ১) তদনু জিতদন্ড (স্ত) লোভা জয়-
- ২ (স্তি) পরহিতার্থাঃ নিমৎসরাঃ সূচরিতৈঃ পরলোকজিগীষবঃ সমুঃ (॥ ২)
পৃথিবীং পৃথুরিব প্রথিতপ্রতাপনয়শৌর্য্যে মহারাজাধিরাজশ্রীগোপ-
- ৩ [চন্দ্রে] প্রশাসতি তদনুজ্ঞপ্তায়াং পুণ্যোত্তরজনপদাধ্যাসিতয়াং সততধর্ম-
ক্রিয়াবদ্ধমানায়াং বদ্ধমানভুক্তৌ পূজ্যস্বর্তমানোপস্থিততঃ কার্ত্তাকৃতিক কু-
- ৪ মারামাত্যচৌরোদ্ধরণিকোপরিকৌদ্ভঙ্গিকাগ্রহারিকৌর্ণস্থানিকভোগপতিকবিষয়-
পতিতদায়ুক্তকহিরণ্যসামুদায়িকপত্তলকাবসথিকদেবদ্রোণীসম্ব-
- ৫ দ্বাদীষিধিবৎসম্পূজ্য বক্তকবীখীসম্বদ্ধাক্কিরকাগ্রহারীগমহত্তরহিমদত্তঃ নিরুত-
বার্টকীয়মহত্তরস্ব(ব)র্যশাঃ(ঃ) কপিস্ববার্টকাগ্রহারীগ-
- ৬ মহত্তরধনস্বামি(মী) বটবল্লাকাগ্রহারীগমহত্তরষষ্ঠিদত্তশ্রীদত্তৌ কোড্ডবীরাগ্রহারীগ-
ভট্টবামনস্বামি(মী) গোধগ্রামাগ্রহারীগমহিদত্তরাজ্য-
- ৭ দত্তৌ শাল্মলিবার্টকীয়জীবস্বামি(মী) বক্তকীয়খাঞ্জিগ্রহারিঃ মধুবার্টকীয়খাঞ্জি-
গোইক(ঃ) খণ্ডজোটিকেষখাঞ্জিভদ্রনন্দিনী(ন্দী) বিদ্যাপুরেয়বাহনায়ক-
- ৮ হরিপ্রভু(ভু)তয়ো বীথ্যধিকরণঞ্চ বিজ্ঞাপয়ন্তি (।) পূজ্যং মহারাজ-
বিজয়সেনেন বয়মভ্যর্থিতা ইচ্ছেহ(য়) মেতদ্বীখীসম্বদ্ধবেল্লগর্তাগ্রামে যুদ্বাভ্যো য-
- ৯ থান্নায়েনোপক্রীয়াষ্টৌ • কুল্যাবাপান্ মাতাপিজোরাত্তনশ্চ পুণ্যাভিরুদ্ধয়ে
কল্লাস্তরস্থায়িন্তা প্রবৃত্ত্যা পুল্লপৌল্লাস্বয়ভোগ্যত্বেন কৌণ্ডিন্তসগোজ্ঞায়

১ এখানে বিলুপ্ত দুইটি অক্ষরের মধ্যে একটি অনুমান করা যাইতে পারে।

২ লেখকের ভ্রান্তিবশতঃ দুইটি 'ত' উৎকীর্ণ হইয়াছে। 'স্থিতত' না পড়িয়া 'স্থিত' পড়িতে হইবে। ৩ 'পূজ্যমহারাজ' পড়িতে হইবে।

- ১০ বাহু চবৎসস্বামিনো(নে) পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রবর্তনায় প্রতিপাব(দ)য়িতুমিতি (১)
যতোরস্মাভিরস্মাভ্যর্থ(ন)য়াবধ্বতমস্মোষো(স্মোষো)নুক্ৰমঃ^১ উভয়লোক-
বিজিগীষুভি(:)
- ১১ সাধুভিঃ ক্রিয়মাণপুণ্যাক্ষেপে শ্রীপরমভট্টারকপাদানাং ধর্মষড়্ভাগেচযো-^২
স্মাকমপি প্রতিপালয়তাং কীর্তিশ্রেয়োভ্যাং যোগঃ (১) উক্তঞ্চ (১) যঃ
ক্রিয়াং ধর্মসং-
- ১২ যুক্তাং মনসাপ্যভিনন্দতি (ব)ক্ৰতে স - যথেষ্টেব শুক্লপক্ষ ইবোড়ুরাট্
(১১৩) তৎ সম্পত্ততামস্মাভিপ্রায় ইতাস্মা(দ্বা)রকৃত্তৈরনেন দত্তক-
দীনারা(ন্) বীথ্যাং সম্বিজ্যাস্মে(দে)জ্ঞ-
- ১৩ গর্তীগ্রামেষ্টাভ্যঃ কুল্যাবাপেভ্যো যথোচিতং দানং তদ্বীথীসমুদয় এব প্রনার্য^৩
বোঢ়ব্যমিত্যবচূর্ণ্যেষ্টৌ কুল্যাবাপা মহারাজবিজয়সেনস্য দত্তোঃ (দত্তাঃ)
- ১৪ ...পি^৪ রাজ্ঞাস্মৈ কোণ্ডিন্তসগোত্রায় বাহু চবৎসস্বামিনে পঞ্চমহাযজ্ঞ-
প্রবর্তনায় তাত্রপ্র(প)ট্টেন প্রতিপাদিতা (: ১) অথ চ^৫ চৈষাং চতুর্ষু দিক্শু
সীমা ভবন্তি পূ-
- ১৫ (ক্রীস্মাং দি)শি গোধগ্রামসীমা দক্ষিণ্যাং(দক্ষিণায়াং) গোধগ্রামা(ম)
এব উত্তরস্মাং বটবল্লকাগ্রহারসীমা পশ্চিমস্মাং(পশ্চিমায়াং) দিশি অর্ধেন
আত্রগর্তিকাসীমা কীলকাশ্চাজ্জ কমলা-

পশ্চাদ্ভাগ

- ১৬ ক্ষমালাঙ্কিতা চতুর্ষু দিক্শু স্তম্ভা ভবন্ত্যেবমেবাং কৃতসীমাঙ্কানামস্য ব্রাহ্মণস্য
পঞ্চমহাযজ্ঞপ্রবর্তনেনোপভূঞ্জনস্য ন
- ১৭ কেনচিদেতদ্বনশ(দ্বংশ)জেনাত্মতমেন বা স্বল্পপ্যা(স্বল্পাপ্যা)বাধা হস্ত-
প্রক্ষেপো বা কার্য্যঃ (১) এবমবধ্বতে যোথ করোতি স বধ্যঃ পঞ্চভির্শ্ব-
- ১৮ হাপাতকৈঃ সোপপাতকৈঃ সংযুক্তঃ স্যাদপি চ নাস্ত্য দেবা ন পিতরো হবিঃ-
পিণ্ডং সমাপ্ন যুঃ [ছি]ন্নমস্তকবত্তালঃ অপ্ৰ-

১ অস্মোষোনুক্ৰমঃ ? ২ 'ধর্মষড়্ভাগোপচয়ো' পড়িলে অর্থসঙ্গতি হয়।

৩ শুদ্ধ পাঠ সম্ভবতঃ 'প্রণায়া'।

৪ এখানে অনুমান তিনটীমাত্র অক্ষর বিলুপ্ত। সম্ভবতঃ 'অনেনাপি' পড়িতে হইবে।

৫ এই 'চ'টীর কোনও সার্থকতা নাই।

- ১৯ তিষ্ঠঃ পতিষ্যতি (॥ ৪) ভূমিদানাপহরণপ্রতিপালনগুণদোস(ষ)ব্যঞ্জকাঃ
আৰ্য্যঃ শ্লোকা ভবন্তি (।) ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি
- ২০ স্বর্গে নন্দতি ভূমিদঃ (।) অক্ষোপ্তা চানুমন্তা চ তাত্তেব নরকে বসেৎ
(॥ ৫) আক্ষোপ্তয়ন্তি পিতরঃ প্রবল্গন্তি পিতামহাঃ (।) ভূমিদো-
- ২১ স্মনকু(ৎকু)লে জাতঃ স নঃ সন্তারয়িষ্যতি (॥ ৬) যৎ কিঞ্চিৎ(ৎ) কুরুতে
পাপং নরো লোভসমা(ম)স্থিতঃ (।) অপি গোচর্মমাত্রেন ভূমিদানেন
শুধ্যতি (॥ ৭) পু-
- ২২ র্দদত্তাং দ্বিজাতিভ্যো যদ্বাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির ভূমিং ভূমি(ম)তো শ্রেষ্ঠদানা-
চ্ছেয়োনুপালনং (॥ ৮) ইয়ং রাজশতৈর্দত্তা দীয়তে চ পুনঃ
- ২৩ পুনঃ (।) যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং (॥ ৯)
তড়িত্তরঙ্গবহুলাং শ্রিয়ং মত্বা চ মর্ত্যানাং (।) ন ধর্মস্থিতয়-
- ২৪ নৃসন্তিঃ যুক্তা(স্তিযুক্তা) লোকে বিলোপিতুম্ (॥ ১০) কুল্য ৮ দূতকঃ
শুভদত্তো লিখিতং সাক্ষিবিগ্রহিকভোগচন্দ্রেন
- ২৫ তাপিতং পুষ্পপালজয়দাসেন (॥) সংবদ (সংবৎ) ৩ শ্রাব দি ২০ ৭

৩০৬৭

শ্রীননীগোপাল মজুমদার

২৫/৫/০

গৌড়েশ্বরের আদেশে রচিত “বিদ্যাসুন্দর”*

বাঙ্গালী পাঠকগণ অবগত আছেন যে, শৈশবে বাঙ্গালা ভাষাকে নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছিল। এক দিকে ব্রাহ্মণগণ, অত্র দিকে গোড়া মুসলমান মৌলবীগণ বঙ্গভাষায় গ্রন্থ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। কুতুবাস ও কাশীদাসকে ব্রাহ্মণেরা “সর্বনেশে” উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদকগণের জন্ত ইহারা রোরব নামক নরকে স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন। যে আঙ্গুলে বাঙ্গালা লেখা হইত, মুসলমান মৌলবী সাহেব পাপভয়ে সেই আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিবার কতোয়া দিয়াছিলেন। এহেন দুঃসময়ে বঙ্গভাষা ঘটনাচক্রে গৌড়েশ্বরগণের স্ননজরে পড়িয়া যায়। রক্ততঃ গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহদানের ফলেই বঙ্গভাষা শৈশবে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছিল। গৌড়েশ্বরগণের সভাগৃহে স্থান লাভ করিতে না পারিলে বাঙ্গালা ভাষা শৈশবেই কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া মারা যাইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গৌড়ের সুলতানগণের মধ্যে অনেক বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্যামুরাগী নরপতি ছিলেন। তাঁহাদের সাগ্রহ প্রবর্তনায় হিন্দু ও মুসলমান পণ্ডিতবর্গ হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুলতান শমসুদ্দীন ইউসুফ শাহের (রাজ্যকাল ১৪৭৪—১৪৮২ খৃঃ অব্দ) আদেশে জৈমুদ্দিন নামক মুসলমান কবি “রসুল-বিজয়” নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুলতান হোসেন শাহ কুলীনগ্রামবাসী মালাধর বস্তুকে ভাগবতের অনুবাদ রচনায় নিযুক্ত করেন। তিনি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ করিলে সুলতান তাঁহাকে “গুণরাজ খাঁ” উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। হোসেন শাহের প্রশংসাত্মক অনেক কবিতা বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হোসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ মহাভারতের একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন বলিয়া পরাগল খাঁর আদেশে রচিত মহাভারতে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কবি বিদ্যাপতিও নসিরা শাহ (সম্ভবতঃ উক্ত নসরত শাহ) এবং গৌড়েশ্বর “প্রভু গয়াস উদ্দীন সুলতানের” প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। নসরত শাহ যে প্রেমবিষয়ক সঙ্গীতের অমুরাগী ছিলেন, বিদ্যাপতির পদে তাহার আভাস আছে। আমার আবিষ্কৃত একটি পদে এই সুলতান নসিরা শাহের সঙ্গীত-প্রিয়তার যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্ত পদটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

ধানশী বেলাবলী।

অ কি অপক্লপ রূপের রমণী ধনি ধনি।

চলিতে পেখল গজরাজগমনী ধনি ধনি ॥ ধু।

কাজলে রঞ্জিত ধনি ধবল নয়ান ভালে।

ভ্রমোর ভোলল বিমল কমল দলে॥

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের একবিংশ অধিবেশনে চন্দ্রনগরে পঠিত।

গুমান না কর ধনি স্ত্রীণ অতি মাজাখানি
কুচগিরি ফলের ভরে ভাঙ্গি পড়িব যৌবনি ॥

সুন্দরী চান্দমুখি বচন বোলসি হাসি
অমিআ বরিখে জৈছে শারদ পূরণ শশী ॥

সেখ কবিরে ভণে অহি গুণ পামরে জানে
ছলতান নাহির সাহা তুলিছে কমল বনে ॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণও এক গৌড়েশ্বরের আদেশে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই “গৌড়েশ্বর” কে ছিলেন, কবি তাহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি উক্ত গৌড়েশ্বরের যে সভা-বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে মুসলমান-প্রভাব-বিশিষ্ট ছিল। তদীয় অমাত্যের “খা” উপাধি হইতেও তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়।

অতঃপর আমরা বাঙ্গালী পাঠকগণকে একটি অশ্রুতপূর্ব্ব কথা বলিব। সুলতান নসরত শাহের পুত্র সুলতান ফিরোজ শাহও তদীয় পিতামহ ও পিতার মত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ও উৎসাহদাতা ছিলেন।

ফিরোজ শাহের আদেশে দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ-রচিত একখানি “বিজ্ঞানন্দর” কাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উহার দুইখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, দুইখানিই আত্মস্তু খণ্ডিত। একখানির ২—৮ ও ২৭ সংখ্যক পত্রগুলি মাত্র বিদ্যমান। উহা ২১×৮ অঙ্গুলি-পরিমিত কাগজের দুই পিঠে পুথির আকারে লেখা। এই পুথিখানি অত্যন্ত প্রাচীন ও কীটদষ্ট। অপরখানির একটি মাত্র পত্র বিদ্যমান।

বিজ্ঞানন্দরের কাহিনী অবলম্বন করিয়া অনেক কবিই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশের রচিত পুথির নাম “কালিকামঙ্গল” দৃষ্ট হয়। আমাদের দ্বিজ শ্রীধরের পুথিরও ঐ নাম ছিল কি না, খণ্ডিত পুথির সাহায্যে তাহা বলিবার উপায় নাই।

পুথির স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোক আছে। “মাধব ভাট রূপগুণং বিস্তার্য্য কথঅতি”, “কথা কথঅতি” ইত্যাদিরূপ সংস্কৃত বাক্য-প্রয়োগও পরিদৃষ্ট হয়। সূত্রাং পুথিখানি যে কোন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পুথিতে সুন্দরের পিতার নাম গুণসার ও মাতার নাম কলাবতী, রাজ্যের নাম বিজয়ানগরী রত্নাবতী; বিজ্ঞার পিতার নাম বীরসিংহ, মাতার নাম শীলা (দেবী), রাজ্যের নাম কাঞ্চী বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

কবির সময় বাঙ্গালা ভাষা “দেশী ভাষা” বা “প্রাকৃত ভাষা” নামে পরিচিত ছিল।

“সাবধান নরলোক পাএ জেন মতে।

দেসি ভাসে পদবন্ধে গাহি পরাকৃতে ॥”

নিম্নে কয়েকটি ভণিতা উদ্ধৃত করিতেছি,—

(১) নৃপতি নসির সাহা তনএ সোন্দর।

নাম ছিরি পেরোজ সাহা রসিক সেখর ॥

...

দ্বিজ ছিরিধর কবি রচিলেক পুনি ॥

- (২) নৃপতি নসির সাহা তনএ সৌন্দর ।
 সর্বকলা নলিনী ভুগিত মধুকর ॥
 রাজা শ্রী পেরোজ সাহা শিনোদ সজ্জান ।
 দ্বিজ ছিরিধর কবি রাজা পরমাণ ॥
- (৩) শীরি পেরোজ সাহা বিদিত জুবরাজ ।
 কহিল পঞ্চালি ছন্দে ছিরি কবিরাজ ॥
- (৪) রাজারাজস্বর তনএ সৌন্দর
 কর্ণ সম দাতা বিচক্ষণ ।
 শ্রীপেরোজ সাহা পঞ্চ গুণে অবগাহা
 ছিরিধর কবিরাজে ভাণ ॥
- (৫) নৃপতি নসির সাহার নন্দনে
 ভোগপুরে মেদনি মদনে ।
 রাজা শ্রীপেরোজ সাহা জান
 ছিরিধর কবিরাজে ভাণ ॥

প্রাপ্তকৃত তৃতীয় ভণিতায় পাঠকগণ দেখিতেছেন, ফিরোজ শাহ তখনও যুবরাজ মাত্র—
 রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। নসরত শাহের রাজত্বকাল ১৫১৯—১৫৩২ খৃষ্টাব্দ,
 আর ফিরোজ শাহের রাজত্বকাল ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ (কয়েক মাস মাত্র)। সুতরাং পুথিখানি
 ১৫৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে নসরত শাহের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল, অনুমান করিতে হইবে।

দীনেশ বাবুর মতে কব্বের রচিত বিদ্যাসুন্দরই বঙ্গভাষায় রচিত বিদ্যাসুন্দর-
 কাব্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। রচনাকাল হিসাবে শ্রীধরের রচিত গ্রন্থটি সম্ভবতঃ
 দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে।

লিপিকরের কল্যাণে এই নষ্টাবশিষ্ট পত্রগুলির উদ্ধারও একরূপ অসাধ্য হইয়া
 পড়িয়াছে। যেখানেই হাত দেই, সেখানেই নানা প্রমাদ ও অপূর্ণতা দেখিতে পাই।
 পাঠকগণ তাহা পূর্বে উদ্ধৃত অংশগুলি হইতেই বুঝিতে পারিবেন। এ অবস্থায় অত্যাশ্রয়
 পুথিগুলির সহিত তুলনায় ইহার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিতে আমরা আপাততঃ অক্ষম।

কবি দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ গোড়ের রাজসভায় থাকিতেন, আমরা এইমাত্র
 অনুমান করিতে পারি। তাঁহার বাড়িঘর কোথায় ছিল, আমরা তাহা বলিতে পারি
 না। তাঁহার রচিত গ্রন্থখানি চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী হুগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও অক্ষত-
 দেহে থাকিতে পারে নাই;—ক্ষতবিক্ষত জীর্ণশীর্ণ কয়েকটি পত্রমাত্র সম্বল করিয়া,
 গৃহস্থের গৃহকোণে অথবা পড়িয়া থাকিয়া, চিরনির্লব্ধ লাভের দিন গণনা করিতেছিল।
 লুপ্ততন্তু ও ধূলিরাশি ঝাড়িয়া পত্র কয়টি সংগ্রহপূর্বক তৎসাহায্যে আজ বাঙ্গালী
 পাঠকগণের নিকট এক মহানুভব নৃপতি ও এক বিস্মৃতনামা কবির কীর্তিকাহিনী
 বলিতে পারিলাম বলিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

সেকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিত

১। প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, হরিনাভি

হরিনাভি-নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের নাম এখন হয়ত অনেকের নিকট তেমন পরিচিত নহে ; কিন্তু এমন এক সময় গিয়াছে, যখন তাঁহার যশের সৌরভ চারি দিকে ব্যাপ্ত ছিল। তিনি ‘নাটুকে নারায়ণ’ বা সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। প্রাণকৃষ্ণ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিকথা-পাঠে জানা যায়, তিনি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে মুক্তবোধ পড়াইতেন এবং কৃষ্ণকমল স্বয়ং তাঁহার শ্রেণীতে দুই বৎসর থাকিয়া মুক্তবোধের সন্ধি ও শব্দ শেষ করিয়াছিলেন। পত্রিকা-সম্পাদন ব্যাপারেও প্রাণকৃষ্ণ পটু ছিলেন ; ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ যোগ্যতার সহিত তিনি অনেক দিন সম্পাদন করেন।

প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের রচিত তিনখানি পুস্তক রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে পাইয়াছি ; তিনখানিই সংস্কৃতে রচিত এবং বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। এগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি :—

(১) ত্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাশতকং । ১৮৪৫ । পৃ. সংখ্যা ১৫ ।

পুস্তকখানির আখ্যাপত্র এইরূপ :—

ত্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাশতকং / সমাচার চন্দ্রিকা গ্রাহকাগং / পারিতোষিকং / সমাচার
চন্দ্রিকা যন্ত্ৰেণ / মুদ্রিতং / শকাব্দাঃ ১৭৬৭ সনাব্দাঃ ১২৫২ / ১ বৈশাখঃ । /
রচনার নিদর্শন-স্বরূপ ‘অন্নপূর্ণাশতকং’ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

বদন্তি ত্বামেকে প্রকৃতিমপরে চাদিপুরুষং
পরে ব্যত্যাসক্তং তদুভয়মথাত্তে মনুময়ীং ।
চিদাধারং কেচিৎ পরমচিত্তরূপাং তদিতরে
বিতর্কীশ্বযোবং জননি গহনত্বাদ্বেহবিধাঃ ॥ ৩ ॥

সমাধায় শ্রদ্ধাং শ্রুতিষু বিমলান্তঃকৃতিতয়া
ভজন্তে যে কেচিদ্ ভগবতি যথা ত্বাং যদভিধাং ।
তথা তেবাং ভক্তিপ্রকৃতিমুপলভ্যৈবহি তয়া
প্রসন্না ত্বং মাতঃ শ্লথয়সি ভবগ্রন্থিরচনাং ॥ ৪ ॥

অরারানন্দার্ণবভবনলীলামণিময়ী
মুনীন্দ্রাণং সম্বৎসকলফলসম্পৎস্বরত্নঃ ।
প্রফুল্লীকর্ত্ত্বং নঃ কলুষিতমনঃকৈরবকুলং
স্বমাসন্ন রাশীকৃতস্কৃতকাশী শশিকলা ॥ ৫ ॥

পুরী নাম্না কাশী পুরমথিতুরানন্দবসতিঃ
কৃতান্তঃ সংত্রাসং জননি শয়ন্তী সুবিপুলং ।
অবিদ্বং নির্বাণং দিশতি মৃতিমাত্রং তল্লভতাং
ত্বদীয়াধিষ্ঠানাদিদমতিরহস্তং ভজতি সা ॥ ৬ ॥

চিদাকারং যন্তে চরণযুগলং চিস্তিতবতী
মনীষা কৈবল্যং ঘটয়িতুমলং সংযমবতাং ।
অতো বারাগস্তাঃ স্ফুটমিব দধত্যাস্তদনঘে
বিমুক্তক্ষেত্রস্থং কিমিতি বত বিস্মাপকমিদং ॥ ৭ ॥ (পৃ. ১-২)

পুস্তকের শেষে গ্রন্থকার তাঁহার পরিচয় এই ভাবে দিয়াছেন :—

নিবসতি হরিনাভিভূম্নরঃ শ্রীভবানীচরণশরণ এষ প্রাণকৃষ্ণোহতিদীনঃ ।
স্তুতিমতিরভিতঃ শ্রীঅন্নপূর্ণাপদাঙ্কং শতমরচয়দেতদ্যত্নতঃ শ্লোকরত্নং ॥
ইত্যন্নপূর্ণাশতকং শুভপ্রদং কৃতান্তসম্ভাপনিতান্তবারকং ।
পঠন্নরো নিত্যমনন্তচেতসা বিপত্ততে নাত্র পরত্র চ ক্লেচিং ॥ * ॥
ইতি শ্রীপ্রাণকৃষ্ণবিজবিরচিতং শ্রীঅন্নপূর্ণাশতকং সম্পূর্ণং ॥ * ॥
ওঁ তৎ সৎ ॥ ৩ ॥

(২) ধর্মসভা বিলাস । ১৮৫০ । পৃ. সংখ্যা ৪১ ।

ইহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীশ্রীদুর্গা । / জয়তি । / ধর্মসভা বিলাস । / নামক চম্পূকাব্যস্ত প্রথম খণ্ডং /
চন্দ্রিকা গ্রাহকগণ পারিতোষিকার্থং / ধর্ম সভানুজ্ঞানুসারতঃ / কলিকাতা
নগরে / চন্দ্রিকাযন্ত্রেণ / মুদ্রিতং । / ১২৫৭ বঙ্গাব্দীয় ৩ বৈশাখঃ । /

‘ধর্মসভা বিলাস’ সম্বন্ধে ১৮৫৯ সনে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত ‘বিবিধার্থ-সঙ্গুহে’
লিখিয়াছিলেন :—

“সংস্কৃত কলেজের পূর্বতন অধ্যাপক ও সমাচারচন্দ্রিকা নাম সংবাদপত্রের
বিখ্যাত সম্পাদক পণ্ডিতপ্রধান মৃত প্রাণকৃষ্ণ বিজ্ঞানাগর মহাশয় ধর্ম
সভাবিলাস নামে একখানি সংস্কৃত চম্পূ প্রকাশ করেন। তাহাতে
তাৎকালিক ধর্মোদ্দেশী ব্রহ্ম ও ধর্ম সভা সংক্রান্ত মহাশয়দিগের চরিত্র

লইয়া অনেকগুলি ব্যাঙ্গোক্তি বিহ্বল আছে। ঐ ব্যঙ্গ্য সকল সরস হইয়াছিল, কিন্তু সংস্কৃতে রচিত হওয়াতে সৰ্বত্র প্রসিদ্ধ হইতে পারে নাই।—“বিবিধার্থ-সঙ্গহ”, শকাব্দা ১৭৮০, চৈত্র, পৃ. ২০৮।

‘ধর্মসভা বিলাস’ চারিটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ; প্রথম পরিচ্ছেদের নাম “সভানিদানং” (পৃ. ১-৭), দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম “সভাপ্রবন্ধ” (পৃ. ৭-২২), তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম “সভাবিবুতি” (পৃ. ২২-৩০), এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম “বিবৃতিকদম্বকং” (৩০-৪১)।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ পুস্তকখানি হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা হইল :—

অধৈকদা সদসি সম্পাদকঃ সভ্যান্ সবিশেষমবাগময়ং ভোঃ সভাধ্যক্ষাঃ
সম্প্রতি কশিচং সিংহশাবকঃ ক্ষিপ্তো যত্নরক্ষিতমস্মাকং ধর্ম্মারণ্যমিদ-
মুন্মূলয়িতুমদযুক্তো দৃঢ়নিয়মকবাটমুদঘাটয়তি প্রতিবেধং ন শৃণোতি যতঃ ॥
সতাং সহপদেষু যতো নৈব প্রবর্ততে। বরং বিরুদ্ধমাদত্তে যথোন্মত্তে
প্রদৃশ্যতে ॥ সভাঃ, সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ কিমিতি চাপল্যং। সম্পা,—
দুস্পরিহার্য্যত্বাৎ স্বভাবস্ত, অতএব পঠন্তি তথাপি সিংহঃ পশুরেব নাশ
ইতি। কিঞ্চ সম্ভবতি সর্বং সম্ভবশাৎ সংসর্গোহি প্রতিযোগিনমল্লকুর্কন্
শনৈস্তদ্ধর্মানল্লযোগিনমল্লগময়তি ততশ্চ ॥ বিস্মৃত্য স্বপরাক্রমং শিশুরসৌ
সিংহস্ত সাধারণৈরগ্ণ্যনিবাসিভিঃ পশুগণৈঃ সার্কং সদা ক্রীড়তি। তদুঃ-
ষঙ্গকৃতাজ্ঞাসক্ত বিতর্কিতাদৃত্য জন্মান্তরং পেশঙ্কংকুমিবদ্বিধাত্তি শনৈরগ্ণ্য
তত্তুল্যতাং ॥ তদস্ত্য তাবত্তদগনমুচিতমিতি সর্ভৈর্কল্লধা বিবিচ্য তস্মিন্
সিংহার্ভকে সভায়াঃ পঞ্চমনিয়মোহবতারিতস্তৎপ্রকারোতিপ্রাডম্বরঃ ॥ নিজ-
জননিকুরম্বে নন্দলালো বিষাদং বিদধদবল্ললম্বে মাথুরীং যর্হি লীলাং।
হরিপুরমতিরম্যং তন্নবীনপ্রতিষ্ঠং প্রবিরচিতবিলাপং শোচ্যমুচ্চৈস্ত-
দাসীদিতি ॥* ॥ অথাসৌ সিদ্ধাশ্রমাদ্ধর্ম্মারণ্যাদপসারিতঃ সিংহো নির্মুক্ত-
বন্ধন ইব যত্র কুত্রচিৎ পরিশ্রমন্ যঞ্চ কঞ্চন সমীপবর্ত্তিনমাক্রম্য প্রসিতুমারেভে
ইত্যতো লোকে অয়ং সিংহো জনমেতমাক্রামত্যেদং প্রসতীতি সর্বত্র
মহান্ কোলাহলো জাতঃ। হা ধিক্ ॥ যোহতিমাত্তো মানভূতাং সিংহো
দেব ইবাদৃতঃ। ভবানীচরণত্যক্তঃ স এব স্মৃতিভীষণঃ ॥ তদাস্তাং তস্ত
তাবন্তয়ঙ্করত্বাদস্পৃশ্যনামধেয়স্তং যত্তেন গ্রন্তোহন্তোপি যমাতক্রাম সোপি দারুণো
বভূব প্রসিদ্ধং হি লোকে ॥ দুষ্টকৃতপ্রসরণাৎ পশবঃ প্রমত্তা যান্ কানপীক্ষণ-
গতান্ প্রসভং দশস্তি। দষ্টাশ্চ তে বিষপরিক্রমদোষদৃষ্টা যঞ্চ স্পৃশেয়ুরুত
সোপি ভয়ানকঃ স্তাং ॥ (পৃ. ৩৮-৩৯)

(৩) ত্রিশিবশতক স্তোত্ররত্ন। ১৮৫৪। পৃ. সংখ্যা ৫৯।

ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

সংস্কৃতহৃদঃপ্রবন্ধে নিবদ্ধ / গোড়ীয় সাধুভাষায় তদীয়ার্থ সম্বলিত / ত্রিশিবশতক

স্তোত্ররত্ন / নামক গ্রন্থ। / কলিকাতা নগরীয় গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত পাঠশালার
 ব্যাকরণাধ্যাপক / শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর কর্তৃক / রচিত হইয়া
 বিনামূল্যে ধার্মিকগণে বিতরণার্থ / কাচরাপাড়া নিবাসি বৈকুণ্ঠবাসি
 বৈষ্ণুকুলোদ্ভব / গুরুপ্রসাদ রায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র / শ্রীযুত উমানাথ রায়
 মহাশয়ের / সম্পূর্ণ ব্যয় সাহায্যে / শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসুর বহুবাজারস্থ ১৮৫
 নং ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে / মুদ্রাঙ্কিত হইল। / শকাব্দা: ১৭৭৬। /

এই পুস্তকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত এক শত শ্লোক ও প্রতি শ্লোকের নীচে বাংলায় অর্থ
 দেওয়া আছে। ইহার প্রথম দুই পৃষ্ঠা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।—

গ্রন্থাভাস।

অনির্বাচনীয় প্রযুক্ত নিগুণ ব্রহ্মের বর্ণনাদি করা যাইতে পারে না কিন্তু
 সেই ব্রহ্ম যৎকালে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তখন সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী
 মায়ার প্রতি অবলোকনদ্বারা তদগুণাভাসে ভাসমান হইয়া ঈশ্বরসংজ্ঞা প্রাপ্ত
 হন তৎপ্রতি তাহা অসম্ভব নহে এবং জীব তৎপ্রসাদাৎ নিখিল সন্তাপ মুক্ত
 হইয়া মুক্তিভাজন হইতে পারে এই বেদান্তসিদ্ধ সিদ্ধান্তানুসারে পরমশিবের
 সগুণ ব্রহ্ম বর্ণনপূর্বক স্তব করা যাইতেছে।

ওঁ নমঃ শিবায় ॥ গুণাতীতেহপীক্ষা গুণিনি
 গুণময্যা গুণবশাদ্গুণীতিপ্রত্যুত্যা গুণবি-
 দনুশাস্তি প্রতিগণঃ। যতো নিষ্টৈগুণ্যে
 কচিদপি ন বৃত্তিগুণবিদাগতস্তাং সংতো-
 তুং সগুণ বিগুণোহপি প্রভবতি ॥ ১ ॥

ব্রহ্মবস্ত স্বয়ং গুণাতীত হইয়াও গুণময়ী মায়ার প্রতি অবলোকন গুণে
 গুণী হন এই উক্তরদ্বারা গুণজ্ঞ বেদগণ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে অনুশাসন অর্থাৎ
 শিক্ষাপ্রদান করেন যেহেতু ঐহারা গুণই জানেন তাঁহারা কখন নিগুণ
 বস্তুকে সাক্ষাৎ প্রতিপন্ন করিতে পারেন না অতএব হে সগুণ হে গুণবন,
 বিগুণ অর্থাৎ তমোগুণাক্রান্ত ব্যক্তিও বেদপ্রসিদ্ধ তোমাকে সগুণরূপে
 স্তবাদি করিতে সমর্থ হইতেছে ॥ ১ ॥

মহৈশ্বর্য্যং যতেহনপরজনসাধারণপরং
 কুতকৈর্দুঃস্বর্ত্যং জগদনঘনীলাকুতুকিনঃ।
 অনেনৈব ব্রহ্মনিশমন্তুম্যেয়োহসি নিপু-
 নৈঃ প্রবোধপ্রদ্যাত্য প্রসভম্পলভ্যো-
 হসি চ পুনঃ ॥ ২ ॥

‘হে ব্রহ্মন, তুমি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকরণাদি স্বরূপ সূচাকু লীলা করিতে কৌতুকী হইয়া যে প্রচুর ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়াছ যাহা অল্প কোন জনে সম্ভবে না এবং কুতর্কবাদি নাস্তিকেরা তর্ক করিয়া যাহা নির্ণয় করিতে পারে না নিপুণ জনেরা এই আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য দ্বারা তোমাকে নিরন্তর অনুমান করেন এবং প্রবোধের উদয়ে কেহই হঠাৎ জানিতেও পারেন ॥ ২ ॥

পুস্তকের শেষ শ্লোকটি অর্থসমেত উদ্ধৃত হইল :—

ইতি শিবশতকং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদ্বিজেন

ব্যরচি নিয়তনুভং স্তোত্ররত্নং সযত্নং ।

স্ববিহিতশিবপূজাপূর্ব্বমেতস্ত পাঠা-

দখিলফলবিধাতা শ্রীশিবঃ শ্রীতিমেতি ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদ্বিজবিরচিতং শিবশতক-

স্তোত্ররত্নং সম্পূর্ণং ।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণনামা বিপ্র শিবনাম মাহাত্ম্য প্রযুক্ত সর্বদা নূতন এই শিবশতক স্তোত্ররত্ন যত্নপূর্ব্বক রচনা করিলেন, যথাবিধি শিবপূজা করিয়া এই স্তবের পাঠ করিলে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ স্বরূপ সকল ফলের বিধানকর্ত্তা শ্রীশিব শ্রীতি প্রাপ্ত হন, স্তবেরা তিনি শ্রীত হইলে কোন ফলের অপ্রাপ্তি থাকে না ॥ ২ ॥

নিগুণং সগুণ শিব শিব সর্ব্বময় ।

করিলে শিবের সেবা সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥

তাঁহার শতক স্তব সমাপ্ত হইল ।

প্রাণকৃষ্ণ কহে সবে শিবশিব বল ॥

এই পুস্তকখানির সমালোচনাকালে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তৎসম্পাদিত ‘সম্বাদ ভাস্কর’ পত্রে ১২ অক্টোবর ১৮৫৪ তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

শ্রীশিবশতকস্তোত্র রত্ন।—সংস্কৃত কালেজীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত নামে এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন..... ভক্তিরসে পরিপূর্ণ কবিতা সকল অতি সুরচিত হইয়াছে আমরা সমস্ত পাঠ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কবিত্ব পাণ্ডিত্যের ধত্ত্ব ধ্বনি করিলাম, ... ইহার পূর্ব্ব বৈদিক কুলসর্ব্বস্ব, অন্নপূর্ণাশতক, ধর্ম্মসত্য বিলাস চম্পূ ইত্যাদি অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন তাহাতেও বিদ্যাসাগর কীর্ত্তিসাগর হইয়াছেন, পুনর্ব্বার এই রত্নদানে সাধারণের মর্ম্মস্থানে কীর্ত্তিরত্ন হইয়া রহিলেন... ।

এই সমালোচনা-পাঠে আমরা ‘বৈদিক কুলসর্ব্বস্ব’ নামে প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের অপর একখানি পুস্তকের সন্ধান পাইতেছি ।



প্রাণকৃষ্ণের আরও একখানি পুস্তকের নাম পাওয়া যাইতেছে; এখানি ‘শরীরোৎ-পত্তিক্রম’ নামে ৯ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা। ইহার প্রকাশকাল—“কলিকাতা ১৯১৭” (১৮৬০ সন)। পুস্তিকাখানি বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।

২। প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, পুঁড়া

প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের নিবাস ছিল বশিরহাট সবডিবিজনের পুঁড়া গ্রামে। তিনি পরে বরাহনগরে আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহার পিতা “পুঁড়া গ্রামনিবাসী ৬কন্দর্প সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় যিনি দেশবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় অতি বড় মানুষ ছিলেন”। * বিদ্যাবতীর পিতার সমতুল্য না হইলেও প্রাণকৃষ্ণের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল; সেকালের অনেক গণ্যমান্ত লোকের—টাকীর কালীনাথ রায়-চৌধুরী, পাতুরিয়াঘাটা-নিবাসী দেওয়ান রামলোচন ঘোষ প্রভৃতির বাটীতে কর্মকাণ্ডকালে প্রাণকৃষ্ণ অধ্যক্ষতা করিতেন। দেওয়ান রামলোচন ঘোষের অমৃতম পুত্র দেবনারায়ণ ঘোষের অনুরোধে প্রাণকৃষ্ণ একটি গঙ্গাস্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন; ইহা ১৮৪১ সনে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল।

পুস্তিকাখানির আখ্যাপত্র এইরূপ:—

গঙ্গায়ৈ নমঃ / গঙ্গাস্তোত্রং । / বৈকুণ্ঠবাসি গুণরাশি দেবনারায়ণ ঘোষজ /
বাবুর আদেশ ক্রমে / শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কর্তৃক রচিত ও / শ্রীযুক্ত
বাবু আনন্দনারায়ণ ঘোষজ / মহাশয়ের আদেশে / সন্যাস ভাস্কর যন্ত্রালয়ে
প্রকাশিত হইল / ১২৪৭ সাল শকাব্দা: ১৭৬২ / তারিখ ২৫ ফাল্গুন /

গঙ্গাস্তোত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

মাতর্গৃহেশ্বরশিরোধ্বলসত্তরঙ্গে-
ইপাঙ্গেক্ষণামৃতরসপ্রণতাভিভঙ্গে ।
তাপত্রয়াত্যয়বিধায়কসংপ্রসঙ্গে
স্বামাশ্রয়ে ভগবতীমভবায় গঙ্গে ॥ ১ ॥

যে স্বাং অরন্তি বিলপন্তি নমন্তি যান্তি
তীরং তদীয়মথবানিশমাশ্রয়ন্তি ।
নীরং পিবন্তি তুহিনাদ্রিস্ততেহর্জয়ন্তি
সদ্যস্ততে পুররিপো: পুরমাবিশন্তি ॥ ২ ॥

কঙ্কালমালকুতবালমৃগাঙ্কভাল-
কালান্তকালশিবজালসমা হি জীবা: ।
তীরে তব ত্রিনয়নে ত্রিগুণে ত্রিবর্ণে
লোকো মৃষা নিগদতীতি নীরাদয়ন্তে ॥ ৩ ॥

* ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭৪, ১৯৯, ৪০২।

মুক্তো ভবেদ্বদমলাধুকণাভিষিক্তো
যুক্তোহপি পাপনিকরৈঃ স্কন্ধে বিরক্তঃ ।
মাতঃ স্থনিশ্চিতমতন্তু বারি যত্র
নাস্তীতি কিম্বিষয়ঃ সবলো হি তত্র ॥ ৪ ॥

পূর্ণং স্কচূর্ণয় চিরাচরিতোগ্রপাপং
তুর্ণং ত্রিলোকজননি ত্রিবিধঞ্চ তাপং ।
সংসারসাগরসন্তরণোপযোগি-
শ্রীপাদপদ্মযুগলে বিমলে প্রসীদ ॥ ৫ ॥

ধ্যানং ন বন্দনমথাত্মদুপাসনং বা
স্বংকীর্তনং তব পদাম্বুজপূজনং বা ।
জানে কদাচিদপি নৈব কুপার্ত্রচিহ্নে
চিহ্নেহনিশং নিবস মেহস্ত বিমুক্তচিহ্নে ॥ ৬ ॥

মিথ্যাপি তথ্যসদৃশী জগতী বিভাতি
স্বযেব রজ্জ্বমু যথাহনিলভুকপ্রতীতিঃ ।
আত্মা স্বমেব পরমে সকলার্থদর্শী
চিহ্নপমাত্রমনিশং পরিচিস্তয়ে স্বাং ॥ ৭ ॥

নাস্ত্যাকৃতির্ন চ কৃতির্ন ধৃতির্ন ধাম
গোত্রং ন তে গিরিস্থতে ন জম্বূর্ন নাম ।
স্বৈষ্টার্থসাধনকৃতে কিল সাধকানাং
রূপং প্রকলিতবতী ভবতী বিচিত্রং ॥ ৮ ॥

গঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং সর্বপাপহরং পরং ।
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং তত্ত্ব গঙ্গা প্রসীদতি ॥ ৯ ॥

যোহসৌ যোষকুলাগ্রণী ঋণজনির্ধীরঃ সত্যং সম্মতঃ
শাস্তাশাস্ত্রবিচারণৈকনিপুণঃ শ্রীদেবনারায়ণঃ ।
তদ্বাক্যামৃতকৌতুকী বিতরুতে গঙ্গাষ্টকং যত্নতো
ধ্যাত্বা শৈলস্তুতাজি সারসযুগং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদ্বিজঃ ॥ ১০ ॥

দৈবনারায়ণীমাজ্জাং ধৃত্বা শীর্ষে প্রকাশ্যতে ।
স্তুতিরেষানন্দনারায়ণঘোষণে সশ্রিয়া ॥ ১১ ॥

পুস্তকের শেষে প্রকাশক বাহা লিখিয়াছেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

বিবিধ বৃধ সম্মত সর্বজন হিতৈষী ধন্য বদান্ত ভাগীরথী ভক্তাগ্রগণ্য মদগ্রজ
মহাশয় মৃত দেবনারায়ণ ঘোষদাসঃ অভিনব গঙ্গাস্তব শ্রবণেচ্ছু হইয়া স্ব

পুরোহিত বরাহনগরগ্রাম নিবাসি শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রতি আদেশ করেন ঐ আদেশানুসারে তর্কালঙ্কার মহাশয় কর্তৃক বিরচিত গঙ্গাষ্টক শ্রবণ করত পরমাঙ্কুরাদিত্যে মংপ্রতি এই আজ্ঞা দেন যে এই গঙ্গাষ্টক কোন যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিবা অতএব ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

সংযোজন

এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধের ৫ম পৃষ্ঠায় হরচন্দ্র রায়ের যন্ত্রালয়ে ১৮২৩ সনে মুদ্রিত একখানি পুস্তকের কথা বলিয়াছি। ইহারও দুই বৎসর পূর্বে—১৮২১ সনে এই যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত একখানি পুস্তক রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে পাইয়াছি। পুস্তকখানির নাম ‘শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ঃ’ (পৃ. সংখ্যা ৬৫)। ইহাতে মূল শ্লোক ও দ্বিজ পীতাম্বর (সম্ভবতঃ পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়)-কৃত পয়ার অনুবাদ আছে। অনুবাদক লিখিয়াছেন :—

রাসপঞ্চাধ্যায় প্রত্যেক শ্লোকভাষা। পদ্যরূপে রচনা করিব এই আশা ॥

দ্বিজ পীতাম্বর গঙ্গাবংশ সম্ভব। পূর্ব পূর্ব ব্যাখ্যা ভাব করি অনুভব ॥ ...

অগ্রেতে মূলের শ্লোক করি উপস্থাপন। পশ্চাৎ তাহার অর্থ করিলাম প্রকাশ ॥ (পৃ. ১-২)

ইহার সহিত ‘শ্রীউদ্ধবদূত’ নামে ৫২ পৃষ্ঠার আর একখানি পুস্তক একত্র মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার গোড়ার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীউদ্ধবদূতকাব্য শ্রাব্য সভাকার। ইহাতে উপজে কৃষ্ণ ভক্তি হৃদ্যসার ॥

গোষ্ঠামি রচিত গ্রন্থ অতি স্থললিত। শত সংখ্যা শ্লোকেতে হইল বিনির্মিত ॥ ...

অগ্রেতে মূলের শ্লোক করি উপস্থাপন। পশ্চাৎ তাহার অর্থ করিলাম প্রকাশ ॥—

এই অনুবাদও দ্বিজ পীতাম্বর-কৃত বলিয়া মনে হইতেছে।

পুস্তকদ্বয়ের শেষে মুদ্রণকাল ও মুদ্রাকরের নাম এই ভাবে দেওয়া আছে।

সমাপ্তপঞ্চায়মুদ্রবদূতগ্রন্থঃ শ্রীযুক্ত গ্রন্থপাঠকে

যদি কিছু ত্রুটি থাকে রচিত ইহার। বৃদ্ধগণ ক্ষমিবেন সে দোষ আমার ॥

সপ্তদশ শত পুন বেয়াল্লিশ শকে। পুস্তক মুদ্রিত হৈল মাসে ফাল্গুনিক ॥ * * * * *

রায় শ্রীহরচন্দ্র শর্মা মুদ্রাক্ষর যন্ত্রালয়ে

মুদ্রিতসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয় ॥ * * * * *

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীদাস

(আলোচনা)

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি মহাশয় বড় চণ্ডীদাস এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির দেশ-কালাদি নির্ণয়ে প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। বিজ্ঞানিধি মহাশয়ের মতে কবি ও পুথির দেশ বাকুড়া-বিষ্ণুপুর; কবির জন্ম ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, পুথির লিপিকাল ১৫৫০ খ্রী অ°।

তাহার প্রধান অবলম্বন দুইখানি পুথি। এখানে সামান্ততঃ তাহার পরিচয় ও আলোচনা আবশ্যক। একখানি ৭ পাতা নামহীন সংস্কৃত পুথি, নাম দেওয়া হইয়াছে বাসলী-মাহাত্ম্য; ২য় পাতা নাই। বাকী পাতা কয়খানির এক পিঠে লেখা। রচয়িতা পদ্মলোচন শর্মা। শেষ পাতার নীচে ছোট হরপে দুই পঙ্ক্তি কবিতা; তাহা হইতে ১৩৮৭ শক পাওয়া যায়। পুথিতে দেবীদাস ও চণ্ডীদাস দুই সহোদর; পিতা নিত্য-নিরঞ্জন ও মাতা বিদ্যাবাসিনী। ইহারা ভরদ্বাজকুলোদ্ভব। তীর্থপ্রতাগত ভ্রাতৃদ্বয়ের অগ্রতম জ্যেষ্ঠ দেবীদাস [সামন্তভূমির] রাজা হামীর উত্তররায় কর্তৃক বাসলীর পূজক নিযুক্ত হন। চণ্ডীদাসের কবিখ্যাতি ছিল।

এক পিঠে লেখা সম্পূর্ণ পুথি এ যাবৎ আমাদের চোখে পড়িয়াছে বলিয়া স্বরণ হয় না। অবশ্য পুথির প্রথম ও শেষ পাতা এক পিঠে লেখা হইতে পারে এবং হয়ও। আলোচ্য পুথি ৬৩।৭০—বড় জোর ১০০ বৎসরের বেশী পুরান নয়।

এই চণ্ডীদাস বাসলীর বড় অথবা বড় চণ্ডীদাস নহেন, হইলে পদ্মলোচন—দেবীদাসের পুত্র কিবা পৌত্র যেই হউন, নিশ্চিতই সে কথার উল্লেখ করিতেন। পুথি সন্দিগ্ধ। আর প্রাপ্ত পুথির চণ্ডীদাস সংস্কৃত অথবা অল্প কোন ভাষা-কবিও ত হইতে পারেন।

দ্বিতীয় পুথি কৃষ্ণপ্রসাদ সেনের চণ্ডীদাস-চরিত। পুথি খণ্ডিত, পত্রসংখ্যা ৮০; পাতাগুলি তিন দফায় পাওয়া। কৃষ্ণপ্রসাদের প্রপিতামহ উদয় সেনের সংস্কৃত চণ্ডী-চরিতের আদর্শে রচিত। কৃষ্ণপ্রসাদ আনুমানিক শত বর্ষ পূর্বে ছাতনার রাজার গ্রহাধ্যক্ষ ছিলেন। পুথির বর্ণনা হইতে জানা যায়, রাজা হামীর উত্তররায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া চণ্ডীদাস রামীসহ সহজ-সাধন করিতেন এবং অবসরকালে রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক গীত রচনা করিয়া নিত্যাকে শুনাইতেন। রজকিনীও স্বেগায়িকা। রামী-চণ্ডীদাসকে উপলক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুপুর-রাজ গোপাল সিংহের সহিত হামীরের বিবাদ বাধে। মদনমোহন গোপাল সিংহের হইয়া যুদ্ধ করেন, বিপক্ষে বাসলী। লড়াই ভীষণ হইলেও পরে-পশ্চাৎ একটা

১ 'চণ্ডীদাস,' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪২য় ভাগ, ১ম ও ২য় সংখ্যা।

২ 'ছাতনায় চণ্ডীদাস', প্রবাসী, ১৩৩৩, ফাল্গুন।

মিটমাট হইয়া যায়। এই সময়ে চণ্ডীদাসের বয়স তেত্রিশের কোলে। যে দিন মুহম্মদ-বিন-তুঘলক পিতৃহত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসনারূঢ় হন, তৎপূর্বদিবসে অর্থাৎ ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে চণ্ডীদাসের জন্ম। বিষ্ণুপুরে অবস্থানকালীন সুলতান সিকন্দর শাহের (১৩৪৮-১৩৮৯ খ্রী অ°) আহ্বানে চণ্ডীদাস রামীর সহিত পাণ্ডুরা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে এক তান্ত্রিককে দীক্ষাদানান্তর বীরভূম-নান্দুরে গিয়া নিজেকে প্রকট করেন। পাণ্ডুরা পৌছিয়া প্রথমে বিড়ম্বিত এবং সিদ্ধাইপ্রভাবে পরিণামে সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হন। সিকন্দর চণ্ডীদাসের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। কবি নান্দুর-নিরাসী শক্তিনাথ অথবা পার্শ্বতীচরণকে তাহার বংশে চণ্ডীদাস নামেই পুনরাবিভূত হইবেন বলিয়া বর দেন। কএক মাস গোড়েশ্বরের আতিথা অঙ্গীকার করিয়া সমস্থানে বিদায় লয়েন। প্রত্যাবর্তনকালে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে বিজ্ঞাপতির সহিত মিলন হয়।*

খ্রীষ্টাব্দ যোগেশবাবু অত পুরু মস্তনাদেশী কাগজের পুথি দেখেন নাই বলিয়া আমাদের একটু রোঁকী ধরাইয়াছেন। পুথির পাতাগুলি এক স্থানে পাওয়া গিয়াছিল কিনা এবং কাগজ হাতের লেখা এক না পৃথক্, ইত্যাদি আমরা জানিতে পারি নাই।

ডব্লিউ ওমালী (L. S. S. O'Malley) সাহেবের উক্তি অনুসারে ১৩২৫ শকে (১৪০৩ খ্রী অ°) শজ্জরায়নামা জনৈক সৈনিক পুরুষ সামন্তভূমি অধিকার করেন এবং তাঁহার পৌত্র তৎপ্রদেশের সীমা বৃদ্ধি করিয়া রাজা হন।* বাসলীর প্রাচীনতম মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রাপ্ত ইষ্টক-লিপিতে ১৪৭৫ শকে (১৫৫৩ খ্রী অ°) এক হামীর উত্তর-রায়কে পাওয়া যায়। আবার পদ্মলোচনের পুথিতে হামীর ১৩৮৭ শকে (১৪৬৫ খ্রী অ°) অথবা তৎপূর্বে বর্তমান ছিলেন। আর গোপাল সিংহের (১৭১২-১৭৪৮ খ্রী অ°) সহিত হামীর উত্তররায়ের যুদ্ধও সম্ভব না। একাধিক বলিয়া গোপালকে কানাইএ (১৩৪৫-১৩৫৮ খ্রী অ°) টানিয়া তুলিবার প্রয়াস একটু বিচিত্র রকমের নয় কি? একাধিক স্থলে মদনমোহনের উল্লেখও লক্ষণীয়। দিল্লী-সম্রাটের সিংহাসনারোহণের তারিখ সে-দেশে ও সে-কালে উদয়সেন কেমন করিয়া পাইলেন, জানা নিতান্ত দরকার। উপরি উক্ত তান্ত্রিক শ্রোত্রিয় রূপচাঁদের নিরাস চন্দননগর। কিন্তু শহরটি খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকের শেষের দিকে তিনখানি গ্রাম—বোড়ো, খলিসানি ও গোলন্দপাড়া লইয়া চন্দননগর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কবির বীরভূম-নান্দুরে গমন ও পার্শ্বতীচরণকে বরদান ব্যাপারে কি যেন একটা মতলব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। চণ্ডীদাস স্বহঁ শরীরে বহাল তব্বিতে পাণ্ডুরা দরবার হইতে ফিরেন; কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত ২৩৭৫ সংখ্যক পুথিতে তাঁহার হৃদয়-বিদারক শোচনীয় পরিণামের কথাই লিপিবদ্ধ। কৃষ্ণপ্রসাদের পুথির মাল-মণিলা যোগাইয়াছে চণ্ডীদাস ও রামীঘটতি উপাখ্যান-সমূহ। গোড়ীয় বৈষ্ণব সহজ-ধর্মের অভ্যাস মাইপ্রভুর পরে। আমরা অল্প দেখাইতে

৩ 'চণ্ডীদাস-চরিত,' প্রবাসী, ১৩৪২, আশ্বিন।

৪ Bankura District Gazetteer (1908), p. 173.

প্রযত্ন করিয়াছি, বড় চণ্ডীদাসের রজকিনী-প্রসক্তি ও বিজ্ঞাপতির সহিত সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ কাল্পনিক।^১ ভাব কেন, স্থানে স্থানে সহজিয়া ভাষাও অক্ষরশঃ আসিয়া শ্লিষ্যছে। উহাতে স্বদেশী যুগের উচ্ছ্বাস আছে, শুধুনা তন একথানা চণ্ডীদাস নাটকের দুই তিনটা নামও আছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই শ্রেণীর পুথি কতখানি নির্ভরযোগ্য।

মল্লভূমির ছায় বীরভূমিও এক সময়ে নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। সেখানকার বনে আগুন লাগিলে লোকে দেখিত; তীর-ধনুকের সাহায্যে হরিণ শিকার করিত। বৃক্ষ, লতা, ফুল, ফল, উভয় ভূমিরই একরূপ ছিল এবং এখনও আছে। ও-অঞ্চলেও বাঁশ কমই জন্মে। সে দেশে ছোট-খাট পার্শ্বত নদীরও অভাব নাই; এবং বর্ষা ব্যতীত সময়ে ঐ সকল নদী পায়ে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।

প্রাচীন পদে নানুরে বাসলীকে না পাইলেও চণ্ডীদাসকে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস সহজিয়া ছিলেন না; স্তবরাং নিত্যার প্রয়োজনাতাব। আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এর ২য় সংস্করণে দেখাইয়াছি, বাগীধরী—সরস্বতী ও বাসলী এক ও অভিন্ন। তাঁহাকে বিশালাক্ষীও বলা হয়। সরস্বতীর একটি প্রণাম-মন্ত্র এইরূপ,—

সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনি।

বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্ত তে ॥

সে কালে মল্লভূমি ও বীরভূমির ভাষায় বড় একটা পার্থক্য ছিল না। প্রাকৃত এবং প্রাচীন ভাষা-সাহিত্য লইয়া যাহারা একটু বেশী নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এক শব্দের বা বিভক্তির একাধিক রূপ নূতন নহে। তদ্ব্যতীত আখরিয়াগণের অনবধানতায় যাহা কিছু ঘটয়া গিয়াছে। যে কোন একথানা উৎকৃষ্ট কাব্য লইয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিতে বসিলে দেখা যাইবে, উহার কবিত্ব সর্বত্র সমান নহে। চিত্তবৃত্তিকে দ্রবীভূত ও বিষয়াকারে তথা ভগবদাকারে পরিণত করিতে পুনরুক্তির সার্থকতা অবিসম্বাদী। স্তবরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একাধিক কবির রচনা অথবা সংস্কৃত শ্লোক পরে সংযোজিত, ইত্যাদি কল্পনা করিবার কোন যুক্তিসম্মত কারণ নাই।

বন-বিষ্ণুপুরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া উহাই পুথির দেশ বলা যায় না। চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত বহু বহু পদ, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা, চতুর্দশ পদাবলী প্রভৃতিও ও-অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। পুথির কাল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের অভিপ্রায়ই গ্রাহ্য। আমাদের যত দূর জ্ঞানা আছে, এ বিষয়ে তাঁহারা সকলে রাখাল বাবুকেই সমর্থন করেন।

অতঃপর কবি ও পুথির দেশ-কালাদি অবধারণের ভার স্থধী-সমাজের উপর দিয়া আমরা অব্যাহতি পাইতে চাই।

দুঃখের বিষয়, শব্দার্থ সম্পর্কে আমরা যোগেশবাবুর সহিত সর্বত্র একমত হইতে পারি নাই। নীচে অল্প কএকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল। যেখানে যে অর্থ সমীচীন মনে হইয়াছে, সেখানে তাহাই দিবার চেষ্টা করিয়াছি। শব্দের রূপ-পরিবর্তনেরও

একটা ধারা আছে। এই ধারার সহিত পরিচিত হইতে হইলে প্রাকৃত ব্যাকরণের আলোচনা আবশ্যিক। তদুপা শব্দের যথার্থ সংস্কৃত রূপ কোনটি, অন্ততঃ তাহা জানিবার জন্তও প্রাকৃত ব্যাকরণ দেখিতে হইবে। দেশী শব্দের অর্থ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত রূপ কোথায় পাওয়া যাইবে? এই দেশী শব্দের মধ্যে আবার কতক আবিড়, কতক বা কোল (Austro-Asiatic)-মূলক। ঐতদ্ব্যতীত এমন অনেক শব্দ আছে, যেগুলি সংস্কৃত বলিয়া আমাদের জানা ছিল, কিন্তু মূলে তাহা সংস্কৃত নয়। সুতরাং প্রাকৃত কেন, অথবা ভাষার সহিত তুলনামূলক আলোচনারও প্রয়োজন আছে।

অনুবন্ধ শব্দের একটা অর্থ অবিচ্ছেদ্য; ‘চির আনুবন্ধ’ (২য় সংস্করণ, পৃ° ১৭৮) আমরা ঐ অর্থই ধরিয়াছি। অভরস—অধ্যাপক প্লাটস (J. T. Platts) তাঁহার হিন্দী-ইংরাজী অভিধানে ভরোসা শব্দের অর্থ দিয়াছেন, Hope, Confidence, Trust, Faith; স° ভদ্র-আশা। স্তনীতিবাবু ভর-বশ। অভরস শব্দে অবিশ্বাস অর্থ দ্রুত হইয়াছে। অমর্ষ হইতে কি করিয়া হয় বুঝিলাম না। অবসই—নিশ্চিতার্থই সহজ ও সুযুক্ত।

আকাইলেক—‘আকাইলেক কেশ তোর মুঠিএক মাঝা’ (২য় সংস্করণ, পৃ° ৩৫)। ‘আকাইলেক’ শব্দ কেশের বিশেষণ স্পষ্ট। ‘মন টানিলেক’ অর্থ অত্যন্ত কষ্ট-কল্পনা। আছিদর—স° ছিদ্দর, ছিদ্দর। আজল, আজলী—প্রা° উজ্জ (ঝজ্)-ল; জীলিঙ্গে ই প্রত্যয়। [Cf A. ajhal adj most ignorant; s. m. a block head.] আড়বাণী—অগ্র নাম মোহারী নয়। আড়বাণী, আড় ভাবে ধরিয়া বাজাইতে হয়। মোহারী যন্ত্রটি অধুনা তুম্ভী (তুব্ভী) নামে প্রসিদ্ধ (২য় সংস্করণের টীকা দ্রষ্টব্য)। আনচান—< আনচান < অন্নচর < অগ্র চন্দ (২য় সং টীকা দ্র°)। আপোঙম—আ-√পিষ্ পেষণে। রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে হাপসান এবং উত্তর-বঙ্গে আপচান পদের প্রয়োগ লক্ষণীয়। আকার—প্রা° ফার (ফার)। প্রচুর। আছকিত্তে—√আছ্ (অতি-√উচ্ সোচনে); উচ্চারণ-বৈষম্যে আছক’ এবং ইত্বে প্রত্যয় যোগে আছকিত্তে (টীকা দ্র°)। আঁকিবার কালীর উল্লেখ কোথাও নাই।

উতাপঠ—উৎ-√পট্ বিদারণে। খিন্ন, ব্যথিত। উল্লাল—উৎ√লল্-অচ্ বটে। ক্ষোভ, (কৌতুক নয়)।

কচাল—বাক্কলহ, তুল° কচাকচী (চুলাচুলী)। কেশতুল্য সূক্ষ্ম তর্ক এ কল্পনার রশি যেন একটু ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে। কবল দশ হাটল—প্রকৃত পাঠ, ‘হিফিলেক রাধাক বলদ সিংহটাল’। কপোলগণ—শুদ্ধ পাঠ, ‘কপোল গল’। কাঁচ আলিতে না দেও পাএ—কা’র লেঠায় থাকি না। কুকুহলে—শব্দটি কুহুহলে; অর্থ—কুতুহলে, কৌতুহল সহকারে। কুলজী—‘কর কুলজী ঘাটে’—[যমুনার] খেয়াঘাটে কর সংগ্রহের ব্যবস্থা।

খঙ্ক—শিবায়নে খাঙ্ক। অর্থে কাঙ্কাল, (ক্লুদ্র নহে)। খণ্ডবিচনী—‘খণ্ডবিচনীর কিবা বাত্ন তুলী লৈলো’ গাএ’ অর্থাৎ ভাঙ্গা ফুলার (বিচনীর=ব্যজনীর) বাতাস কিবা [স্বেচ্ছায়] শরীরে লাগাইলাস। খঙ্ক—প্রা° খংধ (ক্লুদ্র=সমূহ); কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ‘যণ্ডো মধ্যমঃ’। শাক-সবজী। খাঁট—চর্যাপদে খাঁট, মাধব কন্দলির কিস্কিন্দ্যাকাণ্ডে খণ্ট,

বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে খাট, কাশীদাসী আশ্রমিক পর্বে খণ্ড, কবিকঙ্কণে খণ্ড, খণ্ডা ;
 • অর্থ—ধূর্ত, শঠ। খণ্ড বা খণ্ডা হইতে খাড়াধারী দস্তা হয় কি? খাড়ু—বৈদিক। যদি
 হইতে পারে; কিন্তু খাড়ু শব্দ প্রা° খড়্‌অ (কটক) শব্দজাত। খেউ মতী—শুদ্ধ পাঠ;
 ‘মোর বুধী তো রাখউ মতী’, ফলিতার্থ—আমার গোআল-বুদ্ধি তোমার [চঞ্চল] মতিকে
 [অবশস্তাবী পরিণাম হইতে] রক্ষা করুক।

গড়াহলি (২য় সং, পৃ ৩৬)—গড়াগড়ি দিও, অবলুপ্ত হইও; তুল্য ‘করিহলি
 উপহাসে’ (পৃ ১৩)। গহনে—চর্যাপদে গবণ, কৃতিবাসী লঙ্কাগুণ্ড ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে
 গন। গহন, গবন, গন প্রভৃতি শব্দের মূলে গমন। প্রাচ্য হিন্দীতে গমনার্থক গবন
 শব্দের প্রয়োগ অবিরল। মৈথিলী ভাষায় গওনা বা গরনা অর্থে দ্বিরাগমন। [গোহন
 —(চাসীর ভাষা) The inclined path along which the bullocks move in
 drawing water from a well—J. T. Platts’ H. E. Dictionary.] গোবালী
 —গোপাল’এর প্রা° রূপ গোবাল; জ্বিলিঙ্গে গোবালী; (গোপবালী’র প’ লুপ্ত নয়)।

ঘোড়াচুলে—‘কাকপক্ষবৎ ঘোড়াচূড় ইতি খ্যাতে। কুমারাণামুপনয়নকৃতে শিখাপক্ষক
 ইত্যন্তে।’ টীকা-সর্বস্ব। [Kākapaksa (p. 357)—Ghoṭa-Cūḍa (Tbh. Sk. goṭha-
 cūḍā)—Journal Asiatique, Paris, Sep. 1926, p. 94.]

চৌহালিনী—আনন্দময়ী, আমোদপ্রিয়, ক্রীড়ানুরক্তা; (চৌহান রাজপুতনারীতুল্য
 ডাকাবুকা অথবা চোয়াড় নারী নহে)। [হিন্দী চুহলী, চুহলিয়া adj. & s. m.
 Merry, gay, amusing;—a merry fellow.—J. T. Platts’ H. E. Dictionary.]

ছাঁচে—মিছে ছাঁচে, অর্থ—মিথ্যা ছন্দে, ছলাকলায়, (মিথ্যা ও সত্যে নয়)।
 [ছাঁচ—হিন্দী সাঁচ। সদৃশ, চব, mould.]

জুলি—শুদ্ধ পাঠ, ‘ভাগি জুলি জাএ’, ‘ছিণ্ডি জুলি জাএ’; অর্থ—ভাসিয়া যেন
 না যায়, ছিঁড়িয়া যেন না যায়।

ঝাঁটাল বন—ঝাঁটাল, ‘গোলীঢ়ো ঝাঁটলো ঘণ্টা-পাটলির্মোক্ষমুক্কো।’ অমরঃ
 [ঝাঁটাল—H. H. Wilson’s S. E. Dictionary]

টাকার—অর্ধটান সং টাকার।

তত্তী—√তুণ্ড্ আঘাতে। তারপিল—শব্দটা তারপল; বিস্তাপতিতে তলপল;
 পশ্চিম-রাঢ়ে√তড়পা প্রচলিত। অস্থির করিল, আকুল করিল।

দশমী ছয়ার—‘গগনং ব্রহ্মরন্ধ্রং দশমদ্বারমিতি যাবৎ।’ [পুরমেকাদশদ্বারমিত্যাদি
 মন্ত্রের তাষে শব্দর লিখিয়াছেন, ‘তচ্ছেদং শরীরাখ্যং পুরম্ একাদশদ্বারং; একাদশ দ্বারাগন্ত—
 সপ্ত শীর্ষণ্যানি, নাভ্যা সহস্রাঙ্কি জীণি, শিরস্ত্রেকং তৈরেকাদশদ্বারং পুরম্।’ সিদ্ধাচার্যেরা
 দশম দ্বারের বৈরোচন দ্বার আখ্যা দিয়াছেন।] আমরা কিন্তু কণ্ঠনালীর দ্বার কুজাপি
 পাই নাই। দেহার দেব—দেবের দেব মহাদেব। [দেহা<দেআ<দেবঅ<দেবক]
 অথবা দেহের অধিষ্ঠাতা জীবাশ্ম। দেউলের দেব কোথা হইতে আসে?

নোকা—‘পাণি লইছে মোকটে’ মোচা-খোলা পাণি লইতেছে, তাহার ভিতর জল ঢুকিতেছে। মোকট শব্দে মোচার খোল পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। পাণিফুটি—জলটুকু; অল্পপরিমিত তরল পদার্থ বুঝাইতে উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গে ‘ফুটি’ শব্দ প্রযুক্ত হয়।

পরসিলছে (২য় সং, পৃ° ১২৯)—শব্দটা পরসরিলছে, অর্থ—প্রহার করিতেছি বা করিলে। পশ্চিম-বঙ্গে পসার ও পসার’র প্রয়োগ লক্ষণীয়। পাসলী—পায়ের আঙ্গুলের কড়া, (পায়জোর নয়)।

বস্তল—বরণ বস্ত্রকুল হইতে বস্ত্রল হইলে পারে; কিন্তু বস্ত্রপুত্র হইতে নয়। রাজকুল হইতে রাউল; রাজপুত্র হইতে নয়। বাড়ী—যষ্টি বা যষ্টি-প্রহার অর্থে বর্দ্ধমান, বীরভূম, হুগলী, ২৪ পরগণা অঞ্চলে প্রচলিত। বিহড়ায়—বি-ঘট বিযুক্তকরণে; (বিহৃত করে নয়)।

ভাষ—সং ভাস, (ভাষা নয়)।

রাপাইল—ইপাইল? রাহী—কদমতলাত রাধা রাহী—রাধা ও আয়ী, কষ্ট-কল্পনা।

সবসলি—শর ও শলি (শল্য)। সাতেসরী—সপ্তসরী-ই যেন সমীচীন মনে হয়।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

সংস্কৃত-সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা

বাংলা সাহিত্যে অগণিত মুসলমান কবির দান ও একাধিক মুসলমান নরপতির আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রেরণার উদাহরণ প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যসেবী মাত্রেয় নিকটই সুপরিচিত। এই প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মুসলমানগণের উৎসাহ ও সাহায্যে পরিপুষ্ট বাংলা সাহিত্য কেবলমাত্র মুসলমান সংস্কৃতির প্রচারে ব্যাপ্ত হয় নাই, পক্ষান্তরে প্রধানতঃ ইহা হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির অমূলক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। হিন্দুর পুরাণাদির অমূল্যবাদ ও হিন্দুর সম্প্রদায়বিশেষের উপাখ্যান এই সাহিত্যের বহুল অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

পরকীয় সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি মুসলমানগণের এই অমূল্য-কেবল প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্য দিয়াই অভিব্যক্ত হইয়াছে, এমন নহে—সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেও ইহার প্রচুর নিদর্শন রহিয়াছে। আকবর প্রভৃতি রাজগণের উদ্যোগে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পারসীক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল এবং সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে হিন্দুর জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে একাধিক স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল—এ সকল কথা পণ্ডিতসমাজে অল্পবিস্তর সুবিদিত।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের দিক দিয়া এই সকল গ্রন্থের মূল্য উপেক্ষণীয় নহে। অনূদিত ও আলোচিত গ্রন্থের মধ্যে এমন কতকগুলি আছে, যেগুলির সংস্কৃত মূল বর্তমানে অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। সুতরাং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কতক এই সকল পারসীক গ্রন্থের আলোচনা হইলে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে এবং মুসলমানগণের সংস্কৃতভিজ্ঞতার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই দিকে তেমন কোনও আলোচনাই এ পর্যন্ত হয় নাই।

-
- ১। Elliot—*History of India*, মে. খণ্ড, পৃঃ ৫৭০-৫; J. J. Modi—*King Akbar and the Persian Translation of Sanskrit Books* (Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, মে. খণ্ড (১৯২৫), পৃঃ ৮০-১০৭; M. Z. Siddiqui—*The Services of the Muslims to the Sanskrit Literature* (Calcutta Review, ১৯৩০, পৃঃ ২১৫-২৫), N. Law—*Promotion of Learning in India during Muhammadan rule* (by Muhummadans) পৃঃ ১৪৭-৫০, ১৮৫ প্রভৃতি। জীবরকৃত রাজতরঙ্গিনীর পরিশিষ্ট হইতে জানা যায় যে, 'কাশ্মীরের আকবর' জাইনউল-আব্বিনের প্রয়োজকতায়ও এইরূপ বহু গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল। জীবর লিখিয়াছেন,—

দশরতরপুত্রীশ-গ্রন্থরাজ-তরঙ্গিনীঃ।

সংস্কৃতঃ পারসীবাচা বাচকাঁহীস্বকারয়ৎ॥

য়েচ্ছের্ব হংকথাসারং হাটকেধরসংহিতাঃ।

পুরাণাদি চ তদ্যুক্তা বাচ্যতে নিজভাষয়া ॥ (জীবরকৃত রাজতরঙ্গিনী—১৫৮৫-৬)।

উল্লিখিত অনুবাদাদি গ্রন্থ প্রণয়ন ছাড়া মুসলমানগণ সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার-কল্পে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য কার্য করিয়াছিলেন, তাহারও কোন বিবরণ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমার জ্ঞান নাই। অথচ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণকে বৃত্তি ও উপাধি দান করিয়া অনেক মুসলমান রাজা তাহাদিগকে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করিয়াছেন—কেহ কেহ প্রত্যক্ষ নির্দেশসহকারে গ্রন্থবিশেষ রচনা করাইয়াছেন, প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে যে সকল বৃত্তান্ত আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা দরকার যে, কেবলমাত্র মুসলমান সংস্কৃতি বা সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ অতীব বিরল। বস্তুতঃ, ইরাণীয়দিগের আবেস্তা ও খ্রীষ্টানদিগের বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদের মত কোরণ শরীফের কোনও সংস্কৃত অনুবাদ প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান যায় নাই। তাই মনে হয়, সংস্কৃত পণ্ডিতগণের প্রতি আলুক্য ও উৎসাহ-প্রদর্শন মুসলমান নরপতিগণের পাণ্ডিত্যপ্রীতি ও সাহিত্যানুরাগেরই নিদর্শন। কলাবিজ্ঞান, অভিধান, কাব্য প্রভৃতি সাধারণের রুচিকর বিষয়েই তাহাদের অমুরাগ ছিল বলিয়া মনে হয়।

যে সকল ভারতীয় মুসলমান নরপতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গকে অভিনন্দিত ও উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বাংলার জালালুদ্দীনই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। সত্বে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত জালাল এ বিষয়ে পিতা রাজা গণেশের অনুসৃত রীতিরই অনুবর্তন করিয়াছেন। তিনি বৃহস্পতি নামক বিবিধ গ্রন্থরচয়িতা প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে ছয়টা উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রায়মুকুট উপাধি প্রদানের সময় একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়া-

২। মুসলমান নরপতির আদেশে বা সন্তোষ বিধানার্থ রচিত মাত্র একখানি পারদীক গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদের কথা এ পর্যন্ত জানিতে পারিয়াছি। কাশ্মীররাজ মহম্মদ শাহের সন্তোষার্থ জীবর পণ্ডিত প্রসিদ্ধ পারদীক কবি জামিবিরচিত যুহফ জোলেখার প্রখ্যাত কাহিনী অবলম্বন করিয়া কথাকৌতুক নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও জর্জ বুন্যার ইহার দুইখানি পুথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন (Notices of Sans. Mss. ৮২৫৮৫; Detailed Rept. of a tour of search of Sans. Mss. Kashmir, Rajputana and Central Ind. পৃঃ ৬১)। ‘কারামালা’য় ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। পুনর Oriental Book Agencyর কাটালগ (১৯০০। নং ১১১) হইতে জ্ঞান যায়, Schmidt সাহেবের সম্পাদকতায় ইহার এক ইউরোপীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল—কিন্তু উহা আমি দেখি নাই। উত্তরকালে আধুনিক যুগে কাশ্মীরের হিন্দু রাজা রণবীরসিংহের আদেশে সাহিবরাম কতক একরূপ আর একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহার নাম বীররত্নশেখরশিখা। ইহা অখলাক-ই-মোহ-সিনী গ্রন্থের অনুবাদ। ইহার পুথির বিবরণ রঘুনাথ টেম্পল লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুথির টাইটলকৃত কাটালগে প্রদত্ত হইয়াছে।

৩। এ সম্বন্ধে Journal of the Asiatic Society of Bengal নামক পত্রিকায় (১৯২৮। ৪৬৫—৬) প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, খ্রীষ্টান মিশনারিগণ ভারতীয় পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কেবল বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই। পক্ষান্তরে হিন্দু বেদ ও পুরাণের অনুকরণে একাধিক পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে বেদের অনুকরণে রচিত ও বেদনামে প্রচারিত গ্রন্থই সমগ্রিক চমকপ্রদ (Asiatic Researches এর ১৪শ খণ্ডে এফ. এলিস লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁহাকে হাতীর উপর আরোহণ করান হইয়াছিল এবং হার, মুক্তাখচিত
কুণ্ডল প্রভৃতি বিবিধ উজ্জ্বল অলঙ্কার ও বহু অর্থ তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ
তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল।*

হুমায়ূনের সমসাময়ের দিল্লীর অধিপতি সালেম সাহ সারস্বতপ্রক্রিয়া নামক ব্যাকরণ
গ্রন্থের টীকাকার চন্দ্রকীর্তির সমাদর ও সম্মান করিতেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।*

এই সকল উৎসাহদাতার মধ্যে প্রখ্যাতনামা আকবরই বোধ হয় সমধিক প্রসিদ্ধ।
তাঁহারই নির্দেশক্রমে বিট্ঠল নামক পণ্ডিত ‘নত’নির্ণয়’ নামক নৃত্যবিষয়ক গ্রন্থ রচনা
করিয়াছিলেন।* সুলতান বুরহান খাঁর নির্দেশানুসারে এই বিট্ঠলই বোধ হয়, সঙ্গীত সম্বন্ধে
যড্‌রাগচন্দ্রোদয়’ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের পারসীভাষা শিক্ষার সৌকর্যসাধনার্থে আকবর সংস্কৃত-ভাষায়
একখানি পারসী ভাষার ব্যাকরণ লিখাইবার ব্যবস্থা করেন। এই গ্রন্থখানির নাম পারসী-
প্রকাশ, রচয়িতা কৃষ্ণদাস।* ইহার স্ত্রুতসংখ্যা ৪৮১। ইহা আট অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলির
নাম—সংখ্যাশব্দনির্ণয়, শব্দপ্রকরণ, কারকপ্রকরণ, সমাসপ্রকরণ, তদ্ধিতপ্রকরণ, আখ্যাত-
প্রকরণ, কৃত্যপ্রকরণ। এক যুগে এই গ্রন্থের আদর ছিল বলিয়া মনে হয়—ইহার অনেকগুলি

৪। জ্যোতিষমণিপুঞ্জরঞ্জনরচিঃ হারং জলৎকুণ্ডলে রত্নোঘচ্ছুরিতা দশাঙ্গুলিভূষঃ শোচিস্বতীর-
মিকাঃ। যঃ প্রাপ্য দ্বিরদোপবিস্টকলম্মানৈরবিন্দম্ পাচ্ছত্রে তৈস্তুরগৈশ্চ রায়মুকুটাবিখ্যামভিধাবতীম্।
Descriptive Cat. Sans. Mss. Ind. Office.—২।১৫৪-৫।

৫। শ্রীমৎসাহিনলেমভূমিপতিনা সম্মানিতঃ সাদরম্।

স্মরিঃ সর্বকালিনিকাকলিতধীঃ শ্রীচন্দ্রকীর্তিঃ প্রভুঃ॥

Belvalkar—Systems of Sans. Grammar. পৃঃ ১৮, পাদটীকা ২। সারস্বত ব্যাকরণের
টীকাদিরচয়িতা আরও দুই একজনের গ্রন্থে মুসলমান নরপতিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সারস্বতপ্রক্রিয়ার
টীকাকার পুঞ্জরাজ মালবের গিয়াসউদ্দীন খিলজীর মন্ত্রী ছিলেন। তর্কতিলক ভট্টাচার্য জাহাঙ্গীরের রাজত্ব-
কালে সারস্বতস্ত্রের এক টীকা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন—ঐ টীকা হইতেই এরূপ কথা জানিতে পারা যায়।
সম্ভবতঃ এই সকল নামের উল্লেখ দৃষ্টে শ্রীযুক্ত শ্রীধর বেলবলকর অনুমান করিয়াছেন যে, এই সকল মুসলমান
নরপতি স্বলায়াসগ্রাহ্য সারস্বত ব্যাকরণের অনুশীলনে উৎসাহ দিয়াছিলেন (‘System etc. পৃঃ ১৩)। কিন্তু
এই নামমাত্রের উল্লেখ হইতে এতটা অনুমান করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা বিবেচ্য। বস্তুতঃ, স্পষ্ট ইঙ্গিত
না থাকিলে কেবল নামমাত্রের উল্লেখ হইতে আলোচ্য প্রবন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই। ফলে,
টোডরমল সংকলিত টোডরানন্দ ও ভুবনানন্দ সংকলিত বিখপ্রদীপ গ্রন্থে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে আকবর ও শেরশাহের
উল্লেখ থাকিলেও এবং এই দুই গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহাদের উৎসাহদানের কথা মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
প্রভৃতি (বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর পুথির বিবরণ—৩। ভূমিকা পৃঃ ২৫) কেহ কেহ অনুমান করিলেও স্পষ্ট
নির্দেশের অভাবে এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য, এইরূপ অনেক
নরপতির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ সংস্কৃত বহু গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৬। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর পুথিখানায় ইহার একখানি পুথি আছে। ঐ পুথি অবলম্বন করিয়া
শ্রীযুক্ত অরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ‘হরপ্রসাদ সংস্কৃতলেখমালা’য় (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭—১৩) ইহার
এক বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

৭। এই গ্রন্থ বোম্বাই, মালাবার হিল হইতে ভালচন্দ্র সীতারাম মুখর্জীর কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

পুথি পাওয়া যায়। ১৯১২ সালে Indian Antiquary পত্রে (পৃঃ ৪৪ প্রভৃতি) ডি. এম. ঘাটে মহাশয় এই গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। তৎপূর্বেই ১৮৮৮ সালে ওয়েবর কর্তৃক জার্মান ব্যাখ্যাসহ ইহার এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

গঙ্গাধর নামক এক ব্যক্তি আকবর সাহির নির্দেশানুসারে ‘নীতিসার’ নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এই আকবরসাহি প্রসিদ্ধ আকবরের সহিত অভিন্ন হইলেও হইতে পারেন। ইহার একখানি পুথির বিবরণ বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর পুথির বিবরণের মধ্যে (৭৫৫০৫) পাওয়া যায়।

একাধিক পণ্ডিত আকবরের নিকট হইতে উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ‘মুহূর্তমল্লা’ নামক জ্যোতিষগ্রন্থের রচয়িতা রঘুনাথের পিতা নৃসিংহ আকবরের নিকট হইতে স্বীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিদর্শনস্বরূপ ‘জ্যোতির্বিৎসরস’ এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।^৮ মনে হয়, এই নৃসিংহ ও আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে প্রদত্ত পণ্ডিতের তালিকায় উল্লিখিত নরসিংহ^৯ একই ব্যক্তি।

কাদম্বরী নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গল্পকাব্যের পূর্বাধ ও পরাধের টীকারচয়িতা ভানুচন্দ্র ও সিদ্ধচন্দ্র আকবরের নিকট হইতে যথাক্রমে উপাধ্যায় ও মুস্বাহম (?) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহাদের টীকার পুস্তিকায় উল্লিখিত হইয়াছে।^{১০}

শুনা যায়, তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা নারায়ণ ভট্টকে জগদগুরু এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।^{১১} আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত নারায়ণ^{১২} ও এই নারায়ণকে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

টোডরনন্দ, তাজিক প্রভৃতি রচয়িতা নীলকণ্ঠ ও ইহার প্রদত্ত সম্মানে গৌরবাধিত হইয়াছিলেন।^{১৩}

হরিহরাবলী, পদ্মামৃততরঙ্গিনী, স্মৃতিস্মৃতিবলী, স্মৃতিস্মৃতিসার-সমুচ্চয় প্রভৃতি সৃষ্টিগ্রন্থে আকবরীয় কালিদাস নামক এক কবির কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।^{১৪} কবির এই উপাধি স্বগৃহীত, কি আকবর-প্রদত্ত, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

৮। শাহাকবরসাহাভৌমতিলকাদিল্লীমতলীখরাজ্যোতির্বিৎসরসমুদ্রাপ পদবীমাসেরিভূগ্নগ্রহে ॥

Desc. Cat. Sans. Mss. in the Asiatic Soc. Bengal—তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৬৭।

৯। Indian Historical Quarterly—১০।৩৩।

১০। ভানুচন্দ্র-লিখিত অংশের পুস্তিকা :—

পাতিশাহ জীঅকবরপ্রদাপিতোপাধ্যায়পদধারকঃ...। ভানুচন্দ্র গ্রন্থের প্রারম্ভেও আকবরদত্ত সম্মানের উল্লেখ করিয়াছেন :—

জীবাচকঃ সম্প্রতি ভানুচন্দ্র অকবরসম্মাপতিদত্তমানঃ।

সিদ্ধচন্দ্র-লিখিত অংশের পুস্তিকা :—

জীঅকবরপ্রদত্ত মুস্বাহমাপরাভিধানমহোপাধ্যায়ঃ...।

১১। Desc. Cat. Sans. Mss. As. Soc. Beng, ৩য় খণ্ড, Preface পৃঃ XXVIII.

১২। Ind. Hist. Quarterly—১০।৩৪।

১৩। Hist. of Dharmasastra—Kane, পৃঃ ৪২২

১৪। Desc. Cat. Sans. Mss. As. Soc. Beng. ৭।৫৪৫৪, Peterson—Second Rept. Search of Sans. Mss পৃঃ ৫৭, Bhandarkar Rept. Search of Sans. Mss. Bomb. Presi. (1887-91) পৃঃ LXII.

যে সমস্ত পণ্ডিত আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের প্রসাদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তাজিকরচয়িতা নীলকণ্ঠের পুত্র গোবিন্দ শর্মা,^{১৫} কবিকর্ণপুর প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। কবীন্দ্রের অনুজ কামরূপবাসী করণবংশীয় কবিকর্ণপুর জাহাঙ্গীরের নির্দেশক্রমে সংস্কৃত পারসীপদপ্রকাশ নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।^{১৬} পারসী ভাষার একখানি ব্যাকরণও তিনি সংস্কৃত পক্ষে রচনা করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর নিজে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন কি না, বলিতে পারা যায় না। তবে কাব্যালঙ্কারসূত্রের একখানি পুথিতে সেলিম নামাঙ্কিত মুদ্রা দৃষ্টে মনে হয়, তাঁহার গ্রন্থাগারে সংস্কৃত পুথিও ছিল।^{১৭}

জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজাহানের বিছোৎসাহিত্যও কম ছিল না। ইহার সন্তোষবিধানের জন্ত বেদান্তরায় পারসীপ্রকাশ নামক জ্যোতিষবিষয়ক কোষগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।^{১৮} ইনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী কবীন্দ্রাচার্যকে ‘সর্ববিজ্ঞানিধান’ এই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। বারানসী ও প্রয়াগে তীর্থ-যাত্রীদের নিকট হইতে কর আদায়ের যে প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদকল্পে কবীন্দ্রাচার্য বহুজন সমভিব্যাহারে সাজাহানের দরবারে উপস্থিত হইলে এই উপাধি প্রদত্ত হয়।^{১৯} কথিত হয় যে, পরশুরাম মিশ্র নামক প্রবীণ পণ্ডিতকে সাজাহান ‘বাণীবীলাস রায়’ উপাধি প্রদান করেন।^{২০} সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ইহারই সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—এই ‘দিল্লীবল্লভেরই’ ‘পানিপন্নবতলে’ তিনি নবীন বয়স কাটাইয়াছিলেন।

কাশ্মীরের জাইন-উল-আবিদিনের সংস্কৃতানুবাদের উল্লেখ ইতঃপূর্বেই করা হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থের পারসীক অনুবাদ প্রণয়ন করাইয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। সংস্কৃত পুথি সংগ্রহেও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল বলিয়া মনে হয়। তিনি অর্থ ও সংগৃহীত পুথি নানা-স্থান হইতে আনীত পণ্ডিতদিগকে দান করিতেন^{২১}—পণ্ডিত পোষণ করিতেন—নিজে যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণের পাঠ শুনিতেন।^{২২}

১৫। Desc. Cat. Sans. Mss. As. Soc. Beng.—৩। ৭৬৮।

১৬। শ্রীমজ্জহাঙ্গীরমহেন্দ্র ভূপরসামাধ (?) নিদেশরূপম্। করোতামঃ সংস্কৃতপারসীপদপ্রকাশং কবিকর্ণপুরঃ ॥ এই প্রসঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (১৯২৮, পৃঃ ৪৭০) প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৭। Kavindracharya's List (Gaekwad's Oriental Series)—Foreword—p. IV.

১৮। নত্বা শ্রীভুবনেশ্বরীং হরিহরৌ লবোদ্রাদীনু দ্বিজান্। শ্রীমচ্ছাহজাহাননরেন্দ্রপরমহীতিপ্রসাদাশুয়ে ॥ কৃতা সংস্কৃতপারসীকরচনাভেদপ্রদং কৌতুকং। জ্যোতিঃশাস্ত্রপদোপযোগিনরলং বেদান্তরায়ঃ স্রবীঃ ॥

১৯। Kavindracharya's List—Foreword পৃঃ ৫।

২০। শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ—Saraswati Bhavan Studies, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১—৪।

২১। পুরাণতর্কমীমাংসাঃ পুস্তকানপানপি। দুরাদানাযা বিত্তেন বিবদভ্যাঃ প্রতাপাদয়ং ॥ (শ্রীবরকৃত রাজতরঙ্গিণী—১।৫।৭৯)

বর্বা মরুদিব স্নাপ্তং বিজ্ঞাপ্রত্যয়োংস্ককঃ। অনায়ং স তান্ সর্বান পণ্ডিতান্ নিজমণ্ডলম্ ॥

রাজা সংরোপিতানর্ধবৃত্তিদানেন পণ্ডিতান্। অপায়মজ্জলেনেব মালাকারো মহীকহান্ ॥

জোনরাজকৃতরাজতরঙ্গিণী—১০৪৮, ১০৫০।

২২। মোক্ষোপায় ইতি ধ্যাতং বাশিষ্ঠং ব্রহ্মদর্শনম্। সমুখাদশৃণোচ্চ রাজা শ্রীমদ্বাঙ্গীকিভাষিতম্ ॥

শ্রীবরকৃতরাজতরঙ্গিণী—১।৫৮০।

অসালতিপ্রকাশ নামক এক কোষগ্রন্থ^{১০} কাস্মীরের অসালতি খাঁর নির্দেশক্রমে মীর-মীরা-সুত কতৃক বিরচিত হইয়াছিল। আবার এই মীরমীরা-সুতের আদেশে বেণীদত্ত পঞ্চতত্ত্বপ্রকাশ নামক এক গ্রন্থ^{১১} রচনা করিয়াছিলেন।

পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ বারভুইয়ার অগ্রতম ইশা খাঁর পুত্র মুসাখাঁর (১৫৯৯—১৬২৩) আদেশে মথুরেশ শম্ভরদ্বাবলী নামে এক সংস্কৃত অভিধান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।^{১২}

লৌদীবংশাবতংস অহম্মদ খাঁর পুত্র লাড়খাঁ নামক নরপতির মনোরঞ্জনের নিমিত্ত কল্যাণমল্ল অনঙ্গরঙ্গ নামক কামশাস্ত্রের বই লিখিয়াছিলেন।^{১৩}

বাংলার সুপ্রসিদ্ধ নবাব শায়েস্তা খাঁ কেবল প্রজাদের ঐহিক সুখসমৃদ্ধির দিকেই দৃষ্টি রাখিতেন, এমন নহে—দেশের সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারই পরিতৃপ্তির জন্ত ১৭৮৫ শাকে চতুর্ভূজ কতৃক রসকল্পদ্রুম নামে একখানি

২৩।

শ্রীশঙ্করকৌতুকরামলকাস্তপুত্র
বিল্বজমাগণিরিজাচরণৌ প্রণমা।
কাস্মীরভূমিনগরে প্রকরোতি কোশং
শ্রীমানসালতিমহীধরখাননাম্না ॥

... ..

রাজ্ঞানালতিখানেন গুণিনা প্রেরিতোহস্মাহম্।
অসালতিপ্রকাশখ্যাং কোশং কুবে মহাশুগম্ ॥
শুভশঙ্কস্বর্ণাঢ্যং পদানুপ্রাসদমগমি।
মীরমীরা-সুতঃ কোষং দত্তে গৃহস্থ সদ্ধুখাঃ ॥

Oxf. (অউফে কট সংকলিত বোডলিয়ন লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুথির বিবরণ)—888।

২৪। পঞ্চতত্ত্বপ্রকাশোৎসব বেণীদত্তেন ধীমতা। প্রকাশিতঃ প্রকাশার্থৌ মীরমীরা-সুতাজ্ঞয়া। Desc. Cat. Sans. Mss. As. Soc. Beng. ৬। ৪৭০৯ A; R. L. Mitra. Notices of Sans. Mss.—৬। ১৪০৭.

২৫। Desc. Cat. Sans. Mss. Ind. Office Lib.—২। ১০৬-৭; Oxf. No. 439-40; R. L. Mitra—Notices Sans. Mss. ৩। ১১-৫; ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪২, পৃঃ ৬০৬—১৮, আশ্বিন ১৩৪৩, পৃঃ ৫৭২—৭।

২৬।

লৌদীবংশাবতংশো হতরিপুবনিতানেজবারিপ্রপূর-
প্রাচুর্ভূতাস্থ সিদ্ধধূমিতজবতয়া লীলয়া প্রাবিতাখাঃ ॥
সংপুত্রঃ খ্যাতকীতে রহমদনুপভেঃ কামসিদ্ধান্তবিদ্বান্
জীয়াস্ত্রীলাড়খানঃ ক্ষিতিপতিমুকুটেষ্টপাদারবিন্দঃ ॥
অশ্বেষ কোতুকনিমিত্তমনঙ্গরঙ্গগ্রন্থং বিজ্ঞাসিজনবল্লভমাতনোমি।
শ্রীমান্ কবিরশেষকলাবিদগ্ধঃ কল্যাণমল্ল ইতি ভূমিমুনির্ধরশ্বী ॥

এই গ্রন্থখানি লাহোর হইতে মতিলাল বানারসীদাস কতৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল^{২৭}। ইহার উপক্রমাংশে শায়েস্তা খাঁর বিস্তৃত বংশপরিচয় দেওয়া হইয়াছে

মুসলমান নরপতিগণের সংস্কৃতানুসারগণের আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ—স্থানবিশেষে সংস্কৃতকেই দরবারের ভাষার মর্যাদা প্রদান। কাশ্মীরে মুসলমানদের কবরের উপরও কোথাও কোথাও সংস্কৃতলিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ একটি লিপির তারিখ ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দ।^{২৮} একজন মুসলমান শাসক স্বীয় কৃত কার্যের বিবরণ সংস্কৃতলিপিতে প্রস্তরের উপর উৎকীর্ণ করাইয়া গিয়াছেন। দিনাজপুরের অন্তর্গত ধুরাইলে এই লিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, মহম্মদসার শাসনকালে নরবাজ খাঁর পুত্র প্রধান মন্ত্রী করাম খাঁ একটি সেতু নির্মাণ করাইয়াছিলেন।^{২৯} বাংলার নবাব সিরাজ উদ্দৌলা মাতামহ আলিবর্দি খাঁর পারলৌকিক কৃত্য উপলক্ষে সংস্কৃত পত্র দ্বারা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।^{৩০}

মুসলমানরচিত সংস্কৃতগ্রন্থাদির বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে বঙ্গের সপ্তগ্রাম-বিজ্ঞেতা জরাফ খাঁ ওরফে দর্যফ খাঁর রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ একটি গঙ্গাস্তোত্র বাংলাদেশে প্রচলিত আছে।^{৩১} শুনা যায়, প্রসিদ্ধ কবি আবদুর রহিম খান খানান সংস্কৃতে খেটকৌতুক নামক একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, তাঁহার রচিত মদনাষ্টকের প্রতি কবিতার প্রত্যেক পঙ্ক্তির অর্ধাংশ সংস্কৃতে ও অর্ধাংশ হিন্দীতে রচিত—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।^{৩২}

মুসলমানের হস্তলিখিত সংস্কৃতগ্রন্থের একখানি পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, বর্তমানে ইহা কাশীর সরস্বতীভবনে রহিয়াছে। পুথিখানি বামনমূত্রবৃত্তি নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের। আল্লাবক্স কতৃক ইহা সর্ববিজ্ঞানিধান কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতীর জন্ত লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।^{৩৩} কথিত হয় যে, আল্লা বক্স কবীন্দ্রাচার্য কতৃক লেখকরূপে

২৭। তন্ত্রানুরঞ্জনায়েব গ্রন্থং নবরসাত্মকম্। চতুর্ভুজো রচয়তি স্বপদৈশ্চ পৱৈরপি ॥

... ... বাণাশর্ষিশাঙ্কাকে বৈশাখে পূর্ণিমাগুরো ॥

Peterson—Catalogue of Sans. Mss. in the Library of the Maharaja of Ulwar—
Extract No. 225.

২৮। Stein—Khalhana's Chronicle of the Kings of Kashmir—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩০,
পাদটীকা ২; Z. D. M. G.—৪০৯; Indian Antiquary—২০।১৫৩।

২৯। Niradbandhu Sanyal—List of Inscriptions in the Museum of the
Varendra Research Society, Rajshahi—পৃঃ ১৪।

৩০। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে—উদ্ভটনাগর, ৩৭৪।

৩১। Journ. As. Soc. Beng.—১৬।৩৯৬।

৩২। ভারতবর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৪৩, পৃঃ ২৬৫।

৩৩। Kavindracharya List—Introduction. p.XIII.

নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আর কোনও গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন কি না, জ্ঞা যায় নাই।

মুসলমানগণের এইরূপ সাহিত্যপ্রীতির ফলেই বোধ হয়, কেহ কেহ মুসলমান শাসনগণের অল্পকূল দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সংস্কৃত-তঁাহাদের জীবনবৃত্তান্ত সংকলন বা প্রশংসা রচনা করিয়াছিলেন। আরবরকে রুতজ পণ্ডিতেরা কেবল দিল্লীশ্বর যদি পরিতৃপ্ত না হইয়া জগদীশ্বর আখ্যা দিয়াছিলেন। তঁাহার সম্বন্ধে রচিত কোনও স্বতন্ত্র গ্রন্থ এখন পর্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই। তবে এশিয়াটিক সোসাইটীর পুথিশালার রক্ষিত জালামুখীস্তোত্রের একখানি পুথির শেষে তঁাহার এক ক্ষুদ্র প্রশংসিত দেখিতে পাওয়ায়।* হযত এইরূপ আরও বহু প্রশংসিত রচিত হইয়াছিল। অত্যাচার রাজগণ সম্বন্ধে র্যাহার স্বতন্ত্র গ্রন্থের মধ্যে বিজয়পুরকথা, ফতেসাহপ্রকাশ, অসফরিলাস, আহমদাবাদের হুলত মহম্মদসার জীবনচরিত রাজবিনোদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য**।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

৩৪। Desc. Cat. Sons. Mss. As. Sac. Beng—৭৮৬৪৮।

৩৫। ত্রিযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে সংকলিত 'উদ্ভটমাগর' নামক গ্রন্থে (১২৩, ৭৭৩—৭৭) বিভিন্ন মুসলমান নরসম্বন্ধে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ, নায়কগোপাল প্রভৃতি রচিত কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

বন্ধিম-গ্রন্থাবলী

জন্ম-শতবার্ষিকী সংস্করণ

[সমগ্র বাংলা-ইংরেজী রচনা ও পত্রাদি]



বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রদত্ত
সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশের যে উদ্দেশ্য
স্বার্থে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা সমস্ত
সাহিত্যিকের সম্মুখে প্রকাশিত হইবে।
১৯৮৮
১৯৪৪

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

সম্পাদন-বিভাগ

সাধারণ ভূমিকা লিখিবেন—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা লিখিবেন—শ্রীযত্ননাথ সরকার

গ্রন্থ সম্পাদন করিবেন—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও

শ্রীসজনীকান্ত দাস

শতবার্ষিকী সংস্করণের বিশেষত্ব

ইহাতে থাকিবে—

- বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ
- বঙ্কিমের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত সকল গ্রন্থ
- সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধাবলী
- প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত চিঠিপত্রাদি
- সমসাময়িক গ্রন্থে বঙ্কিম-রচিত ভূমিকা

পাঠনির্ণয়—

বঙ্কিমের জীবিতকালে তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের যতগুলি সংস্করণ হইয়াছিল তাহার শেষেরটিকেই প্রামাণিক বলিয়া ধরা হইবে। পূর্ববর্তী সংস্করণে যেখানে যেখানে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষিত হইবে পরিশিষ্টে তাহার উল্লেখ থাকিবে এবং যেখানে পরবর্তী সংস্করণে আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে সেখানে পূর্ববর্তী সংস্করণ স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইবে।

খণ্ড ও আকার—

গ্রন্থাবলী আনুমানিক ১০ খণ্ডে বাহির হইবে, প্রত্যেক খণ্ডের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ক্রাউন ৪ পেজী অন্যান্য দুই শত পৃষ্ঠা। প্রত্যেক গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যা স্বতন্ত্র। বাহার যেমন ইচ্ছা তিনি তেমনই ভাবে পরে বাধাইয়া লইতে পারিবেন।

নিয়মাবলী

গ্রন্থাবলীর অগ্রিম মূল্য ২৫৭ টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই টাকা ১২৥০ টাকা হারে দুই কিস্তিতে দেয়। প্রথম কিস্তির ১২৥০ টাকা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠাইতে হইবে, পাঁচ খণ্ড গ্রন্থ পাইবার পর দ্বিতীয় কিস্তির ১২৥০ টাকা দিতে হইবে। ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

সাধারণের সুবিধার জন্য গ্রন্থাবলীর প্রত্যেক খণ্ড খুচরা কিনিতে পাওয়া যাইবে। কোনও খণ্ডের মূল্য তিন টাকার ন্যূন হইবে না।

* * *

বিশিষ্ট সংস্করণ

যাঁহারা এই গ্রন্থাবলী প্রকাশে অগ্রিম ৫০৭ টাকা দান করিয়া আত্মকল্যাণ করিবেন তাঁহাদিগকে মূল্যবান কাগজে মুদ্রিত এই গ্রন্থাবলীর একটি রাজসংস্করণ উপহার দেওয়া হইবে এবং গ্রন্থাবলীর শেষ খণ্ডে তাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইবে।

* * *

গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড আগামী জুন মাসের শেষে বাহির হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে এই গ্রন্থ পাওয়া যাইবে। নাম ও মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীমন্মথমোহন বসু

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা

বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী

জন্ম-শতবার্ষিকী সংস্করণে থাকিবে—

(ক) বঙ্কিমের জীবিতকালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত :

১। দুর্গেশনন্দিনী	১৩। গদ্য-পদ্য
২। কপালকুণ্ডলা	১৪। কৃষ্ণকান্তের উইল
৩। মৃণালিনী	১৫। সাম্য
৪। বিষবৃক্ষ	১৬। রাজসিংহ
৫। ইন্দিরা	১৭। আনন্দ মঠ
৬। লোকরহস্য	১৮। মুচিরামের গুড়ের জীবনচরিত
৭। যুগলাঙ্গুরীয়	১৯। দেবীচৌধুরাণী
৮। বিজ্ঞানরহস্য	২০। কৃষ্ণ চরিত্র
৯। চন্দ্রশেখর	২১। সীতারাম
১০। রাধারাণী	২২। বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম ও ২য় ভাগ
১১। কমলাকান্ত	২৩। ধর্মতত্ত্ব—অনুশীলন
১২। রজনী	২৪। সহজ রচনাশিক্ষা

(খ) বঙ্কিমের মৃত্যুর পর পুস্তকাকারে প্রকাশিত :

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২। Rajmohan's Wife

(গ) পুস্তকাকারে অপ্ৰকাশিত :

১। বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধ

২। বাল্য রচনা

৩। পত্রাদি

৪। অপরের রচিত গ্রন্থের ভূমিকা

সর্বশেষ খণ্ডে শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার-রচিত বঙ্কিমের সাহিত্য-প্রতিভা বিষয়ক আলোচনা; শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ-সঙ্কলিত বঙ্কিমের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ বিষয়ক আলোচনা; শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত বঙ্কিমের রাজকাব্যের ইতিহাস ও গ্রন্থপঞ্জী থাকিবে।

অথ কালীকীর্তনানুষ্ঠান ।

স্বস্তি কবিরঞ্জনাপরনাম রামপ্রসাদসেনকালীভক্তাবতারাবতারিত নবীন পদবী কালীকীর্তনভিধান ভক্তিরসপ্রধান মধুরগান পদাবলী পুস্তক প্রাচুর্য্য নিমিত্ত সর্বতোভাবে সর্বজনশ্রবণগেচ্চর হয় নাই যতপি গায়ক দ্বারা অথবা অল্প কোনপ্রকারে তাহার যৎকিঞ্চিদংশ কোন২ মহাশয়ের কর্ণপথগত হইয়াও থাকে তথাপি সমুদয় শ্রবণ ব্যতিরেকে তাদৃশাপূর্ক রসান্বাদন হইবার সম্ভাবনা হয় না ইহাতে তত্তমহাশয়েরদের যৎকিঞ্চিদংশ শ্রবণোত্তর কালে তত্তাবদংশ শ্রবণ স্পৃহাতে মনের ব্যগ্রতা সর্বদা থাকে ।

অপরঞ্চ কালীকীর্তনব্যবসায়ি গায়ক যে কয়েক জন দৃষ্ট হয় তাহারদের উচ্চারণানভিজ্ঞতা ও সামান্যতো অজ্ঞতা প্রযুক্ত গীতকর্তার অভিপ্রেত রস ভাবার্থব্যতিক্রমজ্ঞত রসভঙ্গ হওয়াতে শ্রবণ কালে মনে স্ত্রখোদয় না হইয়া বরং খেদোদয় হয় এবং এই পরকীয় দোষে গ্রন্থকর্তার দোষানুমান হওয়াতে তাঁহার এই মহাকীর্তিব্রূধাকরে কলঙ্কোদয় সম্ভাবনা হইলেও হইতে পারে ।

অতএব পূর্বোক্ত নানা দোষ পরীহারার্থ এবং ঐ অপূর্ক গীতগ্রন্থের অবৈকল্যরূপে ও প্রাচুর্য্যরূপে বহুকালস্থায়িত্বার্থ আমি আকরস্থান হইতে মূল-পুস্তক আনয়নপূর্বক সংশোধিত করিয়া কালীকীর্তনপুস্তক মুদ্রিত করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাতে সাধু সদাশয় মহাশয়েরা নয়নান্তপাত করিলে তাঁহারদের মনে কালীভক্তিকল্পলতাস্করবৃদ্ধি ও পরগুণগ্রাহিতা প্রকাশ হয় এবং গ্রন্থকর্তার মহা-কীর্তি চিরস্থায়িনী হয় এবং আমারও এতাবৎ পরিশ্রমের সফলসিদ্ধি হয় ।

সংশোধিতামপি ময়া বহুলপ্রয়াসৈর্গীতাবলীং পুনরিমাং প্রতিশোধয়ন্তু ।
সন্তঃ স্মশান্তনয়নান্তনিরীক্ষণেন কৃত্বা কুপামিহ ময়ীশ্বরচন্দ্রগুপ্তে ॥

কালীকীর্তন সংগ্রহকারের উক্তি ।

পয়ার । মন্ত হও বন্ধুগণ কালীপদ্মপায় । যে পদ ধরিয়া শিব শিরপদ পায় ॥ কালহরা কালদারা কালিকার পদে । ভবভয় নাহি রয় স্ত্রখ পদে ॥ শ্রামানাম মোক্ষধাম বেদাগমে কয় । স্মরণ করিলে নামে ধামে টেনে লয় ॥ এক চিত্ত করি তাঁরে ভজ এই ভবে । যদি মনে লয় তাহে লয় হবে তবে ॥ ঘোর দুর্গে ডাক সদা দুর্গে ২ রবে । দিনেশতনয়ক্লেশলেশ নাহি রবে ॥ শিবাশিব তেজি সবে শ্বে ভাব শিবে । শিবাশিবপ্রদা শিবা শিব দেন শিবে ॥ ভগ্ন দিয়া মিথ্যা আশা ময় হও ধ্যানে । তারাতত্ব কর তত্ত্ব গুরুদত্ত জ্ঞানে ॥ ভাবে ভাব ভাবি ভাব তাহা নহে দূর । ভাবি ভাবি ভাবি ছুঃখ করিবেন দূর ॥ ভাবির স্বভাব কভু অভাব না হয় । সে ভাব ভাবিলে

শ্রামা চিত্তে নিত্য রয় ॥ অতএব হও সবে ভাবি ভাবাধীন। তারা তারা মুদে
 ধ্যান কর দিন২ ॥ শক্তি শক্তিমতে যেই ভজে ভক্তিপানে। তারে তারে
 তারিণী করুণা দৃষ্টি দানে ॥ দেহ দেহশুদ্ধি হেতু মন যোগে যাগে। কালীকালি
 নাহি দিয়া হৃদে তাহে জাগে ॥ কর করযজ্ঞে বাঘ বিষয় না চাও। নিত্য
 নিত্য মৃত্যুকালী হৃদয়ে নাচাও ॥ মূল্যধার স্থান তাঁর মহাকালনারী। মূল্যধার
 জ্ঞান কর মহাকালনারী ॥ শ্রায় তাঁর ভাব নেয় নানা শ্রায় পেতে। শ্রায় যদি
 ত্যজ সবে তবে পার পেতে ॥ তর্ক করে বুঝা তর্ক চরণে২। তর্ক ত্যজ স্থান
 পাবে চরমে চরণে ॥ দরশন তত্ত্ব নাহি পায় মিছা ভাবে। দরশন পাবে যদি ভাব
 ভক্তিভাবে ॥ তত্ত্বমত্ত্বকাদে পড়ে না হইও ভোলা। তত্ত্ব কে বুঝিবে তাঁর ভোলা
 ভেবে ভোলা ॥ দেখ সেই মায়ায় মায়ায় বশ সব। হররাণী হরে হরে করে সদা
 শব ॥ ত্রিভুবন মায়েয় মায়েয় মূল্যধার। কালীরূপ কর চিত্র চিত্ত করি সার ॥
 সাধকের কোমল কমল হৃদিপরে। শ্রামা থাকে থাকে২ সদানন্দ ভরে ॥
 যথা শত২ শতদল ফুটে জলে। তেমতি মা সর্বঘটে সর্বঘটে চলে। পেলে
 দুর্গাপদ তার তারি এই ভর। কিন্তু ভবপারে পারে পাঠাইতে ভব ॥ ভব সিদ্ধপার
 হেতু সেতু কর হরে। ভব সিদ্ধ সম হুংখ নিমিষেতে হরে ॥ কারে দিব
 উপদেশ দেশ ভাল নয়। ঘেবে২ ধর্ম কর্ম সব পণ্ড হয় ॥ নাহি জেনে
 অহং কার করে অহঙ্কার। জানে না যে জীবন জীবনবিষাকার ॥ ভব পার হেতু
 সবে ভবে করে হেলা। না করে সে পদ ভালা ভালাও ॥ বালক বা লোক
 সব এই কলি কালে। দিন২ জ্ঞানহীন বদ্ধ পাপজালে ॥ লঘু সঙ্গ রঙ্গে
 সদা চালে মনোরথ। লোচন হীনের শ্রায় ভ্রমে ভ্রমে পথ ॥ সেই অন্ধ তার
 স্বন্ধে যেই অন্ধ চড়ে। উভয়ে ভ্রমিতে বন্ধ কূপ মধ্যে পড়ে ॥ নীচের নিকটে
 সদা উপদেশ লওয়া। নাবিকের অর্থ দিয়া ডুবে পার হওয়া ॥ সাধু সহ বাসে
 হয় বিজ্ঞান লোচন। পরম পদার্থ তাহে হয় দরশন ॥ জ্ঞানচক্ষু হত হেতু
 ইহা নাহি মানে। দর্পণেতে যত স্মৃথ অন্ধে কি তা জানে ॥ লোকের বারণমন
 না মানে বারণ। ললাটের ফেরে ফেরে না জানে কারণ ॥ অজ্ঞান মনুষ্য প্রীতি
 বুঝা দিই দোষ। কপালে সকল করে কেন করি রোষ ॥ করে করে তম নষ্ট
 যেই স্রবাকর। সে চাঁদে কলঙ্ক গাঁথা ব্যক্ত চরাচর ॥ শিবের প্রধান পুত্র
 সর্বসিদ্ধিদাতা। বিব্রহর গণেশের কুঞ্জরের মাথা ॥ কর্মভোগ নাহি খণ্ডে
 শাস্ত্র যুক্তি সার। দেবের দুর্গতি এই মনুষ্য কি ছার ॥ ভাল ভাল বিনে ভাল
 নাহি হয় তায়। অদৃষ্ট অদৃষ্ট লেখা খণ্ডান না যায় ॥ কিন্তু সিদ্ধ বাক্য এই
 পূজ হরদারা। কপালের কপাল তারিণী সর্বসারা ॥ কালি দিয়া কালীনাম
 ললাটেতে রেখে। বিধি দত্ত বিধি যাহা রাখ তাহা ঢেকে ॥ গুপ্তমর্ম এই
 সেই শ্রীনাথের উক্তি। ভাবিলে তাঁহাকে লোক ভায় পায় মুক্তি ॥ একান্ত
 বাসনা তাঁর যাহে লোক তরে। তাইতো ঈশ্বর গুপ্ত মর্ম ব্যক্ত করে ॥

ত্রিপদী ।

ভাব জীব তেজে মায়া মহেশমোহিনীমায়া মহারিজ্ঞা মহেশ্বরী তারা ।
 গত কালাগতকাল ছদে ধর সহকাল কাল সর্ব গর্ব স্বর্ষ কারা ॥ করহ নিগূঢ়
 ভক্তি তাহে পাবে মহাশক্তি যুক্তিযুক্ত ব্যক্ত এই ধরা । জানতো বচনসার
 করিলে উত্তমাত্মার সরোবরে মীন পড়ে ধরা ॥ কে জানে কালীর মর্ম্ম নখজ্যোতি
 পূর্ণব্রহ্ম ভাবে মত্ত সর্ব সর্বসহা । ভাবে যথা গুণ্যবানে তদ্রূপ মা কোলে
 টানে যেমন চুষকে টানে লোহা ॥ ত্রিগুণে ভুবনজয়ী বর্ণরূপা ব্রহ্মময়ী
 কুলকুণ্ডলিনী হংসবধু । ছুর্গানামামৃত পানে সবিশেষ গুণজ্ঞানে বদন কমলে
 ক্ষরে মধু ॥ কখনো পদ্মিনীবামা কখনো চিজিগীরামা ছলেতে পুরুষ ছলে নারী ।
 নানা বেশে বেশ ধরে মায়া কত মায়া করে সার মর্ম্ম বুঝিতে না পারি ॥
 ব্রহ্মরূপে পালে ক্ষিতি বাণীরূপে কণ্ঠে স্থিতি অন্নদা অধিকা কাশীমধ্যে । কমলে
 কমলা হন মাতা কত মতে রণ হরগৌরী হন মধ্যে ॥ দ্বৈত ভাব
 ত্যাজ্য কর জ্ঞানচক্ষু যত্নে ধর লহন সার উপদেশ । জীবে দিতে মোক্ষধাম
 সেই ব্রহ্ম গুণধাম ধারণ করেন নানাবেশ ॥ যে জন যে ভাবে ভাবে তারে
 তুষ্ট সেই ভাবে না দেন ভক্তের মনে কালি । সদাশিব আত্মারাম কভু সীতা
 কভু রাম বিধি বিষ্ণু যা রাধা সা কালী ॥ কৃষ্ণরূপে বাঁশী করে সদা রাধা
 নাম করে প্রেমানন্দে প্রফুল্ল গোকুল । কুঞ্জবনে নানা ছলে গোপিকার মন
 ছলে মনোরম্য স্থান সে গোকুল ॥ রাধারূপে ব্রজনারী সে ভাব বুঝিতে নারি
 কলঙ্কিনী বলে ঘরে পরে । লজ্জাভয় পরিহরি মুখে বলে হরি হরি হরিপ্রেমভূষা
 অঙ্গে পরে ॥ কালীরূপে কাল পরে কটিপরে কর পরে গলে দোলে শবমুণ্ড
 সব । এলোকেশী সর্বনাশী অটুহাসী সর্বনাশি অসী করে রণে করে শব ॥
 শিবরূপে যোগবলে সদা বোম ২ বলে হাড়মালা গলে করে শিঙ্গে । গায় ধূলা
 যোগে ভোলা হয়ে ভোলা ভাব ভোলা শিঙ্গে ফুঁকে পাবে সবে শিঙ্গে ।
 ধনুধারি রামরূপে যুদ্ধ করে নানারূপে পাষণ ভাষণ সিন্ধুজলে । ছলেতে
 হইয়া সীতা জনকে বলিয়া পিতা নিজে নিজাঙ্গনা নিজ বলে ॥
 হইয়া অদ্বৈতবাদী জগতের বস্তু আদি কালী রাঙ্গা পায় রাখ মন । এক ভিন্ন
 দুই নয় বিরূপ যে জন কয় ধরাতলে মূঢ় সেই জন ॥ উপাসনা ভেদমাত্র
 বারিপূর্ণ করি পাত্র রবিছায়া দেখ সেই জলে । হবে ব্রহ্ম নিরূপণ ত্রিভুবনে
 সর্বক্ষণ প্রশংসা প্রদীপ তবে জলে ॥ অতএব বন্ধুবর্গ তেজিয়া কর্ম্মের
 বর্গ ব্রহ্ম উপসর্গ করি রহ । না কর অভক্তি ঘেষ লয়ে সার উপদেশ ঈশ্বরের
 ভাব সদা লহ ॥

এই পুস্তকের এক খণ্ড রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে।

পরবর্তী কালে—১ পৌষ ১২৬০ সালের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ ঈশ্বরচন্দ্র কবিরঞ্জন ৮ রামপ্রসাদ সেনের ‘জীবন বৃত্তান্ত’ এবং তাহার প্রণীত ‘কালীকীর্তন’ ও কৃষ্ণকীর্তনাবিধান-ভক্তি রসপ্রধান-মধুর গান এবং অবস্থাভেদের শাস্তি, করুণা, হাঙ্গ, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীর প্রভৃতি কতিপয় রস ঘটিত পদাবলী” প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার অভিলাষে তিনি ১৭ অক্টোবর ১৮৫৫ তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন :—

কবিরঞ্জন ৮ রামপ্রসাদ সেন।

উক্ত মহাশয়ের “জীবন চরিত” এবং তাহার প্রণীত সঙ্গীতাদি নানা বিষয়ক কবিতা সকল আমরা অবিলম্বেই টাকা সহিত পুস্তকাকারে প্রকটন করিব, তাহার মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া পরে প্রকাশ করা যাইবেক।...এই বিষয় সংগ্রহ করণার্থ আমরা বিশেষ বৎসরাবধি গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছি,...

কিন্তু শেষ-পর্যন্ত এই পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই।

(২) কবির ৮ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত। ১৮৫৫। পৃ. ৬১।

এই পুস্তকের আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

ঈশ্বরো জয়তি। / কবির ৮ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের / জীবন বৃত্তান্ত / সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক / ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত / কর্তৃক সংগৃহীত ও বিরচিত হইয়া / কলিকাতা / প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। / ১ আষাঢ় ১২৬২ সাল। / এই গ্রন্থের মূল্য ১ এক তঙ্কামাত্র। /

এই পুস্তকের ভূমিকায় ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

“পূর্বে কয়েকজন কবির জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া গত-মাসের প্রথম দিবসের প্রভাকরে বিশ্ববিখ্যাত মহাকবি ৮ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনচরিত উদ্ভূত করিয়াছি, এবং অল্প সেই বিষয় স্বতন্ত্ররূপে উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। এতন্মধ্যে উক্ত মহাশয়ের প্রণীত অনেকগুলি অপ্ৰকাশিত উৎকৃষ্ট পদ প্রকটিত হইয়াছে,—সেই সকল কবিতা এপর্যন্ত কাহারো নেত্র কর্ণের গোচর হয় নাই, তাহার মধ্যে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি ও পারস্য ভাষার চমৎকার চমৎকার কবিতা আছে, যিনি অভিনিবেশ পূর্বক তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন, তিনিই আশ্চর্য্যে অভিভূত হইবেন, তিনিই ভারতচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য বিষয়ের প্রচুর প্রতিষ্ঠা করিতে থাকিবেন। অপিচ আমরা এই গ্রন্থে অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের কয়েকটি কঠিনতর ভাব-ভূষিত গূঢ়ার্থ-ঘটিত কবিতা টাকা সহিত প্রকটন করিয়াছি, তাহাতে সকলের মনে সন্তোষের সঞ্চার হইতে পারিবেক।”

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, “ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ।” এই উক্তি ঠিক নহে। ১৮৩৩ সনে ঈশ্বরচন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ‘কালীকীর্তন গ্রন্থের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের জানা ছিল না।

(৩) প্রবোধপ্রভাকর । ১৮৫৮ । পৃ. সংখ্যা ১২২ ।

ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

ঈশ্বরোজয়তি । / প্রবোধপ্রভাকর । / প্রথম খণ্ড । / জ্ঞানগুরু সর্বশাস্ত্রজ্ঞ / শ্রীযুত পদ্মলোচন
আয়ারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃপায় / সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক / শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক /
বিরচিত হইয়া / কলিকাতা । / প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল । / সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগল-
কুড়িয়ার দুর্গাচরণ সিত্তের ষ্ট্রীট ৪২ নম্বর ভবন । / ১ চৈত্র ১৯৬৪ । /

ইহাতে পিতা-পুত্রের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে “কেবল নীতি এবং হিতোপদেশাদি বহুবিধ শিবকর
বিষয় লিখিত হইয়াছে, গল্পের অপেক্ষা পদ্মের অংশই অধিক ।” বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ
গ্রন্থাগারে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে ।

ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর (১০ মাঘ ১২৬৫) পর তাঁহার অমুজ্য রামচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার যে-সকল
রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করিতেছি । এই সকল রচনা
প্রথমে ‘সংবাদ প্রভাকর’ প্রকাশিত হইয়াছিল ।

(৪) হিত-প্রভাকর । ১৮৬১ । পৃ. সংখ্যা ১২২ ।

ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ :—

HIT PROBHA-KUR. / By the Late / Baboo Issurchunder Goopto. /
হিত-প্রভাকর । / সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক / শ্রীরামচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক / প্রকাশিত হইয়া /
কলিকাতা । / প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল । / সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগলকুড়িয়ার দুর্গাচরণ /
সিত্তের ষ্ট্রীট ৪২ নং ভবনে । / ১১ চৈত্র ১২৬৭ । /

গল্প-পদ্মে বর্ণিত হিতোপদেশের গল্পই এই পুস্তকের বিষয়বস্তু । বঙ্গীয়-সাহিত্য-
পরিষদ গ্রন্থাগারে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে ।

(৫) মহাকবি ঐশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলীর সার

সংগ্রহ । রামচন্দ্র গুপ্তের দ্বারা সংগৃহীত । ১৮৬২ ।

রামচন্দ্র গুপ্তই সর্বপ্রথম ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাসংগ্রহ পুস্তিকাকারে খণ্ডশঃ প্রচার করিতে
সক্ষম করেন । ইহার প্রথম তিন সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৬২ সালে (১৮৬২ সনে) ।
প্রত্যেক সংখ্যায় ৩২ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখা থাকিত । এই তিনটি সংখ্যা আমি বহরমপুরে
রামদাস সেনের লাইব্রেরিতে দেখিয়াছি । প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্রটি এখানে উদ্ধৃত
করিতেছি :—

ঈশ্বরোজয়তি / মহাকবি / ঐশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের / বিরচিত কবিতাবলীর / সার সংগ্রহ /
প্রথম ভাগ / প্রথম সংখ্যা / সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুপ্তের দ্বারা / সংগৃহীত
হইয়া / কলিকাতা । / সংবাদ প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল / সন ১২৬২ সাল / মূল্য প্রত্যেক
ফরমার হিনাবে ১০ এক আনা মাত্র ।

ইহার ৪র্থ সংখ্যা ১২৭৬ সালে, ৫ম—৭ম সংখ্যা ১২৮০ সালে, এবং ৮ম সংখ্যা ১২৮১
সালে প্রকাশিত হয় ; আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই মনে হইতেছে ।

১৩ মার্চ ১৮৭৯ তারিখের ‘সংবাদ-প্রভাকরে’ সম্পাদক রামচন্দ্র গুপ্তের একটি বিজ্ঞাপনে ইহার ৮ম সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশের সংবাদ আছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে ইহার ৮খানি সংখ্যাই আছে, তবে সবগুলি প্রথম সংস্করণের নহে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রামচন্দ্র গুপ্তের সংস্করণ ছাড়া ঈশ্বরচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর অন্ততঃ আরও তিনটি সংস্করণ পরবর্তী কালে প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলিতে ঈশ্বরচন্দ্রের সকল রচনাই স্থান পাইয়াছে, এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। ‘সংবাদ-প্রভাকরে’র পৃষ্ঠায় ঈশ্বরচন্দ্রের এমন বহু রচনা আছে, যাহা গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। নিয়ে তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হইল।

(ক) কবিতাসংগ্রহ। সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

[১৫ই আশ্বিন] ১২৯২ সাল। পৃ. সংখ্যা ৩৪৮।

ইহার ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত “ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ” মুদ্রিত হইয়াছে।

পর বৎসর ১লা মাঘ, ১২৯৩ সালে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে এই কবিতা-সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ড (পৃ. সংখ্যা ৩৪৮) প্রকাশিত হয়।

(খ) কবির স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত।

- বহুমতী আফিস। আশ্বিন ১৩০৬। পৃ. সংখ্যা ১৭০।

বহুমতী আপিস হইতে পরে ১ম ও ২য় ভাগ গ্রন্থাবলী (পৃ. সংখ্যা ৩৮০) বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা-সহ একত্রে প্রকাশিত হয়।

(গ) গ্রন্থাবলী। প্রথম খণ্ড। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত।

১৩০৮ সাল। পৃ. সংখ্যা ৩৩৬।

ভূমিকায় সম্পাদক লিখিয়াছেন, “এই খণ্ডে, কবিতা-সংগ্রহে প্রকাশিত কবিতা ব্যতীত আরো অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইল।”

এই গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড (পৃ. সংখ্যা ৩৭৬) ১৩০৮ সালেই প্রকাশিত হয়।

(৬) বোধেন্দু বিকাশ । ১৮৬৩ ।

ইহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

Bodhaindu Vicasa / by the late Babu Issur / Chunder Goopto.
Published by / Ram Chunder Goopto. /

বোধেন্দু বিকাশ। / প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের অনুরূপ / অর্থাৎ স্বভাবানুযায়ী বর্ণন / মহাকবি ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত। / প্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুপ্ত / কর্তৃক প্রকাশিত। / কলিকাতা। / প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। / সিমুলিয়া নয়ানচাঁদ দত্তের প্রিট নং ৫৪ / ১২৭০ সাল। /

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারেও এক খণ্ড আছে, কিন্তু তাহা খণ্ডিত

সাময়িক পত্র পরিচালন

সংবাদিক হিসাবে সে-যুগে ঈশ্বরচন্দ্রের বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। তিনি যে-সকল পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

সংবাদ প্রভাকর

বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই লিখিয়াছেন, ‘সংবাদ প্রভাকর’ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি। ‘সংবাদ প্রভাকর’ই বাংলা ভাষার প্রকাশিত সর্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। কিন্তু প্রথমে ইহা সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের তারিখ ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১ (১৬ মাঘ ১২৩৭, শুক্রবার)। ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রের কণ্ঠদেশে এই দুইটি শ্লোক মুদ্রিত থাকিত; শ্লোক দুইটি সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের রচিত :—

॥ সত্যমেনস্তামরস প্রভাকরঃ সর্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥

॥ উদেতি ভাষং সকলপ্রভাকরঃ সদর্শনদানবপ্রভাকরঃ ॥

॥...॥ নক্তং চন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেধিন্দীবরেণু কচিদ্ভ্রামংক্রাম মতন্দ্রমৌদনুতং

পীত্বা স্মৃৎপাকাতরাঃ ॥...॥

॥...॥ অস্তোদ্ধৃদ্বিমল প্রভাকরঃ কর প্রোত্তিমপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত

চতুরশাস্ত্রবিরেকারসং ॥...॥

‘সংবাদ প্রভাকর’-প্রকাশে ঈশ্বরচন্দ্রের সাহায্যকারী ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার গোপী-মোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর। যোগেন্দ্রমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক এবং তাঁহার কবিতার গুণগ্রাহী। তাঁহারই ব্যয়ে ‘সংবাদ প্রভাকর’ প্রথমে চোরবাগানের একটি মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। কয়েক মাস পরে— ১২৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে ঠাকুরবাড়ীতে ‘সংবাদ প্রভাকর’ মুদ্রণের জন্ত একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইল। কিন্তু ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুতে “প্রভাকর কুরের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্ত এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।” দেড় বৎসর পরে— ২৫ মে ১৮৩২ (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৯) তারিখে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রের প্রচার রহিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ইহারও মাস-তিনেক পূর্বে ‘সংবাদ প্রভাকর’র সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ লেখেন :—

... প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাস [১২৩৮] পর্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্ম পক্ষ ছিলেন

তৎপরে গুপ্ত মহাশয় ঐ পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খরচ করার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধর্ম সভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে ধর্মদ্বৈষী হন নাই কেননা ধর্মপ্রিয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ প্রভাকর প্রায় এক-বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়া ৬৯ সংখ্যক কিরণ প্রকাশ করিয়া গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অন্ত্যালচূড়াবলম্বন করিয়াছেন আর তাঁহার দর্শন হওয়া ভার।

চারি বৎসর পরে, ১০ আগষ্ট ১৮৩৬ (২৭ শ্রাবণ ১২৪৩) তারিখে ‘সংবাদ প্রভাকর’ পুনঃপ্রকাশিত হয়, তবে এবার সাপ্তাহিকরূপে নহে,—বারত্রয়িক (সপ্তাহে তিন বার) রূপে। ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

১২৪৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ বৃধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্বার বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ করি তখন এই গুরুতর কার্য সম্পাদন করিতে পারি আমাদিগের এমন সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসংসাহসিক কর্ণে প্রবৃত্ত হইলুম পাতুরেঘাটানিবাসী সাধারণ-মঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও তদমুজ বাবু গোপালচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে বায়োপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান করিলেন এবং অত্যাধি আমাদিগের আবশ্যকক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ক্রটি করেন না।—‘সংবাদ প্রভাকর’, ১ বৈশাখ ১২৫৩।

এই ভাবে তিন বৎসর সগৌরবে চলিবার পর ১৪ জুন ১৮৩৯ (১ আষাঢ় ১২৪৬) তারিখ হইতে ‘সংবাদ প্রভাকর’ দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়।

‘সংবাদ প্রভাকর’ বহু বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ইহা যে সে-যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের বাংলা সংবাদপত্র ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির প্রাথমিক রচনাগুলি ‘সংবাদ প্রভাকরে’ই প্রকাশিত হয়। আরও একটি কারণে ‘সংবাদ প্রভাকর’র নিকট আমরা বিশেষভাবে খণী। দীর্ঘকাল পরিশ্রম ও নানা স্থান পর্যটন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীন কবিদিগের বহু অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কার্যে তিনি অগ্রসর না হইলে বোধ হয় এত দিন কবিদিগের এই সকল রচনার কোন অস্তিত্বই থাকিত না। ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রের মাস-পয়লার কাগজে তিনি এগুলি সমস্তে মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কয়েকটির তালিকা দিতেছি :—

- | | |
|--|---------------------------------------|
| কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন | —১ আখিন, ১ পৌষ, ১ মাঘ ১২৬০। |
| ৮ রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) | —১ শ্রাবণ ১২৬১। |
| ৮ রাম [মোহন] বহু | —১ আখিন, ১ কার্তিক, ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১। |
| ৮ নিতানন্দদাস বৈরাগী | —১ অগ্রহায়ণ ১২৬১। |
| ৮ হর ঠাকুর | —১ পৌষ ১২৬১। |
| ৮ রায়, নৃসিং ও ৮ লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস | —১ মাঘ ১২৬১। |

প্রাচীন কবি-প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র ১৩ জাম্বুয়ারি ১৮৫৫ (১ মাঘ ১২৬১) তারিখের

‘সংবাদ প্রভাকর’ বাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

প্রাচীন কবি :—আমরা বহুকালাবধি নিয়ত নিকর চেষ্টা ও প্রচুর প্রয়াসে প্রকর পরিশ্রম পূরঃসর এ পর্যন্ত বাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশ পত্র করিয়াছি, ক্রমে করিতেছি এবং ক্রমে ক্রমে আরো প্রকাশ করিব, কিছুই গোপন রাখিব না। যে উপায়ে হটক যত পাইব ততই মুদ্রিত করিব।

আমরা পূর্বে ৮ রামপ্রসাদ সেন, ৮ রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধু বাবু, ৮ রাম বহু, ৮ নিতাই-দাস বৈরাগী ও তাহার সাহায্যকান্তিগণ, ৮ হর ঠাকুর, ৮ অজু গোঁসাই, গোঁজলা গুই, কৃষ্ণ কী ও লালনন্দলাল প্রভৃতি কতিপয় সূত কবিকে, কীর্তির সহিত সজীব করিয়াছি। অতঃপাৱ

৩-রাহু বৃসিংহ ও ৬ লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসকে* জীবিত করিলাম, অত্যাধি ইহারা এই বিশ্ব বিপিনে
অমর হইয়া বিচরণ করিবেন।...

ঈশ্বরচন্দ্রের একান্ত বাসনা ছিল, এই সকল কবিগুরুলাদের রচনা তাঁহাদের জীবন-
চরিত-সমেত পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি তাহা করিয়া যাইতে পারেন নাই।
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্যের ভার গ্রহণ করিলে বঙ্গসাহিত্যের মহোপকার করিবেন
সন্দেহ নাই।

সংবাদ রত্নাবলী

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, “প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণে খ্যাতি লাভ
করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমিদার বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক,
১২৩৯ সালের ১০ই শ্রাবণে ‘সংবাদ রত্নাবলী’ প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক
হয়েন।”

‘সংবাদ রত্নাবলী’ একখানি সাপ্তাহিক পত্র। ইহার সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই লিখিয়া
গিয়াছেন :—

বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার
গলিতে ‘সংবাদ রত্নাবলী’ আবিষ্কৃত হইল। মহেশ চন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক
ছিলেন। তাঁহার কিছু মাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন
করিতাম। রত্নাবলী সাধারণ সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্ত্তে বিরত
হইলে, রত্নপুর ভূমাদিকারী সভার পূর্ব্বতন সম্পাদক ৬ রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত
হয়েন।—‘সংবাদ প্রভাকর,’ ১ বৈশাখ ১২৫৯।

২৪ জুলাই ১৮৩২ তারিখে প্রকাশিত হইয়া ‘সংবাদ রত্নাবলী’ “এক বৎসর আট মাস
তিন দিবস” পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।† ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ্ঞা রামচন্দ্র গুপ্তও লিখিয়াছেন,—

গুণাকর প্রভাকরকর বহুকাল রত্নাবলীর সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না, তাহা
পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে ত্রীক্ষেত্রাদি তীর্থদর্শনে গমন করিয়া কটকে পরম পুজনীয়
ত্রীযুক্ত শ্রীমামোহন রায় পিতৃব্য মহাশয়ের সদনে কিছু দিবস অবস্থান করিয়া এক জন অতি
সুপণ্ডিত দণ্ডির নিকট তত্ত্বাদি অধ্যয়ন করেন, এবং তাহার কিয়দংশ বঙ্গভাষায় সুমিষ্ট কবিতায়
অনুবাদও করিয়াছিলেন।—‘সংবাদ প্রভাকর,’ ১ বৈশাখ ১২৬৬।

পাষণ্ডপীড়ন

২০ জুন ১৮৪৬ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে ‘পাষণ্ডপীড়ন’ নামে
একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন,—

১২৫০ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষণ্ডপীড়নের জন্ম হইল।

ইহাতে পূর্ব্বে কেবল সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট অবকপুঞ্জ প্রকটিত হইত, পরে ৫৪ সালে কোন

* ‘সংবাদ প্রভাকর’ হইতে ৬ লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস’ রচনাটি হরিশ্চন্দ্র মিত্র-সম্পাদিত ‘মিত্র-প্রকাশে’
(১৫ আগষ্ট. ১৮৭০) পরবর্ত্তী কালে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

† ‘দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস,’ ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬০ দ্রষ্টব্য।

বিশেষ হেতুতে পাষণ্ডপীড়ন, পাষণ্ডপীড়ন করিয়া, আপনিই পাষণ্ড হস্তে পীড়িত হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক জনৈক কৃত্রিম ব্যক্তি যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই ঔপাধিক ঘোষ বিপ্লবের সহিত যোগ দান করতঃ ঐ সালের ভাদ্র মাসে পাষণ্ডপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করিল, হুতরাং আমাদিগের বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাঙ্গরের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।—‘সংবাদ প্রভাকর’, ১ বৈশাখ ১২৫৯।

‘সংবাদ ভাস্কর’-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ “পূর্বে বন্ধুরূপে প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন” কিন্তু “১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবল হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ‘পাষণ্ডপীড়ন’ এবং তর্কবাগীশ ‘রসরাজ’ পত্র অবলম্বনে কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ করেন।”

সংবাদ সাধুরঞ্জন

‘পাষণ্ডপীড়ন’ উঠিয়া যাইবার পর ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৪৭) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ‘সংবাদ সাধুরঞ্জন’ নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা প্রতি-সোমবার প্রভাকর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইত। ‘সংবাদ সাধুরঞ্জন’ পত্রের কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

প্রচণ্ড পাষণ্ড তরু প্রভঞ্জনঃ। সমস্ত সল্লোক মনোহরঞ্জনঃ॥

সদাসদালোচন লোচনাঞ্জনঃ। প্রকাশতে সংপ্রতি সাধুরঞ্জনঃ॥

॥ * ॥ প্রচণ্ড পাষণ্ডরূপ তরুপ্রভঞ্জন। সমস্ত সজ্জনগণ মানসরঞ্জন॥

॥ * ॥ সদা সং আলোচন লোচন অঞ্জন। সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরঞ্জন॥

‘সংবাদ সাধুরঞ্জে’ ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রমণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ স্থান পাইত। কিছু দিন পরে ‘সংবাদ সাধুরঞ্জন’ পত্রের অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল হইলে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার জ্ঞাতীভ্রাতা নবরুক্ষ রায়ের নাম সম্পাদক-রূপে প্রকাশ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—“‘সাধুরঞ্জন’ ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর [পর] কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল।” এই উক্তি ঠিক নহে। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ। ‘সংবাদ সাধুরঞ্জন’ পর বৎসরের (১২৬৬) বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল। কি অবস্থায় ইহার প্রচার বন্ধ হয়, তাহা ৫ আষাঢ় ১২৬৬ (১৮ জুন ১৮৫৯) তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত সম্পাদকীয় উক্তি পাঠ করিলে জানা যাইবে :—

“কি কারণে সংবাদ সাধুরঞ্জন পত্র মাসত্রেয়* হইল অপ্রকাশ রহিয়াছে, আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে তদ্বিবরণ বিদিত করা আবশ্যক বোধ করিলাম,

* ২০ জুন ১৮৫৯ তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ লিখিত হয় :—“আমাদিগের সহকারী সম্পাদকের অনবধানতাবশতঃ গত শনিবারীয় প্রভাকরে লিখিত হইয়াছে, যে, প্রায় মাসত্রেয় হইল, সাধুরঞ্জন অপ্রকাশ রহিয়াছে, কিন্তু তাহা নহে, বৈশাখ [১২৬৬] মাসেও সাধুরঞ্জন প্রকাশ হইয়াছে,....”

গুণাকর প্রভাকর পত্র গ্রাহক মহোদয়দিগের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন, যে এতৎ পত্রের পূর্বতন সম্পাদক ৬ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় নীতি, ইতিহাস ও বিবিধ সংপ্রবন্ধ এবং রহস্য ও অজ্ঞাত বিষয়ে কবিতাদি প্রকাশকরণার্থ উক্ত পত্রের স্বজন করিয়াছিলেন, তাঁহার লিপিনৈপুণ্যগুণে সাধুরঞ্জন অল্পকালের মধ্যেই আপনার নামানুসঙ্গ কার্য-সাধন করাতে সাধারণ-সমাজে সম্যক বিধায়েই আদর প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানবিশারদ পণ্ডিত অবধি বিদ্যালয়ের ছাত্র পর্য্যন্ত অনেকেই সমাদরে সাধুরঞ্জন পত্র গ্রহণ করেন, কুলবালারাও অন্তঃপুরে তাহা পাঠ করিয়া পরস্পর আশোদিতা হইতেন, এবং কেহ কেহ তাহাতে প্রকাশার্থ কবিতা লিখিয়াও পাঠাইতেন, সাধুরঞ্জন পত্র এই তারতবর্ষের বহুদেশে এইরূপে সমাদৃত হইলে কলিকাতার সরিফ সাহেব তাহাতে আপন কার্যালয়ের বিজ্ঞাপন সকল প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন, ঐ সময়ে ৬ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বিবেচনা করিলেন, সাধুরঞ্জন পত্রে যখন প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন সকল আসিতে আরম্ভ হইল তখন তাহা আর আপনার নামে রাখা কর্তব্য নহে, অতএব জ্ঞাতিব্রাতা শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায়কে তাহার সম্পাদক নামে পরিচিত করিলেন, নবকৃষ্ণ রায় ঐ সময়ে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে থাকিয়া মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন, সাধুরঞ্জনের লিপিকার্য্য কি অজ্ঞাত বিষয়ের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না, প্রভাকর সম্পাদক ও তাঁহার সহকারিরাই তাহার সকল কার্য্য পরিচালন করিতেন, শ্রীমান নবকৃষ্ণ রায় কেবল নামমাত্র সম্পাদক ছিলেন।

পরন্তু ৬ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় পরলোক গমন করিলে উক্ত নবকৃষ্ণ রায় সাধুরঞ্জন পত্র স্বয়ং গ্রহণ করিয়া প্রকাশকরণের প্রার্থনা করাতে আমরা বলিলাম যে, সাধুরঞ্জন পত্র স্বচ্ছন্দে নির্বাহ কর, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, তাহা হইতে যে কিছু উৎপন্ন হইবেক, তাহাও তোমাকে দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু সাধুরঞ্জনের স্বত্ব তোমাকে দিতে পারি না, যেহেতু তাহা তোমার সম্পত্তি নহে, তোমার নামে কেবল বেনামী করা হইয়াছিল, একথা ৬ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আপনার শেষ উইলপত্রে স্পষ্টরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিস্তর ভদ্রলোকেও ইহার সাক্ষি আছেন, আমারদিগের এই উত্তর শ্রবণ করিয়া নবকৃষ্ণ রায় কোন কথার উল্লেখ মাত্র না করিয়া এক [দিবস] আমারদিগের অজ্ঞাতসারে সরিফ সাহেবের কার্যালয়ে [গমন করিয়া] সাধুরঞ্জন পত্রের সরিফ সেলের বিজ্ঞাপনের যে ছয় মাসের ফিলের টাকা ছিল, তাহা আনয়ন করেন, আমরা তাঁহাকে এই অজ্ঞাত ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কোন উত্তর না করিয়া রজনীযোগে যন্ত্রালয় হইতে সাধুরঞ্জন পত্রের হেড অর্থাৎ শিরোভূষণ এবং রুল ইত্যাদি লইয়া এক মাসের অধিক হইল, প্রস্থান করিয়াছেন, আর আমারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, এইক্ষণে লোকের নিকটে বলিয়া বেড়াইতেছেন, যে সাধুরঞ্জন যখন তাঁহার নামে ছিল, তখন তাঁহারই কাগজ

অল্প যত্ন হইতে প্রকাশ করিবেন, কিন্তু সংবাদ পত্র প্রকাশ করা সকলের সাধ্য নহে।

সংবাদ সাধুরঞ্জন পত্র ঈয়েক মাস অপ্ৰকাশ থাকিবার মূল কারণ, অতি সংক্ষেপে উপরিভাগে লিখিলাম, অধুনা ঐ পত্র পুনঃপ্রকাশে আমরা বিশেষবন্ধপেই যত্নবান আছি, তাহাতে যত্নপি একান্তই ক্লতকার্য্য হইতে না পারি তবে সাধুরঞ্জনের পরিবর্তে অপর পত্র প্রকাশ করিয়া অল্পগ্রাহক পত্রগ্রাহক মহাশয়দিগের নিকটে প্রেরণ করিব।

শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায়কে বিশ্বাসপাত্র ও অতি আত্মীয় বিবেচনা করিয়াই বিপুল-স্বভাবে ৬ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার নামে সাধুরঞ্জন প্রকাশ করিয়াছিলেন, অধুনা তিনি আমারদিগের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিলেন, ইহাতে তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক ও আত্মীয়... ধর্ম্মসংহারক ব্যতীত আর [কি বলিতে] পারি ? ৬ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় গ্রাসাচ্ছাদন ও পুস্তকাদি ক্রয় করণের টাকা দিয়া তাঁহার বিদ্যালয়লীনবিষয়ে বিশিষ্টরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, সময়ে সময়ে তাঁহার পরিবার প্রতিপালনবিষয়ে সাহায্য করিতেও ক্রটি করেন নাই, এবং তাঁহার পরলোকগমন হইলেও আমরা নবকৃষ্ণ রায়কে সর্ববিষয়েই সাহায্য করিয়াছি, তাঁহাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভ্রাতৃ দেখিতাম, তাঁহার প্রতি এক দিবসের নিমিত্তও স্নেহশূন্য হই নাই, প্রভাকর যন্ত্রালয়ের অনেক কার্য্যের ভারাপণ করিয়াছিলাম, কিন্তু কি পরিতাপ ! তাঁহার এমত দুর্ব্বন্ধি ঘটিল যে, অতি সামান্য অর্থের নিমিত্ত আমারদিগের সেই স্নদূত স্নেহরঞ্জকে একেবারে ছেদ করিয়া গেলেন। বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হইলে লোকের এইরূপ অবস্থানান্তর ঘটয়াই থাকে, কতিপয় কুচক্রির কুপরামর্শ শ্রবণ করত সাধুরঞ্জনের হেড চুরি ও টাকা হরণ করিয়া অভিমানভরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সাধুরঞ্জন পত্র স্বয়ং প্রকাশ করিয়া সম্পাদক হইবেন, অধুনা তাঁহার কুচক্রকারি কুমন্ত্রিগণ কোথায় ! কৈ সাধুরঞ্জন পত্র প্রকাশ হইল না ?

ইহার পর ‘সংবাদ সাধুরঞ্জন’ পত্র আর প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার পরিবর্তে প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কাগজখানির নাম ‘সংবাদ দ্বিজরাজ।’ ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয় ১৮৫৯ সনের ১৯এ সেপ্টেম্বর। এই সংখ্যায় সম্পাদকীয় উক্তিতে প্রকাশ :—

...সংবাদ প্রভাকর পত্রের অন্তর্গত যে প্রকার সাধুরঞ্জন পত্র ছিল এই দ্বিজরাজ পত্রও সেই প্রকার হইবেক। •

ঈশ্বরচন্দ্র দীর্ঘজীবী ছিলেন না, সম্যক শিক্ষালাভের সুযোগও তাঁহার জীবনে ঘটে নাই ; এই অল্পবিধা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার স্বল্পপরিমার জীবনে বাংলা দেশের প্রাচীন ও আধুনিক কবি-সম্প্রদায়কে দেশের লোকের পরিচিত করাইবার জন্ত প্রাণপাত করিয়াছেন। কবি-প্রতিভার বিচারে যদিও বা ঈশ্বর গুপ্ত কোনও দিন বিমুত হন, তাঁহার কবিত্বপ্রীতি ও দেশপ্রীতি চিরদিন আমাদের আদর্শস্থল হইয়া থাকিবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যাপ্টেন জেম্‌স্‌ ষ্টুয়ার্ট

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে শেষ দশকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মূলতঃ এদেশের অজ্ঞ জনসাধারণকে কুসংস্কারমুক্ত করিয়া খ্রীষ্টধর্মের আলোকে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীগণ ব্যতীত কয়েক জন ইংরেজ ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাঠ্যপুস্তকাদি রচনা করিয়া এদেশের বালক-বালিকাগণকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে কৃষ্ণ শিক্ষিত করিয়া তোলা সেই উদ্দেশ্যের গুণ পরিণতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই সকল সহৃদয় ব্যক্তির জীবন ও কীর্তির বিশদ ইতিহাস বড়-একটা পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গতঃ কেহ কেহ ইহাদের নামোল্লেখমাত্র করিয়া গিয়াছেন। মালদহের গোয়ামাল্টিতে জন্ম এলার্টন, চুঁচুড়ায় রেভারেণ্ড রবার্ট মে, বর্ধমানে ক্যাপ্টেন জেম্‌স্‌ ষ্টুয়ার্ট, কালনা ও চন্দননগরে জন্ম ডি পীয়ার্সন ও জে হার্লি এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। আজিকার দিনে ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। আমরা ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি। সেইগুলি সাজাইয়াই বর্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইল।

বর্ধমানে স্কুল প্রতিষ্ঠা

ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট বর্ধমানস্থিত প্রভিন্সিয়াল ব্যাটেলিয়ানের অ্যাড্‌জুট্যান্ট ছিলেন। তাহারই যত্ন চেষ্টায় বর্ধমান মিশন গঠিত হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখানে এক খণ্ড জমি ক্রয় করিয়া এক জন মিশনরীর থাকিবার উপযুক্ত বাসগৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। চার্চ মিশনরী সোসাইটির সংশ্রবে বর্ধমানে শিক্ষাবিস্তারের কাজ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের তত্ত্বাবধানে আরম্ভ হয়; তিনি এখানে দুইটি বাংলা স্কুল স্থাপনা করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা হয় দশ, ছাত্র-সংখ্যা এক হাজার। স্কুলসমূহের মাসিক ব্যয় ছিল ২৪০ টাকা। কার্য্যারম্ভের সময় ষ্টুয়ার্টকে বহুবিধ বাধার সন্মুখীন হইতে হইয়াছিল; বিরুদ্ধবাদীরা রটাইয়া দিয়াছিল যে এদেশের শিশুদিগকে জাহাজে পুরিয়া বিলাতে চালান দেওয়ার মতলবেই সাহেব স্কুল ফাঁদিয়া বসিয়াছেন! কোন পুস্তকে বীশুখ্রীষ্টের নামোল্লেখই তখন যথেষ্ট বাধার উদ্ভব হইত। বর্ধমানে তখন পাঁচটি শাস্ত্রানুমোদিত বিদ্যালয় ছিল—মিশনরী স্কুলের প্রভাবে পাছে তাহাদের বিদ্যালয়গুলি ভাঙিয়া যায় এই ভয়ে শিক্ষকেরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের স্কুলে কেহ ছেলে পাঠাইলে ইহারা তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করিত। ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট যেখানে যেখানে স্কুল স্থাপনা করিতেন সেখান হইতেই বাছিয়া বাছিয়া উপযুক্ত কর্ম্মঠ

শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন*—তাহাতে বিরুদ্ধবাদীদের কথায় লোকের ক্রমশঃ অবিশ্বাস জন্মাইতে থাকে এবং শীঘ্রই ঐ পাঁচটি বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। ছাপা-বই প্রথম প্রবর্তন করার সময়ও বাধার সৃষ্টি হয়—দেশীয়দের আশঙ্কা হইয়াছিল তাহাদের ছেলেরদের ফাঁদে ফেলিয়া জ্ঞাতি নষ্ট করিবার ইহাও এক প্রকার ষড়যন্ত্র! কারণ ইতিপূর্বে হাতে-লেখা পুথির সাহায্যে পাঠাভ্যাসই রেওয়াজ ছিল। এমন কি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পর্যন্ত বহুক্ষেপে ছাপার বই পড়িতে পারিতেন—বিষয়বস্তু গম্ভীর ধারণা করা ত দূরের কথা। ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট চুঁচুড়ার পরলোকগত মে সাহেবের পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন—তিনি নিজেও এই পদ্ধতির কিছু সংস্কার করিয়াছিলেন। এই সকল বিদ্যালয়ে গ্রহগণিত ও ইংলণ্ডের ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত ষ্টুয়ার্ট সাহেব গবর্নমেন্ট যে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্ত নিরন্তর চেষ্টিত তাহা তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্ত কোম্পানী বাহাদুরের কতকগুলি আইনকানুন ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এই আইনগুলি পড়িয়া শাসকদের সম্বন্ধে ছাত্রদের সুধারণা বদ্ধমূল হইবে এবং প্রীতি ও প্রেম শেষ পর্যন্ত আনুগত্যে পরিণত হইবে।

সুবিধা পাইলেই ষ্টুয়ার্ট সাহেব দেশীয়দের নিকট খ্রীষ্টধর্মের মহিমা কীর্তন করিতেন। তিনি বাংলা বেশ ভাল জানিতেন। খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারে তিনি কোনদিন ভয় পাইতেন না; হিন্দুধর্মের গুহ্য গায়ত্রী একটি পুস্তিকায় ছাপিয়া তিনি গ্রন্থকার হিসাবে নিজের নামও প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন—সেকালের পক্ষে তাহা দুঃসাহসই বলিতে হইবে। তাঁহার ভয় ছিল তিনি নাম না দিলে সম্পূর্ণ দোষ মিশনরীদের ঘাড়ে পড়িবে।

ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের বর্দ্ধমানস্থিত স্কুলগুলির যথেষ্ট সুনাম ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি যখন কলিকাতার অনেকগুলি বাংলা স্কুলের পরিচালন-ভার গ্রহণ

* ‘মনোরঞ্জনতিহাস’-প্রণেতা তারাচাঁদ দত্ত বর্দ্ধমানে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের স্কুলের এক জন শিক্ষক ছিলেন। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণের (১৮১৮-১৯) চতুর্থ পৃষ্ঠায় তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য এইরূপ :—

“বর্দ্ধমানের ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের কর্মচারী তারাচাঁদ দত্ত সোসাইটির নিকট একটি গল্পপুস্তক পাঠাইয়াছেন—গল্পগুলি অংশতঃ ইউরোপীয় কাহিনী হইতে গৃহীত—ভাষা ভাল এবং সমস্তটা স্বচ্ছতির পরিচায়ক। এই পুস্তকের নাম ‘মনোরঞ্জনতিহাস’ বা ‘প্লিজিং টেল্‌স্’—কলিকাতার মিশন প্রেসে এখন ইহার দুই হাজার খণ্ড বাংলা ভাষায় এবং এক হাজার ইংরেজী-বাংলায় (নামনা-নামনি) মুদ্রিত হইতেছে। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির করেনপণ্ডিৎ সেক্রেটারী মিঃ ডব্লিউ এইচ পীয়ার্স ইহার ইংরেজী অংশ লিখিয়া দিয়াছেন।”

‘মনোরঞ্জনতিহাস’ পুস্তকের বাংলা, এবং ইংরেজী-বাংলা—দুইটি সংস্করণ ১৮১৯ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এগুলি দেখিয়াছি। বাংলা-সংস্করণ ‘মনোরঞ্জনতিহাস’ পুস্তকের আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

মনোরঞ্জনতিহাস ; / অর্থাৎ / বালকেরদিগের জ্ঞানদায়ক ও নীতিশিক্ষক উপাখ্যান।

শ্রী তারাচাঁদ দত্ত কতৃক / স্কুলবুক সোসাইটি দ্বারা / মিশন্‌ ছাপাখানাতে মুদ্রিত কুরা
গেল। /...1819.

করেন, তখন তাঁহারা নিকোলাস উইলার্ড নামে এক জন যুবাপুরুষকে এই সকল প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়া পাঁচ মাসের জন্ত ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের স্কুলের পদ্ধতি শিক্ষা করিতে বর্দ্ধমানে পাঠাইয়াছিলেন। এই পদ্ধতিতে পুরাতন পদ্ধতির অর্ধেক ব্যয়ে অল্পসংখ্যক শিক্ষকের সাহায্যে অধিকসংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব ছিল। উইলার্ড ১৮১৯ সনের মে মাসের গোড়ায় বর্দ্ধমানে যাত্রা করেন; তাঁহার সহিত পাঁচ জন বাঙালী শিক্ষকও শিক্ষালাভ করিতেছিলেন।

গ্রন্থাবলী

ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের রচিত কয়েকখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির বিস্তৃত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। বর্ণমালা (?)#—১৮১৮।

ইহার সম্বন্ধে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির প্রথম বার্ষিক বিবরণের (১৮১৭-১৮) ২য় পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—

1. A set of elementary Bengalee Tables, with short reading lessons intermixed, by Lieut. J. Stewart, Adjutant of the Provincial Battalion of Burdwan. Seven tables in all have been printed at the Serampore Press at the Society's charge ;...

২। উপদেশ কথা। ১৮১৭ (?)

এই পুস্তকখানি প্রথমে ১৮১৭ (?) সনে ‘ইতিহাস কথা’ নামে বাংলায় প্রকাশিত হয়; পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে ‘উপদেশ কথা’ নামে প্রচারিত হইয়াছিল। এই সংস্করণ দুইটি ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের বর্দ্ধমানস্থিত স্কুলের ছাত্রবৃন্দের জন্ত মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৮২০ সনের মে মাসে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি ‘উপদেশ কথা’র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।† এই সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে।

* ১৮২৫ সনে “সোং ইটালি জীযুত পিয়স সাহেবের ছাপাখানায়” “ষ্টুয়ার্ট সাহেবকৃত বর্ণমালা রিপ্রিন্ট” মুদ্রিত হয়।—‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’, ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ৮৩ ত্রুটব্য।

† 11. About two years ago there was printed, on account of another Institution, and under the title of *Oopodes Cotha*, a selection from Stretch's Beauties of History, with other matter, the whole translated into Bengalee under the superintendence of Captain Stewart. That Gentleman presenting it to the Society with a request to print a second edition, the same number of copies, both Bengalee and Anglo-Bengalee, have been voted as of the “*Pleasing Tales*.”—Second Report of the Calcutta School-Book Society. Second Year, 1818-19. (1819), p. 4.

ইহার মলাটের উপর “3rd Edit. May 1820. 2000.” মুদ্রিত আছে। পুস্তকখানির পৃ. সংখ্যা ৭২ ; আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

উপদেশ কথা, / (ইতিহাসে সুবচন.) / পরন্তু / ইংলণ্ডীয়োপাখ্যানের চূষক, / এবং
ঈন্ডিয়ায় বিষয়ে ইংলণ্ডীয় সল্ল বাবস্থা. / ষ্টেওয়ার্ট সাহেব কর্তৃক রচিত. /

Stewart's / Oopodes Cotha, / (Or, Moral Tales of History) : /
With an Historical Sketch of England, And Her Connection / With
India. / Bengalee—3rd Edition. / C. S. B. S. / Calcutta : / Printed for
the Calcutta School-Book Society. / At the School-Press, Dhurumtula. /
1820. /

পুস্তকে ভূমিকা-স্বরূপ নিম্নোক্ত অংশটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

সমাচার.

এই কেতাবের মধ্যে স্তম্ভত্ব দুই অংশ পাওয়া যায়, প্রথম ভাগ ষ্টেচ সাহেবের ইতিহাসছটা নামে গ্রন্থ এবং অষ্টোত্ত গ্রন্থহইতে কতক স্থলার্থ সংগ্রহ করিয়া এ দেশীয় মতে কিঞ্চিৎ সাজাইয়া তর্জমা করা গিয়াছে. দ্বিতীয় ভাগে তিন প্রকরণ, এক ইংলণ্ডীয়েরদিগের অজ্ঞানতা ও বিধর্মান্ধরণ বিনাশপূর্বক জ্ঞানশীল পশ্চিম দেশেরদিগের মধ্যে মাননীয় হইবার সংক্ষেপ বিবরণ. দ্বিতীয় এ দেশেতে সাহেব লোকেরদের প্রথম আগমনের কিঞ্চিৎ বিবরণ. তৃতীয় সরকারের রাজত্বের নিয়ম বন্ধনার্থে অষ্টোত্ত কারণের নিমিত্তে এই বঙ্গদেশের জন্তে কোনও প্রধান আইন.

দেখ ; পূর্বে এই গ্রন্থ কোনও সাহেব লোকের নিজ বায়ের দ্বারা দুইবার ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু প্রথমে ইহার নামকরণ ইতিহাস কথা ছিল ; অনন্তর যখন এই গ্রন্থকে শুদ্ধ করিয়া কিছু বাহুলা করা গেল, তৎকালে উপদেশ কথা খাত হইল.

‘উপদেশ কথা’ পুস্তকের “নির্ঘণ্ট” নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ; ইহা হইতে পুস্তকের বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যাইবে :—

সহপদেশ	পৃষ্ঠা ৩	ইতিহাস	পৃষ্ঠা ৩৩
দয়াপ্রকাশ	৩	এদেশেতে সাহেবেরদের আগমন	৪১
গুণের পুরস্কার	৪	ইংলণ্ডের রাজ্য শাসন	৪৬
পিতামাতার প্রতিভক্তি	৬	ইংলণ্ডের রাজকর	৪৭
বোবনকালে বিভ্রাভ্যাসের কথা	৮	ইংলণ্ডের সৈন্য	৪৭
সংকর্ণে কাল কাটান	৯	ইংলণ্ডের জাহাজ	৪৮
বন্ধুতার কথা	১০	ইংলণ্ডের খণ্ড এবং প্রধান নগর ইত্যাদি	৪৮
মিথ্যা কথন	১৪	ইংলণ্ডের বিজ্ঞালয়	৪৯
কৃতব্রতা	১৮	শাবৎ দিন	৫০
উত্তম	২০	বারজনের দ্বারা মোকদ্দমা	৫১
সদৃশগণের কথা	২৩	ইংরাজী সন ১৭৯০ শালের প্রথম আইন	৫১
ভ্রাতৃস্নেহ	২৭	ইংরাজী সন ১৭৯০ শালের দ্বিতীয় আইন	৫৪
মাৎসর্ঘ্য	২৮	ইংরাজী সন ১৭৯৩ শালের তৃতীয় আইন	৬১
রাগ	৩০	তৃতীয় ধারা	৬৪
		অভিধান	৬৮

পুস্তকখানির ৬৮-৭২ পৃষ্ঠার “অভিধান” অংশে কতকগুলি শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে অর্থসমেত কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা হইল :—

আরোপিত,	কল্পিত, কৃত্রিম, মিথ্যা.
কাল্পনিক,	ভণ্ডতপস্বী, শঠ.
চর্যা,	আচারণ, ব্যবহার.
জাতিভ্রষ্ট,	পিরালি, যাহার জাতি গিয়াছে.
নৈতা,	নীমা, ঠিকানা.
পক্ষপাত,	গণতা.
প্রতিনিধি,	তুলা.
বিপ্লুত,	বিচলিত.
বিরোধী,	বিবাদী, ঝকড়াউ.
সংঘটিত,	সম্মিলিত.
সঞ্চলন,	আশ্রুকূলা করণ.

‘উপদেশ কথা’র বাংলা-ইংরেজী সংস্করণও ১৮২০ সনের মে মাসে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহার একাধিক খণ্ড রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে। পুস্তকখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৮+৬৮ ; দক্ষিণ পৃষ্ঠায় বাংলা, বাম পৃষ্ঠায় ইংরেজী অংশ।

৩। তমোনাশক। ১৮২৮। পৃ. সংখ্যা ৩২।

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের কয়েক খণ্ড আছে। ইহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

Tomonasuck / or / The Destroyer of Darkness. / By / James Stewart. /

— / তমোনাশক / অর্থাৎ / দেবদেবী বিষয়ক বিবরণ। / বন্ধমানের জেমস ষ্টুয়ার্ট নাহেবের

কৃত। / কলিকাতায় ছাপা হইল / ১২০৪ শাল। /—/ Printed at Calcutta. / 1828. /

পুস্তকের বিষয়বস্তু :—

ব্রাহ্মণেরদের গায়ত্রী।	পৃ. ৯	অষ্টম অবতারণ।	পৃ. ১৬-১৭
ব্রহ্মার বিবরণ।	৯-১০	নবম অবতারণ।	১৭
বিষ্ণুর সংক্ষেপ বিবরণ।	১০-১১	কক্ষী অবতারণ।	১৮
দ্বিতীয় অবতারণ।	১১	শিব।	১৮-১৯
তৃতীয় অবতারণ।	১১-১২	গণেশ।	২০
চতুর্থ অবতারণ।	১২-১৩	ইন্দ্র।	২১-২২
পঞ্চম অবতারণ।	১৩	কালীর বিবরণ	২২
ষষ্ঠ অবতারণ।	১৪	দুর্গা।	২৩-২৪
সপ্তম অবতারণ।	১৪-১৫	বিবেচিত কথা।	২০-৩২

‘তমোনাশক’ পুস্তকের “ভূমিকা” অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সকল জাতীয় লোকেরদের অন্তঃকরণ দেব পূজা করাতে অদ্বিতীয় চিরস্থায়ি ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইয়াছে, পূর্বকালে ইংলও দেশীয়দের ব্যবহার ও ধর্ম সেই প্রকার অর্থাৎ প্রতিমা পূজাদিতে রত

ছিল, তাহাদের দুই দেবতা খর ও ওডন প্রধান রূপে মান্ত ছিল যেমন হিন্দুদের কালী ও দুর্গা, এবং ব্রাহ্মণের তুলা ঈশ্ব নামে এক জাতি ছিল, ও তাহাদের পূর্ব পুরুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিমালকের স্মৃতি ছিল, আর জগতের বৃত্তান্ত কিছু জানিত না, এক্ষণে ঈশ্বরদত্ত সত্যজ্ঞান পাইয়া পৃথিবীস্থ অল্প লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, ইহা তোমরা দেখিতেছ, আরও তোমরা নিশ্চয় জান, যত্বপি একজন এদেশস্থ লোক জজ্‌ ক্রিয়া মেজেষ্ট্রেট হইত তবে সকল লোকের ঘৃণা লইয়া ও পক্ষপাত করিয়া অবিচার দ্বারা কত গোল মাল [পৃ. ২] ইত্যাদি করিত, তোমরা বোধ কর যে ঈশ্বর মহাত্মা, এবং পুতুল আরাধনা করিতে ঈশ্বর হইতে তোমাদের অন্তঃকরণ পূর্ণরূপে গিয়াছে, ইহাতে আমি বলি, স্বয়ংজীবী অপ্রপঞ্চ অতুল্যপরাক্রম ঈশ্বর যিনি তাঁহারি আরাধনা করা কর্তব্য, কোন দেশীয়লোক আপন বুদ্ধিতে বিচারদ্বারা ঈশ্বরকে কখন জ্ঞাত করিতে পারে নাই, এবং ঈশ্বরকে উপযুক্ত রূপে আরাধনা করিতে পারে না, পাশান ও কাষ্ঠ প্রভৃতি রহিত অদ্বিতীয় ঈশ্বর যিহ্বাকে আরাধনা করিতে হইবে, আর দেখ অদ্বিতীয় ঈশ্বর হইতে মনকে পরাভূত করিয়া তাহার পরিবর্তে অল্প এক খণ্ড ওজর করিয়া বলে যে কাষ্ঠ কিম্বা পাশান ঈশ্বর নহে, কিন্তু ঐ সকলেতে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয় এবং তাহারদিগকে এই বিষয়ে যদি প্রমাণ জিজ্ঞাসা করা যায় তবে উত্তর দেয়, যে মস্ত্রের শক্তিতে হয়, সে যাহা হইক, এমত কি মস্ত্রের শক্তি আছে যে ঈশ্বরকে সেই মস্ত্র দ্বারা আবির্ভাব করায় যায়? এই রূপ আবির্ভাব হইলে তাহার বড় সম্ভ্রষ্ট হয় কেননা আপন বশীভূত এমত দেবতা পাইয়াছি যে তাহা হইতে পাপ মোচন পাইব এবং মনের বাঞ্ছিত যাহা তাহাও পাইব।

[৩] এতদেশীয় লোকের মধ্যে এমত যে কুব্যবহার অমিলন ও মিথ্যা কথা চলিত আছে সে কেবল দেব দেবীর দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হয়, কেননা যাহা মনুষ্য ধ্যান করে তাহার চরিত্র সেই প্রকার হয়, দেবদেবীর বিষয়ে যেমত শাস্ত্রেতে লিখিত আছে, তাহা আমি তরুণ লিখি, এবং বুদ্ধিমান লোকেরা এই সকল মনে বিবেচনা করিবেন, বাঙ্গালিরদের প্রতি আমার যেমন স্নেহ ও ভালবাসা উপকার চিন্তা তাহা প্রকাশিত আছে ইহকালে ও পরকালে যেন দুঃখে ভোগ না হয়, ইহা আমার প্রার্থনা, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে ঈশ্বরের বিষয় ভাবনার কথা উপযুক্ত আছে বটে, যেমন আমি শাস্ত্র হইতে এই পুস্তকের মধ্যে প্রমাণ দিতেছি, যে সকল অগ্রাহ্য কথা লিখিত আছে সে কেবল পূর্বলোকেরদের বুদ্ধি অনুসারে রচিত হইয়াছে, এই পুস্তক পড়িলে জ্ঞাত হইবেন, প্রতিমা পূজা করিতে তোমরা সকল কালাফিরিস্কারী স্মৃতি হইতেছ, উহার পুতুলিকাতে পূজা করে, বাঙ্গালির ব্যবহার বিষয়ে আমি কিছু কহি, সাংসারিক ব্যবহার বস্ত্রাদি পরিধানের এবং পরিবারাদির কথা কহিতে আবশ্যক নাই, সে সকল থাকুক, ভাল, কিন্তু খাচ্ছাখাওয়া ও স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিবেচনা [৪] করা এ সকল অতি মূর্খের কথা, ইহার দিষ্টান্ত দেখ, গয়লার ঘরে অপবিত্র স্থানে স্থিত এবং সর্বদা অশুচি যে তাহার স্ত্রীপুত্র তাহাদের স্পর্শেতে দুষ্ট ও অপবিত্র যে ভাও তাহাহইতে দূর লইয়া পাত্রাস্তরে রাখিয়া ব্রাহ্মণ সকল দূর থাক, সেই আপন পাত্র যদি অল্প কেহ স্পর্শ করে তবে ব্রাহ্মণের জাতি যায়, এবং ময়রা ও দোকানিরা হুঙ্কার দ্বারা মিঠাই প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণকে বিক্রয় করে, ব্রাহ্মণ সকল তাহা ভোজন করে ইহাতে কিছু জাতির ক্ষতি হয় না, আর দেশান্তর হইতে নৌকার উপর তঙুলাদি আনে তাহার উপর নাবিকেরা পাক করিয়া খায়, তাহাতে উৎসৃষ্ট মৎস্তাদি থাকে, তাহা ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিলে দোষী হয়েন না, অল্প এক প্রমাণ দেখ, জাহাজের উপর অনেক বস্ত্র অর্থাৎ মরিচ ও এলাচ, লবঙ্গ জায়ফল প্রভৃতি আইসে, তাহা স্বচ্ছন্দে সকলে খায়, কিন্তু সেই জাহাজে আনীত অল্প বস্ত্র অর্থাৎ পিপরমেন্ট প্রভৃতিকে স্নেচ্ছস্পৃষ্ট বলিয়া খায় না, কেননা স্নেচ্ছস্পৃষ্ট ভোজন করিলে

জাতি নষ্ট হয়, দেশদেশান্তর ব্যবহার থাকুক, কিন্তু এমত করাতে বুঝ না যে ঈশ্বরের বিচারেতে যে কিছু পুণ্য হয়, কিম্বা উদ্ধার হয়, তিনি অর্থাৎ [৫] পরমেশ্বর অন্তঃকরণের মালিন্য, ও কুচিন্তা, এবং কুব্যবহার জ্ঞানিয়া বিচার করেন, জীবের মন যদি পরস্ত্রীর প্রতি কামাভিলাসেতে যায়. ও পরের ধনাদিতে লুপ্ত হয়, তবে ঈশ্বরের সাক্ষাতে সেই কুকর্মে এবং তাহার উচিত দণ্ড তেঁহ দেন, প্রকৃত কথা এই যে বাহ্য শরীরাদির বিষয় কেবল পশুর তুল্য হয় তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছু সম্বন্ধ নাই কিন্তু মনের সহিত জানিয়া, আরো দেখ মনুষ্য মরিলেই শ্রেষ্ঠ শরীর হয় পরে পুত্রাদি তাহার শ্রাদ্ধ করিলে পূর্ণ সম্বৎসরানন্তর সেই মনুষ্য প্রেতশরীর ত্যাগ করিয়া অল্প এক ভোগ শরীর পায়, শ্রাদ্ধ না করিলে প্রেতই থাকে ইহাতে বুঝা যায় যে সকল বিষয় কেবল মনুষ্যের হস্তগত তাহাতে ঈশ্বরের কৃতিত্ব কিছুই নাই। বাঙ্গালিদের বিবাহের বিষয় দেখ দেখি বড় কুলীন ব্রাহ্মণেরা অর্থাৎ কাকী হইয়া অনেক বিবাহ করেন পরে তাহারা যে স্ত্রীর নিকট লাভের বিষয় অতিশয় বুঝেন তাহারদিগের তদ্ব্যবধারণ করেন অল্প দুঃখিনী স্ত্রী সকল মনপীড়াতে দক্ষ হইয়া কালযাপন করে আর তাহার মধ্যে কেহ দুঃখ সহিতে না পারিয়া ধর্মবিপর্যায় কর্তব্য করে এবং ঐ কুলীনরা ব্যয়বৃদ্ধি [৬] প্রযুক্ত খরচ করিতে না পারিয়া আপন কন্যা কিম্বা ভগিনীরদের বিবাহ দেন না বলেন যে বর মেলে না আর কোনও ধনলোভি অনেক ধন পাইবার আসাতে ঐ ব্রাহ্মণেরা কন্যা বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়া কন্যাকে অধিক বয়স্ক অর্থাৎ যুবতী প্রায় করিয়া রাখে, পরে জাত্যাদি বিবেচনা না করিয়া এমত বরের চেষ্টা করেন যে তাহাতে বরের একচিহ্নও পাওয়া যায় না, তাহাতে ঐ পরাধীন কন্যার বৃদ্ধাদি পতিতে মনঃ সন্তোষ না হওয়াতে কুকর্মে প্রবৃত্তি হয়, এইরূপ বিবাহ হওয়াতে দুঃখ ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ কন্যা না পাইয়া অত্রাহ্মণ জাতিজ্ঞাদির কন্যা ব্রাহ্মণ কন্যা জ্ঞান করিয়া বিবাহ করেন, পরে অল্প প্রধান ব্রাহ্মণ এবং কুটুম্বেরদিগকে বউভাতে খাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ বধূর হস্তে সপাত্র অন্ন দিয়া বধূর পরিবেশন দ্বারা ভোজন করান, তাহাতে গৃহস্থ নির্দোষী হয়, হিন্দুদিগের প্রধান যে ব্রাহ্মণ তাহারদিগের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অল্প জাতির কথা কি কহিব কেননা গুরুর ব্যবহার জানিলে শিষ্যের বিষয় আপনি জানা যায়, ইহাতে বোধ হয় যে বাঙ্গালিদিগের ধর্মাসুস্থান প্রায় নাই।

[৭] অপর ব্রাহ্মণ সকল যজ্ঞোপবীতকে কর্ণের উপর রাখিয়া মন্মুত্রাদি ত্যাগ করে ইহার কারণ তাহারা বলে যে গুরুর মন্ত্র প্রদান করিলে কর্ণ পবিত্র স্থান হয়, একি আশ্চর্য্য ঐ নির্দোষ ব্যক্তির কিছু বিবেচনা করে না যে মন্ত্রদ্বারা যদি কর্ণ পবিত্র হয় তবে আন্তরিক ও শুদ্ধ হইতে পারে তাহাদের এরূপ করাতে কেবল বালকের বুদ্ধি প্রকাশ হয়।

১৮৩৫ সনে ক্যালকাটা খ্রীষ্টীয়ান ট্রাস্ট এণ্ড বুক সোসাইটি 'তিমিরনাশক' (পৃ. সংখ্যা ২০)— এই পরিবর্তিত নামে 'তমোনাশকে'র একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার এক খণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।

মৃত্যু

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। জীবনের শেষ দিকে তিনি নানা ভাবে শোক দুঃখ পাইয়াছিলেন।

বাংলা গল্প-সাহিত্যের ইতিহাসের গোড়ার দিকে যে-সকল বিদেশীয় পণ্ডিত ইহাকে

গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, ষ্টুয়ার্ট তাঁহাদের অগ্রতম। তাঁহার ভাষাও অপেক্ষাকৃত প্রাজ্ঞ। এই হিসাবে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টের নাম আমাদের অরণীয়।

ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টকে অরণ করিবার সময় এই কথাটাই বিশেষভাবে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, যে-কারণেই হউক, বাঙালীর ছেলেদের আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্ত তখনকার দিনে না-ছিল কোনও বিদ্যালয়, না-ছিল কোনও পাঠ্যপুস্তক। ইহারা নিজেদের চেষ্টায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হন নাই, ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়া নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া সেগুলি বিতরণ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন; কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি ও স্কুল সোসাইটি পরে এই কার্যে অগ্রসর হন। বাংলা দেশের পক্ষে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ফলপ্রসূ হইয়াছে কি না, আজকাল অনেকে সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা নিজেরা এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া যত দিন ইহার প্রাধান্য স্বীকার করিব, তত দিন ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট-প্রমুখ সম্ভদয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নাম শ্রদ্ধার সহিত আমাদিগকে উচ্চারণ করিতে হইবে।*

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* এই প্রবন্ধ-সঙ্কলনকালে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য লইয়াছি :—J. Long : *Hand-Book of Bengal Missions* (1848), pp. 79-80, 90-92. *First and Second Reports of the Calcutta School-Book Society*. ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ।

বৌদ্ধ অপদান

অপদান শব্দের অর্থ “পবিত্র কৰ্ম্ম” অথবা “স্মারোচিত কৰ্ম্ম”।^১ প্রত্যেক অপদানে নায়ক এবং নায়িকার অতীত জন্মের ইতিহাস পাওয়া যায়। জাতক ও ইহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, জাতকে কোন না কোন বুদ্ধের অতীত জীবনী বর্ণিত আছে; কিন্তু অপদানে প্রধানতঃ যে বৌদ্ধ ভিক্ষু ‘অরহত্ত্ব’ লাভ করিয়াছে, তাহার জীবনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

অপদান বৌদ্ধ ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ। ইহা সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায় নামক গ্রন্থের শেষ পুস্তক। ইহা একটি স্থলিখিত কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মহৎ কৰ্ম্মগুলি বিশদভাবে বর্ণিত আছে। বৌদ্ধ যুগের বৌদ্ধসংঘের ৫৫০ জন পুরুষ এবং ৪০ জন স্ত্রীলোকের ব্যক্তিগত জীবনবৃত্তান্ত ইহাতে পাওয়া যায়। থেরথেরীগাথার টীকায়ও এই সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের পালি টেক্সট সোসাইটী এই গ্রন্থখানিকে দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান, যথা—পূজা, বন্দনা, দান প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

অপদান গ্রন্থে পীঠস্থান, (মৃতের) স্মৃতিচিহ্ন এবং সমাধি-স্তূপের আবশ্যকতা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা পাওয়া যায়। এই পুস্তকে পশু পক্ষী, বৃক্ষলতা, ফুল ফল, জাতি, ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রভৃতির চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে। স্থপতিবিজ্ঞান, ভাস্কর্য্য প্রভৃতির উল্লেখও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। আমরা এখানে গ্রন্থখানির উল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনা করিব। ইহার পূর্বে এই গ্রন্থের আলোচনা আর কেহই করেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে অতীত বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত ঐতিহাসিক বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হইবে।

পশু, পক্ষী, মৎস্য, সর্প, উদ্ভিদ, ফুল, ফল প্রভৃতির বিবরণ

চক্রবাক—লালবর্ণ রাজহংসী (জাতক সং ৪৫১ এবং ৪৫২)। ইহাদিগকে Anas Casarca বলা হয়। চিত্রকূট পর্ব্বতের উপরিভাগে যে সকল শিশু রাজহংসী দলে দলে বাস করিত, তাহারা খাছানুসন্ধানে বহির্গত হইয়া পুনরায় স্ব স্ব বাসস্থানে ফিরিয়া আসিত। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাহারা পুনরায় খাছসংগ্রহের জন্ত বহির্গত হইত।^২

দিম্বিভা—একটি পক্ষীর নাম, সম্ভবতঃ তিম্বির পক্ষী। একজন ব্যাধ একটি লোক তিম্বির পক্ষী ধরিয়া, তাহাকে খাচায় আবদ্ধ করিয়া সময়ে শিক্ষা দিত এবং আদর করিত। যখন তাহাকে অরণ্যে লইয়া যাওয়া হইল, তখন তাহার চীৎকারে নিকটস্থ অতীত তিম্বির পক্ষীগুলি প্রলুব্ধ হইল।^৩

১। Vide Avadana, Apadana by M. Winternitz (Journal of the Taisho University, Vols. VI-VII).

২। Apadana, pp. 15 foll., 346-47, 362-63, 368, 383, 394.

৩। Jatakas, Nos. 187, 370, 429। ৪। Jāt, No. 319.

- হংস—সাধারণতঃ রাজহংস (Barhut, fig. 107)। বিমানবথু নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের
• টীকায় (পৃঃ ৫৭) স্তবর্ণময় রাজহংসের উল্লেখ আছে। রবি-হংস একপ্রকার রাজহংসের
নাম।

জীব-জীব—(অথবা জীবংজীব)—জীবজীব পক্ষীর নামান্তর।

কোকিল, করবিকা— ভারতীয় কোকিল, ইহার স্তব্ধ (মধুরস্বরা)।*
কোকিল দুই বর্ণের—কৃষ্ণবর্ণ ও বিচিত্রবর্ণ।* জাতকে (সং ৫৩৬) তিন প্রকার ভারতীয়
কোকিলের উল্লেখ আছে, যথা,—পরাতুত, চেলাবক এবং ভীমকার।

• কোঞ্চ—* বিমানবথুর টীকায় সারস কোঞ্চ শব্দের প্রতীকস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে।
এই পুস্তকে কেশগুচ্ছযুক্ত সারসের উল্লেখ আছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, বজ্রনাদে
সারসের গর্ভসঞ্চার হয়; স্তবরাং বজ্রকে উহাদের পিতা এবং বিদ্যুৎসমেত মেঘকে উহাদের
পিতামহ বলা হয়।*

কালকম্বিকা—একপ্রকার অশুভমূচক পক্ষী।*

কোসিকা—(পেচক)—ইহার বাঁশের বনে আশ্রয় লয় এবং কাকের ভয়ে উহার
মধ্যে লুকাইয়া থাকে। একদল কাক একটা পেচককে আক্রমণ করিয়া উহাকে ভূপাতিত
করিয়াছিল।*

কুক্কুটি* (মুরগী)—মুরগীরা ডানা মেলিয়া ডিম্বের উপর বসে এবং উহাকে উষ্ণ
রাখে। তার পর উহারা ডিম্বগুলির মধ্যে স্বধর্ম সঞ্চার করে। প্রথমতঃ মন্তক গঠিত হয়;
পরে পা, নখ, পাখা, মুখ প্রভৃতি গঠিত হয়। এইরূপে ডিম্বগুলির সর্বাপেক্ষ সম্পন্ন হয়। ডিম্বের
উপরের ছাল পাতলা হইলে তাহার ভিতরে আলো প্রবেশ করে। তার পর ছোট ছোট
মুরগীর ছানাগুলি ডিম্বগুলি হইতে বহির্গত হইবার জন্ত তাহাদের ঘাড় বাহির করে এবং পা
দিয়া তাহাদের মাথায় আঘাত করে।*

মিলিন্দপন্থের (মিলিন্দ প্রশ্নের) মতে কুক্কুটের কতকগুলি অসাধারণ গুণ আছে,—
(১) কুক্কুটেরা খুব প্রাতঃকালে ডাকে; (২) ইহার পায়ের দ্বারা মাটি সরায় এবং মাটি
সরাইয়া যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য পায়, তাহা ভক্ষণ করে; (৩) যদিও ইহাদের চক্ষু আছে,
তথাপি ইহারারাত্রিকালে অন্ধ; (৪) ইহাদিগকে যষ্টির দ্বারা তাড়াইবার চেষ্টা করিলেও
ইহার আপন বাসস্থান পরিত্যাগ করে না।

১। *Papancasudani*, III, 382-83. ইহা চক্ষু দ্বারা স্বপক্ক আশ্র ভক্ষণ করে এবং সৃষ্টি রস
নান করে। তার পর ইহা পাখা দ্বারা উড়িতে চেষ্টা করে এবং স্তম্ভুর স্বরে গান করে। বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে
করবিকার অপর একটা নাম কলবিক।* (*Vide Ind. Cul. Vol. I, p, 123*).

২। *Vimāna Vatthu Commentary*, p. 57. Cf. *Papancasudani*, III, 382-383.

৩। *Vimāna Vatthu Commentary*, p. 57.

৪। *Jat*, No. 506. ৫। *Jat*, No. 274.

৬। *Jat*, No. 206. ৭। *Jat*, No. 226.

৮। Pea-hen in a border country, *Jat*, No. 491.

• ৯। *Papancasudani*, Pts. Pt. II, p. 70.

কুকুৎথা—(Phasianus Gallus)।

• কুররা—(সামুদ্রিক ঈগল পক্ষী)।

গোরা—(ময়ূর)^১, (Barhut, Fig. 9৯)।

পারেবতা—(পায়রা), (Barhut, Fig. 94)।

পোক্খরসাতকা—(এক জাতীয় সারস, Ardea Siberica)।

রবিহংসা—এক প্রকার হংস।

সতপত্ত—(কাঠঠোকরা) (Barhut, Fig. 103)। জাতক^২ হইতে জানা যায় যে, ইহার বৃক্ষের উপরিভাগে বসিয়া থাকে। ইহার একজাতীয় সারস।

সেনক—(বাজপক্ষী)—ইহা হিংস্রপ্রকৃতি।^৩ যে গৃহে হত্যাকাণ্ড হয়, সাধারণতঃ তথায় এই পক্ষী গমনাগমন করে।^৪

শিখি—(ময়ূর)। ইহার মাথায় কেশগুচ্ছ আছে।

সুক, সারি (শুক, শারী)—শুক পক্ষী খুব দ্রুত উড়িতে পারে। যখন উহারা বার্ককো উপনীত হয়, তখন উহাদের চক্ষুই প্রথম নষ্ট হয়। উহাদের আদি বাসস্থান হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে ছিল।^৫ স্বাস্থ্যপ্রাপ্ত শুক পক্ষীকে মধু ও খই খাইতে এবং চিনি-মিশ্রিত জল পান করিতে দেওয়া হয়।^৬

তচ্চূড়কা—(মোরগ)।

অপদানে নিম্নলিখিত পক্ষীগুলির উল্লেখ নাই, যথা—ময়না^৭, শকুনি^৮, কুনাল পক্ষী^৯ ময়হক^{১০} এবং চিরিটিক^{১১}। ময়না অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং প্রয়োজনীয়। শকুনিরা সাধারণতঃ কবরস্থানে বিচরণ করে এবং গরু, মহিষ প্রভৃতি জন্তুদের মাংস ভক্ষণ করে। ময়হক পক্ষী পর্বতের গুহায় বাস করে এবং অস্থব বৃক্ষের উপর বিশ্রাম করে। উহারা “আমার” “আমার” বলিয়া চীৎকার করে। জাতকে গরুড় পক্ষীরও উল্লেখ আছে^{১২}। ইহার হিমালয় প্রদেশস্থিত শিমুল গাছে অবস্থান করে।

মাছ

মগগুরা—মাগুর মাছ।

মুঞ্জরোহিত—(Cyprinus Rohit)—একজাতীয় পোনা মাছ। মুঞ্জরোহিত ও রোহিচ্চ একই মাছের নাম। বাংলা দেশে ইহাকে রুই মাছ বলা হয়।

১। ময়ূরের বানা বৈচিত্র্যের উল্লেখ জাতকে পাওয়া যায়—*Jataka* (Fausboll), VI, pp. ১97, 539, 540, 535.

২। *Jataka*, No. 375.

৩। *Jat*, No. 206. ৪। *Jat*, No. 168. ৫। *Jat*, No. 546.

৬। *Jat*, No. 255, No. 429. ৭। *Jat*, No. 329.

৮। *Jat*, No. 546. ৯। *Jat*, No. 399. ১০। *Jat*, No. 536.

১১। *Jat*, No. 390. ১২। *Jat*, No. 526.

১৩। *Jat*, No. 543. জৈন গ্রন্থে গরুড়কে বেণুদেব বা বিষ্ণুদেব বলা হইয়াছে। (*Jaina Sutras*, II, p. 290).

পাঠীন—*Silurus Boalis* নামে পরিচিত।^১ **পাবুস**—এক জাতীয় মাছ।

সঙ্কুল—অজ্ঞাত। **বালজ**—অজ্ঞাত।

গঙ্গা ও যমুনা নদীর মাছ জাতকে উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণিত আছে। উপরোক্ত তালিকার মধ্যে তিমি মাছের উল্লেখ নাই। ইহারা সমুদ্রে বাস করে। দীঘনিকায়ের ঢাকা স্মৃৎসনবিলাসিনীতে ইহাদের উল্লেখ আছে।^২ জাতকে বোহার নামে এক জাতীয় মৎস্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার আকৃতি ভয়ানক।^৩

কুলিরকা—জাতকে স্তবর্ণময় কাকড়ার উল্লেখ আছে।^৪ ইহারা ককট-গিরিহ্রদ নামক স্থানে বাস করে।^৫

সরীসৃপ

অজগরা—অজগর-সর্প নামে পরিচিত (*Boa constrictor*)।

কিম্বরী—অঙ্গুর। ইহারা সাধারণতঃ জলে বাস করে।

কুস্তীনা—কুমীর। (*Barhut*, fig. 77)।

ওগহা—অজ্ঞাত।

সঙ্গা—সর্প। (*Barhut*, fig. 116)।

সর্প চারি জাতীয় :—(১) বিরূপকথ সর্প, (২) এরাপথ সর্প, (৩) ছন্ধ্যাপুত্ত সর্প, এবং (৪) কণ্ঠা-গোতম সর্প।^৬

স্মৃৎসনার—কুমীর। **ভন্তিগুগাহা**—অজ্ঞাত।

মৎস্ত এবং কচ্ছপ তাহাদের স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা কখন বৃষ্টি হইবে, অথবা কখন অনাবৃষ্টি হইবে, তাহা বুঝিতে পারে।^৭ অপদানে ভেক এবং জল-সর্পের উল্লেখ নাই। জাতকে সবুজবর্ণ ভেক (*Barhut*, fig. 117) এবং মৎস্তভোজী জলসর্পের উল্লেখ আছে।^৮ অপদানে ভোঁদড়ের উল্লেখ নাই। ইহারা মাংসাশী জলচর প্রাণী। ইহাদের দেহখানি লম্বা, পাগুলি জোড়া, লোমগুলি ছোট ছোট এবং গায়ের বর্ণ বাদামী। ইহারা মৎস্তভোজী।^৯

জীব জন্তু

অচ্ছকোক—ভল্লুক।

অস্মা—অশ্ব। (*Barhut*, figs. 13A এবং 77)। **বলাহ ও সিন্ধু**—উৎকৃষ্ট অশ্ব (*Barhut*, Pt. XXVI, fig. 136)।^{১০} সিন্ধুঘোটক যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। ইহা-দিগকে উৎকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া হয় এবং সযত্নে রাখা হয়।^{১১}

১। *Jat*, No. 451.

২। Pt. II, p. 487 ; ভুল. *Barhut Inscriptions* by Barua and Sinha, p. 61, 62.

৩। No. 529. ৪। No. ২৬৭. ৫। *Jat*. No. 389.

৬। *Jat*, No. 203 ; *Atanatiya Suttanta Digha*.

৭। *Jat*, No. 178 ; *Dhaniya Sutta*, *Sutta Nipata Commentary*.

৮। No. 239, ৯। *Jat*, No. 316, ১০। *Jat*, No. 23,

কপিশবর্ণ অশ্ব—জাতকে ইহার উল্লেখ আছে।^১

পাক্কিরাজ অশ্ব—(Barhut, Pt. XXVI, fig. 136)। ইহার শ্বেতকায় ; চক্ষু কাকের মত ; চুলগুলি তুণের মত এবং ইহার আকাশে উড়িতে পারে।^২

দীপা—চিতাবাঘ। জাতকে^৩ বিচিত্রবর্ণ চিতাবাঘের উল্লেখ আছে।

এনি—এক জাতীয় মৃগ। আর এক জাতীয় মৃগ বায়ু-মৃগ (wind antelope) নামে পরিচিত। ইহার অত্যন্ত ভীরা। যে স্থানে ইহার একবার মানুষ দেখে, সে স্থান প্রায় এক সপ্তাহের জন্য ত্যাগ করে। কোন স্থানে ভয় প্রাপ্ত হইলে ইহার আত্মা সে স্থানে যায় না।^৪

মাতঙ্গ—হস্তী। (Barhut, figs. 32, 50)। হস্তীর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও প্রতিপালককে বিনষ্ট করে।^৫ জাতকে^৬ হস্তি-শিক্ষা এবং হস্তি-উৎসব বর্ণিত আছে। হস্তি-উৎসবে এক শত হস্তী শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইত, এবং স্বল্প স্বর্ণজাল, স্বর্ণ-নিশান এবং স্বর্ণ-ভূষার দ্বারা সুসজ্জিত হইত এবং যেখানে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত, সেই স্থানটিকে উত্তমরূপে সাজান হইত।^৭ ছন্দস্ত নামে এক জাতীয় উচ্চশ্রেণীর হস্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। (Barhut, fig. 128)। ইহাদের দন্ত সুবিখ্যাত। আরও দশ প্রকার হস্তীর উল্লেখ পপঞ্চসুদনীতে পাওয়া যায়।^৮

মিগা—সাধারণ মৃগ।^৯ একপ্রকার বিচিত্রবর্ণ মৃগ আছে ; ইহাদের রং সোনার মত।^{১০} পসদা (চিত্রবিচিত্র মৃগ)।

সীহা—সিংহ। (Barhut, figs. 4, 13A, 13B, 54)। সংযুক্তনিকারের টীকা সারথ্যপকাসিনীর মতে সিংহ চারি প্রকারঃ—(১) তৃণভোজী সিংহ, (২) কৃষ্ণকায় সিংহ, (৩) ঈষৎ পীতবর্ণ সিংহ এবং (৪) বড় বড় কেশরযুক্ত সিংহ। তৃণভোজী সিংহ পারাবত-বর্ণ গাভীর মত। কৃষ্ণকায় সিংহ তৃণভোজী কৃষ্ণবর্ণের গাভীর মত। ঈষৎ পীতবর্ণ সিংহ পলাশ বৃক্ষের বর্ণসদৃশ, মাংসাশী গাভীর মত। শেযোক্ত সিংহের স্বক্কে বড় বড় কেশর আছে।

১। *Jat.* No. 158. ২। *Jat.* No. 196. ৩। *Cf. Jat.* No. 510.

৪। No. 547 : *Cf. Milinda Panho*, pp. 368-369. ৫। *Jat.* No. 14.

৬। হস্তী প্রভৃতির যুদ্ধের বিবরণ—*Brahmajala Suttanta*, Dighe I.

৭। *Jat.* No. 161. ৮। No. 163. ৯। *Jat.* No. 163.

১০। *Papancasudani*, II, p. 6.

১১। জাতকে মৃগ-শিকারের বিবরণ আছে (*Jat.* No. 12)। জাতকে এক প্রকার মৃগের বর্ণনা আছে, উহার রং সোনার মত। উহার আগেকার এবং পিছনকার পা লাকার মত এক প্রকার জিনিষের দ্বারা আবৃত। উহার শিং দুইটি রূপার মালার মত, চক্ষু দুইটি গোল শণির মত, এবং মুখ লাল পশমের মত (No. 359)। এই বিবরণ হইতে আমাদের মনে হয় যে, এই মৃগটি কাল্পনিক। বারণানীর বাজারে হরিণমাংস বিক্রয় হইত (*Jat.* No. 315)।

১২। *Jat.* No. 501.

ইহার মুখের রং লাক্ষার বর্ণের স্থায় এবং ইহার লেজ পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কেশরটী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, দক্ষিণ দিকে দোহুল্যমান এবং পৃষ্ঠের উপরে লম্বিত।*

সুগংগপোতা—অজ্ঞাত। তরুচ্ছয়—তরফু।

বকভেরগুকা—নেকড়ে বাঘ (Barhut, fig. 109) এবং (শৃগাল) (Barhut, fig. 117)। একটা সিংহ এবং একটা শৃগালীর মিলনের ফলে যে সিংহশাবক জন্ম গ্রহণ করে, উহার আঙ্গুল, নখ, কেশর, রং এবং আকৃতি বাপের মত এবং উহার স্বর মায়ের মত হয়।*

বানরা—বানর। বরাহা—শূকর। ব্যাগ্‌ঘা—বাঘ (Barhut, figs. 55, 70)।

তরু, লতা, ফুল ও ফল

অলক—সম্ভবতঃ Morinda citrifolia.

আলুল—(আলুক?) ইহা Dioscorea alata অথবা Dioscorea globosa—এই দুইটির মধ্যে যে কোন একটা।

আমলক—Phyllanthus emblica, এই গাছটী অতি সুন্দর। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ইহাদের ফুল ফোটে।

অম্ব—আম।

অম্বাটক—ইহা আমড়া নামে বাংলা দেশে সুপরিচিত।

অঙ্কোল—Alangium lamarekii. এই গাছটী কণ্টকে পরিপূর্ণ। গ্রীষ্মকালে ইহাদের ফুল ফোটে।

অশোক—Saraca asoca. এই গাছটী অত্যন্ত সুন্দর; গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ইহার ফুল ফোটে। ফুলগুলি বেশ সুন্দর, বড় বড় এবং গুচ্ছে গুচ্ছে শোভিত। যখন প্রথম ফোটে, তখন ইহাদের রং কমলা লেবুর মত; ক্রমশঃ রং লাল হইতে থাকে এবং নানারূপ আভা প্রাপ্ত হয়। ইহারা রাত্রিকালে স্নগ্ধে চারি দিক্ আনোদিত করে। ইহা হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়।

অশ্বকর্ণ—শাল গাছের অপর নাম। গ্রীষ্মকালে ইহাতে ফুল ফোটে।

অতিমুক্ত (অতিমুক্ত)—মাধবীলতা নামে সুপরিচিত। বর্ষাকালে এবং শীতকালে ইহাদের ফুল ফোটে। ফুল খুব সুন্দর এবং স্নগ্ধ্যযুক্ত। অতিমুক্তের অপর নাম তিনিস (Diospyros glutinosa)। ইহাদের ফুল মুক্তার মত সাদা।

বন্ধুজীব—Pentapetes Phoenicea. একপ্রকার গাছ; ইহাদের ফুলগুলি লাল। সংস্কৃতে ইহাদিগকে বন্ধুলি অথবা বন্ধুক ফুল বলা হয়।

বেল—Aegle marmelos.

ভল্লাটক—Semecarpus anacardium. বাদামজাতীয়।

• **বিভীটক**—বহেড়া (*Terminalia belerica*)। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফুল ফোটে। ফুলগুলি ঈষৎ ধূসর বর্ণের। হরীতকী, বিভীতুক এবং আমলক—এই তিন প্রকার বয়ড়া বাণিজ্যে ব্যবহৃত হইত। ইহারা বাংলা দেশে ত্রিফলা নামে সুপরিচিত।

বিশ্বিজাল—বিশ্বী অথবা বিশ্বিকার অপর একটি নাম তেলাকুচা (*cephalandria indica*)। ইহাদের ফুল সাদা এবং বড়। ইহাদের ফল পাকিলে খুব লাল হয়।

চম্পক—চাঁপা। বর্ষাকালে ইহাদের ফুল ফোটে এবং সুগন্ধে মন মোহিত করে।

শব—*conocarpus latifolia*. এই গাছটি গৃহাদি নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়। শীতকালে ইহাদের ফুল ফোটে। ইহাকে সচরাচর ধায়ি বাবলা বলা হয়।

গিরিপুন্নাগ—সম্ভবতঃ *Mallotus philippinensis*.

হরিতক—*Terminalia chebula*. একটি বড় গাছ। গ্রীষ্মকালে ইহাদের ফুল ফোটে। ফুলগুলি ছোট ছোট; ফলগুলি ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হয়।

ইসিমুগ্গ—বাংলা দেশে দুই প্রকার গাছ আছে; শ্বেত মূর্গ এবং লাল মূর্গ। ইংরাজীতে *celosia argentea* এবং *celosia cristata* নামে সুপরিচিত। বর্ষাকালে এবং শীতকালে এই গাছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

জম্বু—*Eugenia Jambolana*. গ্রীষ্মকালে ইহার ফুল ফোটে। ইহা কাল জাম নামে পরিচিত।

জীবক—পিয়ালের অপর নাম।

কদলি—কলা গাছ (*Barhut*, figs. 121 এবং 127).

কলঙ্গ (কলমি ?)—ইহার ইংরাজী নাম *Ipomœa reptans*। ইহাদের ফুল বড় এবং গোলাপ ফুলের মত রং। অমরের মতে ইহার অপর নাম সর। অমর কলঙ্গ শব্দটি বস্তুরূপে ব্যবহার করিয়াছেন (বৈষ্ণবর্গ, শ্লোক ১০১)।

কন্দলি—বর্ষাকালে ইহাদের ফুল ফোটে। ফুলগুলি নীলবর্ণ এবং লতাগুলি মাটির ভিতর প্রবেশ করে। মেদিনীর মতে কদলী এবং কন্দলি একই গাছ।

কর—*Punica granatum*. করক নামে এক প্রকার গাছ আছে; উহা ডালিমের নামান্তর।

করন্দ—*Carissa carandas*. একটি বড় গুল্ম গাছ। ফেব্রুয়ারী, মার্চ এবং এপ্রিল মাসে ইহাদের ফুল ফোটে। ইহাদের ফল খণ্ডা হয় এবং ইহা দ্বারা আচার ও পিষ্টক তৈয়ারী করা হয়। উড়িয়ায় *Carissa diffusa*কে কুরুন্দ (করকা) বলা হয়।

কর্কিকা—অগ্নিমহু (*Premua integrifolia*) ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

কর্কিকার—*Cassia fistula*. একটি ছোট গাছ; ফুলগুলির রং হলুদের তায় এবং সুগন্ধযুক্ত।

• **কেতক**—*Gandanus odoratissimus*. সাধারণতঃ বর্ষাকালেই ফুল ফোটে। পুরুষ এবং স্ত্রীজাতীয় ফুলের মধ্যে পুরুষজাতীয় ফুল বেশী গন্ধপূর্ণ।

কেবুক—*Costus speciosus*. গুল্ম গাছ। ইহাতে পত্রযুক্ত বৃন্ত আছে। এই গাছ অত্যন্ত সুন্দর। বর্ষাকালে ফুল ফোটে।

কোল—*Ziziphus jujubar* ফল কোল নামে নরকত্র পরিচিত।

কোবিনাড—*Bavhini variegata*. ইহাদের ফুলগুলি বেশ বড়। ফেব্রুয়ারী, মার্চ মাসে ফুল ফোটে।

কুটজ—*Holarrhena antidysenterica*. ইহা একটি ক্ষণভঙ্গুর গুল্ম গাছ। ইহার ফুলগুলি সাদা এবং গন্ধপূর্ণ।

লবুজ—*Artocarpus lakoocha*. ইহা একপ্রকার ফলের গাছ।

মধুক—*Bassia latifolia*. ইহা একটি মধ্যাকৃতি গাছ। মার্চ এবং এপ্রিল মাসে ইহার ফুল ফোটে। ফুল সুন্দর এবং গন্ধপূর্ণ।

মল্লিকা—*Jesmin*. বর্ষাকালে ইহাদের ফুল ফোটে। ফুল সাদা এবং গন্ধযুক্ত।

মাতুলুঙ্গ—লেবু। (*Citrus medica*)।

নাগ—নাগকেশর (*Mesua ferrea*)। এই গাছটি বেশ সুন্দর; ফুলগুলি বড় বড়, সুন্দর এবং গন্ধপূর্ণ। গ্রীষ্মকালে ইহাদের ফুল ফোটে।

নিগ্রোধ—বট গাছ (*Barhut*, fig. 31)।

নিম্ব—*Melia azadirachta*। এই গাছটি সুন্দর এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহাদের ফুল গন্ধযুক্ত।

নীপ—কদম্ব। গাছটি বেশ বড়। বর্ষাকালে ফুল ফোটে।

পদ্ম—পদ্ম (*Nelumbium speciosum*)।

পলাশ—*Butea frondosa*. পলাশ গাছ। ফুল অতি সুন্দর। মার্চ এবং এপ্রিল মাসে ফুল ফোটে। ফুলগুলি কয়লা লেবুর মত লাল, কিন্তু নীচের দিকে রূপার মত সাদা।

পনস—*Artocarpus integrifolia*।

পাটলি—পাকল *Bignonia Suaveoleus* (*Barhut*, fig. 26)। এই গাছটি মধ্যাকৃতি; ফুল সুন্দর এবং গন্ধপূর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল প্রফুল্লিত হয়।

পিয়ান—*Buchanania latifolia*. এই গাছটি বড়, কিন্তু ফুলগুলি ছোট। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল ফোটে। ফুলগুলি সাদা এবং হলুদে।

পুণ্ডরিক—শ্বেত পদ্ম।

পুল্লাগ—*Calophyllum inophyllum*। এই গাছটি অত্যন্ত সুন্দর। ইহাদের ফুল সাদা এবং গন্ধযুক্ত। প্রায় সমস্ত বৎসরই ফুল ফোটে।

শাল—*Shorea robusta* (*Barhut*, fig. 28)।

সনাল—*Pinus Devadara*. সম্ভবতঃ দেবদারু গাছ।

সিমুল—*Bombax malabaricum*. এই গাছটির উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। শীত-কালের শেষভাগে ইহাদের ফুল ফোটে। ফুলগুলি বেশ বড় এবং লাল।

সিকুবন্ত—নিসিন্দা (*Vitex negunda*), ইহা ছোট এবং সুন্দর গুল্ম গাছ। সমস্ত বংশেরই ফুল ফোটে। ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

টগর—*Tabernaemontana Coronaria*, ফুলগুলি খুব সাদা এবং রাত্রিকালে খুব সুগন্ধ বিস্তার করে।

তিলক—*Symplocos racemosa*. সংস্কৃতে লোঙ্গ নামে পরিচিত।

তিনমূলিক—ইহাকে *Andropogon narous* অথবা *Andropogon squarrosus* (খসখস) বলা হয়।

তিথুক—গাব (*Diospyrus glutinosa*). এই গাছটি মধ্যাকৃতি। মার্চ ও এপ্রিল মাসে ইহাদের ফুল ফোটে। ফুলগুলি সাদা এবং বড়। কেহ কেহ আবলুস গাছকে ‘তিথু’ বলিয়া থাকেন। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম *Diospyrus melanoxylon*

উদ্দালক—চালতা (*Dillenia indica*). যখন ফুল ফোটে, তখন এই গাছ দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর হয়। ইহার ফুলগুলি বেশ বড় এবং গন্ধপূর্ণ। ইহার অপর নাম শ্লেয়াতক (*Cordia myxa*)।

উদ্ভূষর—ডুমুর গাছ (*Ficus glomerata*) (Barhut, fig. 30)।

বকুল—*Mimusops elengi*. ইহার ফুল সাদা এবং গন্ধযুক্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল ফোটে।

লোক ও জাতি

অলসন্দকা—আলেকজান্দ্রিয়ার লোক।

অন্ধকা—অন্ধ নামে সুপরিচিত। কলিঙ্গের দক্ষিণে এই শক্তিশালী জাতি বাস করিত। ধনকটক অথবা অমরাবতী ইহাদের রাজধানী ছিল।

অপরাস্ত—পশ্চিম-ভারতের অধিবাসী।

ববরা—ববর এবং ববরর একই জাতির নাম। উত্তরাপথবাসী কন্বোজ, গন্ধার এবং কিরাতগণের সহিত ইহারা সংশ্লিষ্ট।

ভগ্গ—ভগ্গ অথবা ভর্গ একটা গণতান্ত্রিক জাতি। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধযুগে ইহারা উত্তর-ভারতে বাস করিত।*

চীনরট্টা—চীন-সাম্রাজ্যের অধিবাসী।

দমিড়া—দমিড়গণ তামিল নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। দক্ষিণ-ভারতের ইহারা একটা শক্তিশালী জাতি ছিল।*

হথিপোরিকা—সম্ভবতঃ অযোধ্যার উত্তর-পূর্বে কুরুদের রাজধানী হস্তিনাপুরের অধিবাসী।

১। I. C. Vol I, p. 389. ২। I. C. Vol. I. p. 391.

* ৩। মল্লিক A Short Account of the Damilas (Quarterly Journal of the Mythic Society, Bangalore, Vol. XXVII, Nos. 1 & 2) প্রভৃতি।

ইসিণ্ডা—ইহাদের পরিচয় অজ্ঞাত।

কাক্রব অথবা কক্রব—প্রাচীন ভারতের সর্বজনবিদিত একটা জাতি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইহার বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।^১

কাসিকা—যুক্তপ্রদেশস্থিত কাশীর অধিবাসী।^২

কোলকা—সম্ভবতঃ ইহারা কোলারবাসী।

কোসলকা—উত্তর-ভারতের কোশল নামক শক্তিশালী রাজ্যের অধিবাসী। ইহা বহু পূর্বেই মগধরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

মধুরকা—যুক্তপ্রদেশস্থিত মথুরানগরবাসী। মথুরা (মধুরা) এবং মোহোলি সচরাচর অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। বর্তমান মথুরা হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মোহিলি সहर অবস্থিত। প্রাচীন ভারতে মধুরা অথবা মথুরা নামে আর একটা সहर ছিল। ইহা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বৈগি নদীতটস্থ পাণ্ড্যরাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল। উত্তর-ভারতের মথুরা হইতে পৃথক করিবার জন্ত ইহাকে দক্ষিণ-মথুরা বলা হইত।^৩

মলয়া সোমভূমকা—মলয়দেশীয় স্বর্ণভূমির অধিবাসী।

মলয়ালকা—মলয় দেশের অধিবাসী।

কুসিনারার মল্ল—ইহারা একটা গণতান্ত্রিক জাতি।^৪

মট্টনা—ইহাদের পরিচয় অজ্ঞাত।

মেকলা—ইহারা একটা ক্ষুদ্র জাতি। বর্তমান অমরকন্টক পর্বত ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের মধ্যবর্তী দেশে ইহারা বাস করিত।^৫

মুণ্ডকা—সম্ভবতঃ পর্বতবাসী মুণ্ডাগণ। সাঁওতাল পরগণা, ছোট নাগপুর, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ এবং হিমালয়ের নিম্নদেশে ইহাদের বাস আছে।

ওড্ডকা—ওড্ডা অথবা উড্ডা। পশ্চিম-মেদিনীপুর, মানভূম, পূর্ব-সিংভূম এবং দক্ষিণ-বাকুড়ায় ইহারা বাস করিত।

পল্লবকা—দক্ষিণ-ভারতের একটা জাতি। ইহারা উত্তরভারতের কোন একটা জাতি হইতে উদ্ভূত। কাঞ্চীপুরে ইহাদের রাজধানী ছিল।^৬

সাকুলা—সম্ভবতঃ সাকল অথবা সাগল দেশের অধিবাসী। ইহা বেক্ত্রিয়ার রাজা শিনান্দরের রাজধানী ছিল।

১। মল্লিখিত Ancient Indian Tribes (Vol. 2, pp. 31—33) দ্রষ্টব্য।

২। মল্লিখিত Ancient Indian Tribes, Ch. I দ্রষ্টব্য।

৩। মল্লিখিত Geography of Early Buddhism, p. 21 দ্রষ্টব্য।

৪। মল্লিখিত Some Ksatriya Tribes of Ancient India, pp. 147 foll দ্রষ্টব্য।

৫। মল্লিখিত Ancient Indian Tribes, Vol. 2, p. 28 দ্রষ্টব্য।

৬। The Early Pallavas by D. C. Sircar দ্রষ্টব্য।

শবরা—ইহারা একটা অনার্য্য জাতি। দক্ষিণাপথের কোন একটা অংশে ইহারা বাস করিত।*

অুদ্রকা—মহাভারতের শূদ্রকগণ। ইহারা Oxydrakai নামে পরিচিত। ইহাদের রাজধানী ছিল উচ (অথবা কুচ)।*

অুপ্পারিকা—বেসিন হইতে ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং বোম্বাই হইতে ৩৭ মাইল উত্তরে থানা জেলার অন্তর্গত সুরপারক অথবা সোপারার অধিবাসী।

সুরট্টা—সৌরাষ্ট্র অথবা গুজরাট অথবা কাথিয়াড় দেশের অধিবাসী।*

বেলবকা—ইহাদের পরিচয় অজ্ঞাত।

যোনকা—ইহারা গ্রীক নামে পরিচিত।

পেশা

তখনকার লোকেরা জীবিকা নির্বাহের জন্য নানা পেশা অবলম্বন করিত ; অপদানে উল্লিখিত পেশাগুলির বিশদ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।*

অনিকট্টা—রাজার দেহরক্ষী,

প্রাণ-রক্ষী।

চন্দ্রকারা—(অথবা রথকারা)—চন্দ্রকার,

চন্দ্রশোধক, অশ্বসজ্জাকার।

চাপকারা—ধনু-নির্মাতা।

দোবারিকা—দ্বার-রক্ষক।

দ্রুমসিকা—বস্ত্রব্যবসায়ী।

গন্ধিকা—গন্ধ-ব্যবসায়ী।

হথারুহা—হস্তিচালক।

হথিপালা—হস্তিপালক।

কন্দ্রা—কন্দ্রকার।

কট্টহারা—কাষ্ঠ-সংগ্রহকারী।

কুন্তকারা—কুন্তকার।

লোহকারা—লোহকার, তাম্রকার।

মণিকারা—মণিকার।

নলকারা—ঝুড়ি প্রস্তুতকারক।

পেসকারা—তন্তুবায়।

পেসসিকা—চাকর।

পুষ্পচ্ছন্দকা—পুষ্প অপসারক।

রজকারা—রজক।

সোম্নকারা—স্বর্ণকার।

সুপিকা—পাচক।

তচ্ছকা—স্বত্বধর।

তেলিকা—তৈল-প্রস্তুতকারক।

টিপুকারা—টিন-কন্দ্রকার।

তুম্বায়া—দরজী।

উদহারা—জল-বাহক।

উসুকারা—বাণ-নির্মাতা।

এই তালিকার মধ্যে ক্রমিক এবং গো-রক্ষকের কোন উল্লেখ নাই।

১। I. C. Vol. I, p. 305. মল্লিখিত Some Notes on Tribes of Ancient India.

২। N. L. De—Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, p. 195.

৩। ঐ, p. 183. ৪। I C. Vol. I, pp. 343 foll.

৫। এই প্রসঙ্গে Rhys Davids এর Buddhist India গ্রন্থে (পৃঃ ৮৮) উল্লিখিত পেশার তালিকা তুলনীয়।

ভৌগোলিক তথ্য

অপদানে উল্লিখিত নদী প্রভৃতির বৃত্তান্ত নিয়ে দেওয়া যাইতেছে।

ভাগিরথী—গঙ্গার অপর নাম ; ইহা হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠ পুণ্য নদী।

চন্দ্রভাগা—চন্দ্রভাগা নদী। ইহা হিমালয় পর্বত হইতে বহির্গত হইয়াছে। ইহার তীরে একটা জলপরী বাস করিত ; সে বুদ্ধদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিল।*

চিনতা—এই নদী বুদ্ধ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল।*

গঙ্গা—গঙ্গা নদী বাঙ্গালা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং সাহারণপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহা সাগরতীরের নিকটস্থ সাগরে পতিত হইতেছে।

মহী—পঞ্জাব প্রদেশের একটা নদী। ইহা গণ্ডক নদীর শাখা।

নর্মদা—ইহা অমরকণ্টক পর্বত হইতে বহির্গত হইয়া কাষে উপসাগরে পতিত হইতেছে। এই নদী ও সাগরের সঙ্গমস্থল হিন্দুদিগের একটা পুণ্য তীর্থস্থান।

সরস্বতী—ইহা হিন্দুদিগের একটা পবিত্র নদী। ইহা সেওয়ালিক নামক হিমালয়াক্ষলের সিবমুর পর্বত হইতে বহির্গত হইয়া আখালায় সমভূমিতে পতিত হইতেছে।

সরভূ—সরভূ নামে সুপরিচিত। ষোণ্ডা অথবা গোণ্ডা ইহার অপর একটা নাম। প্রাচীন অযোধ্যা ইহার তীরে অবস্থিত।

সিন্ধু—সিন্ধু নদ।

যমুনা—ইহা গঙ্গার মত একটা পবিত্র নদী।

হিমালয় অঞ্চলের কতকগুলি পর্বতের নাম নিয়ে দেওয়া হইল :—অনোম, অসোক, ভূতগন, চাবল, গোতম, হারিত, কুকুর, লম্বক, রোমস, সোভিত, বসত এবং বিকট।

হিমালয় হইতে অনতিদূরে চারল নামে একটা পর্বত ছিল ; এখানে বুদ্ধ স্তম্ভস্নান একটা গুহার মধ্যে বাস করিতেন।* নিম্ন পর্বতের উপরিভাগে পর্বকুটীরে স্তম্ভজিত স্তম্ভুতি শ্মশির আশ্রম ছিল।* কুকুর পর্বতে মল্লবিদ একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল।* বসত পর্বতের পাদদেশে জনৈক ব্রাহ্মণের আশ্রম ছিল। ইনি মল্লশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বুদ্ধদেবের মহৎ উপদেশবাক্যগুলি আলোচনা করিতেন।* সোভিত পর্বতের উপরিভাগে বকুলের জন্ত একটা আশ্রম নির্মিত হইয়াছিল। ইনি শিষ্যগণ সহ এখানে বাস করিতেন।*

চিন্তকুট—ইহা বুদ্ধেলখণ্ডস্থিত কামতানাথ পর্বত। ইহা মন্দাকিনী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে রামচন্দ্র বনবাসকালে কিছু দিনের জন্ত বাস করিয়াছিলেন।

গঙ্কমাদন—রুদ্রহিমালয়ের একটা অংশ। কেহ কেহ বলেন, ইহা কৈলাস পর্বতের একটা অংশ। ইহা কৈলাস পর্বতের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। এই পর্বতের উপর

১। Apadana, p. 450.

২। Apadana, p. 428.

Apadana, p. 451.

৪। Apadana, p. 67.

৫। Apadana, p. 155.

৬। Ibid, p. 167.

৭। Ibid, p. 328.

বদরিকাশ্রম বিজ্ঞান। কথিত আছে, হনুমান্ ইহার একটি অংশ লইয়া আসিয়াছিল। জাতকে^১ ইহাকে পাষণ-গিরিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বেতার পর্বত—ইহা মগধ দেশের একটি পর্বত। গিরিব্রজ সহর পাঁচটি পর্বতের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং এই পর্বত তাহাদের মধ্যে একটি।

বন্ধুগতী—এই সহরে একটি রাজোত্তান ছিল।^২

চম্পা—অঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী। ভাগলপুরের নিকটবর্তী চম্পানগর এবং চম্পাপুর নামে যে দুইটি গ্রাম আছে, সম্ভবতঃ চম্পা তাহাদেরই নামান্তর।^৩

গিরিব্রজ—মগধ দেশের প্রাচীন রাজধানী। রাজগৃহের পুরাতন নাম।^৪

হংসবতী—কয়েক জন ধেরী (যাহাদের গাথা ধেরীগাথার মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে) পূর্বজন্মে এই সহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বুদ্ধদেব এই সহর পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং একজন কুম্ভকার তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিল।^৫ ইহা গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।^৬ অপদানে ইহা একটি সহর বলিয়া বর্ণিত আছে। এখানে সূজাত নামে একজন ত্রিবেদঙ্গ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি একজন ধনী এবং খ্যাতনামা শিক্ষাপ্তর ছিলেন।^৭

জেতবন—বুদ্ধদেব এই স্থান পরিদর্শন করেন এবং এখানে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেন।^৮ অনাথপিণ্ড বুদ্ধদেব ও তাঁহার সঙ্ঘকে এই স্থানটি দান করেন। ইহা শ্রাবস্তী (বর্তমান সাহেটমাহেট) হইতে এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।^৯

সাগল অথবা সাকল^{১০}—এখানে কপিল ব্রাহ্মণের কন্যা সূচিমতী বাস করিতেন। বুদ্ধদেবের নিকট ইনি ধর্মোপদেশ লাভ করেন।^{১১}

সাবৎথী^{১২}—এই স্তম্ভের শ্রাবস্তী নগরে একজন উপাসকের গৃহে কসুপ প্রতিপালিত হন। তাঁর পর তিনি বুদ্ধের উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন।^{১৩}

উরুবেনা—গয়া অথবা বুদ্ধগয়া^{১৪} হইতে ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

উত্তরকুরু—ঘারওয়াল এবং হুণদেশের উত্তরাংশ। তিব্বত এবং পূর্বতুর্কিস্থান ইহার অন্তর্গত ছিল। জাতকের মতে ইহা হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।^{১৫}

বঙ্গ—বর্তমান পূর্ববঙ্গ।^{১৬}

১। Jatak, No. 547.

২। Apadana, p. 456.

৩। B. C. Law—Geography of Early Buddhism, pp. 6-7.

৪। ই, p. 8 foll.

৫। Apadana, p. 444.

৬। ই, p. 599.

৭। ই, p. 37.

৮। ই, p. 470.

৯। B. C. Law—Geography of Early Buddhism, p. 44 ; Sravasti in Indian Literature (Mem. Arch. Surv. Ind.) No. 50, p. 22 foll.

১০। B. C. Law—Some Ksatriya Tribes of Ancient India, pp. 217 foll.

১১। Apadana, p. 583.

১২। B. C. Law—Sravasti in Indian Literature (Mem. Arch. Surv. Ind. No. 50).

১৩। Apadana, p. 614.

১৪। N. L. De,—Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, pp 212-13.

১৫। Cowell, Vol. V, p. 167 ; N. L. De—Geog. Dictionary of Ancient and Mediaeval India, pp. 213-14.

১৬। Apadana, p. 470 ; Ind. Cat. Vol. I, pp. 57 foll.

অট্টালিকা এবং স্থপতিবিজ্ঞান

অগ্গিসালা—অগ্নিশালা।	কুটীগার—চূড়াবিশিষ্ট ঘর।
আপণ—দোকান।	মণ্ডপ—বড় তাঁবু।
চচ্চর—প্রাঙ্গণ।	নহানঘর—স্নান-ঘর।
চঙ্কম—বেড়াইবার স্থান।	পাকার—চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীর।
দারকোট্ঠক—তোরণবারের উপরে	পরিখা—পরিখা।
ভাণ্ডার।	পাসাদ—প্রাসাদ।
গুহা—গহ্বর।	রাজুয্যান—রাজোত্মান।
জন্তাঘর—স্নানঘর।	সজ্জারাম—আশ্রম।

বিভিন্ন সম্প্রদায়

অপদানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একটী তালিকা পাওয়া যায়। পদকা,^১ লটুকা,^২ নিগঠা (বন্ধন-মুক্ত—বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহার মহাবীরের শিষ্য জৈন বলিয়া খ্যাত), পুপ্ফসাতকা (যাহারা পুষ্প-পরিচ্ছদ পরিধান করে), তেদণ্ডিকা^৩ (যাহারা ত্রিদণ্ড বহন করে), একসিখা (যাহাদের একটী শিখা আছে), আজ্জীবিকা (যাহারা হৃৎকলি গোসালের শিষ্য), বিলুওবী^৪, গোতমা (যাহারা গোতমের শিষ্য), দেবধম্মিকা (যাহারা বুদ্ধের মতাবলম্বী), পরিবত্তকা^৫, সিদ্ধিপত্তা (যাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে), কোণ্ডপুগ্গলিকা (অথবা কোধপুগ্গলিকা, জ্রুদ্ধ লোক), তপস্সী (তপস্বী), এবং বনচারী (বনবাসী)।^{৬*}

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

১-২। ইহাদের পরিচয় অজ্ঞাত।

৩। Rhys Davids, Buddhist India, p. 145

৪। ইহাদের পরিচয় অজ্ঞাত। ৫। অজ্ঞাত।

৬। ইহারা বুদ্ধের সমসাময়িক ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ। Anguttara, III, pp. 276-77. Rhys Davids, Introduction to the Kassapa-Sihanada Suttanta S. B. B. Vol. II, pp. 220 foll.

* ১৩৪৪।৭ই পৌষ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

যে-সকল কীর্তিমান পুরুষ জীবনের আরন্ধ কার্য্য অসম্পন্ন করিয়া যাইবার অবকাশ পান, তাঁহারা ভাগ্যবান্। তাঁহাদের জীবৎকালেই তাঁহাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিলব্ধ আদর্শ ও চিন্তাধারা দেশের ও জাতির জনগণের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে ; নিজেদের জীবন ও কীর্তির জীবন্ত আদর্শ সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে দীপ্যমান থাকে বলিয়াই তাঁহাদের মহিমাও শনৈঃ শনৈঃ বিকশিত হইতে থাকে ; নিছক বাঁচিয়া থাকিয়াই তাঁহারা উত্তরোত্তর যশের শিখরে উঠিতে সক্ষম হন। কিন্তু মৃত্যু যাহাকে অকালে সাধারণের দৃষ্টিপথের বাহিরে লইয়া যায়, আদর্শ প্রতিষ্ঠিত অথবা চিন্তাধারা বিস্তৃত হইবার পূর্বেই যাহাকে বিদায় লইতে হয়—সেই হতভাগ্য পুরুষের মহিমাময় ভবিষ্যতের সম্ভাবনা মাত্র প্রত্যক্ষ করিয়া আশান্বিত ভক্তজনের সাধুনা কোথায় ? মাত্র ত্রিশ বৎসরের অসম্পূর্ণ জীবনে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার বহুধাবিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের বহু আরন্ধ কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই ; সেজন্ত সমসাময়িক অনেক আত্মীয়বন্ধু শোক প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিংশবৎসরাধিক অর্দ্ধশতাব্দীর অন্ধকার যবনিকা তুলিয়া আজ আমরা বুঝিতে পারিতেছি, অতিপরিচয়ের প্রীতি অথবা স্নেহ কালীপ্রসন্নের যথার্থ সত্তাকে উপলব্ধি করিবার পথে বাধা জন্মাইয়াছিল ; তাঁহারা ভোরের পাখীর কাকলিমাত্র শুনিয়াছিলেন, তিমির-বিদারণ অরুণরাগ প্রত্যক্ষ করেন নাই ; যুগান্তের পরগার হইতে আজ আমরা সেই অক্ষুট আলোর আভাস পাইতেছি এবং চকিত-বিশ্ময়ে অনুভব করিতেছি যে, অকালমৃত্যু আকাশমার্গে এই জ্যোতিষ্কের গতিপথ সহসা রুদ্ধ করিয়া না দাঁড়াইলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বেই আমরা বঙ্গগগনে আর একটি ভাস্বর মহিমা প্রত্যক্ষ করিতাম।

তুলনার দ্বারা আমাদের বক্তব্য আরও পরিষ্কৃত হইবে। কালীপ্রসন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের দুই বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যখন পরলোকগমন করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তখন ‘ললিতা ও মানসের কাব্যবিলাস এবং বৈদেশিক বাণীসাধনা ত্যাগ করিয়া মাত্র দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মুণালিনী রচনা শেষ করিয়াছেন। ‘বঙ্গদর্শনে’র সম্ভাবনা তখনও ভবিষ্যতের গর্তে। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সেই স্বল্পকালের জীবনেই সমুদ্রে, রাষ্ট্রে এবং সাহিত্যে এমন সকল কীর্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাহার আলোচনা ও বিবৃতি এ যুগেও আমাদের অপরিসীম বিশ্বয়ের উদ্রেক করিতেছে। কালীপ্রসন্নের বহুমুখী প্রতিভার এবং বিচিত্র কর্মজীবনের অদ্ভুত পরিচয় লাভ করিয়া পাঠকুমারেই নিঃসংশয়ে স্বীকার করিবেন যে, এই কীর্তিমান পুরুষ দীর্ঘজীবী হইলে বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতি লাভবান হইত—
উনবিংশ শতাব্দীর কালীপ্রসন্নকে বিংশ শতাব্দীতে পরিচিত করাইবার জন্য লেখককে এতখানি পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করিতে হইত না।

নান্যজীবন

কালীপ্রসন্ন কলিকাতা জোড়াসাঁকো-নিবাসী প্রসিদ্ধ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের প্রপৌত্র, জয়কৃষ্ণ সিংহের পৌত্র, এবং নন্দলাল সিংহের পুত্র। সেকালের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির জন্মতারিখ লইয়া যেক্ষণ মতভেদ আছে, কালীপ্রসন্নের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার চরিতাকারে তাহার জন্মতারিখ ১৮৪১ সন বলিয়া মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে উহা ১৮৪০ সন।

কালীপ্রসন্ন নন্দলাল সিংহের একমাত্র সন্তান। পুত্রের জন্ম-উপলক্ষে সিংহ-পরিবারে সমারোহের সহিত যে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল, ‘সংবাদ প্রভাকর’ হইতে তাহার বিবরণ ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখের ‘ক্যালকাটা কুরীয়ার’ পত্রে অনূদিত হইয়াছিল। বিবরণটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

Nautch in Celebration of the Birth of a Child.—Last night a series of Nautches commenced at the residence of Baboo Nundolaul Sing, at Jorasanko, in celebration of the birth of his first child, a boy, which took place lately. There were a large assemblage of native gentlemen and professors of Sanscrit present on the occasion; the former were highly gratified with the musical performances of the nautch girls, and the latter with the valuable presents of Cashmere Shawls, etc.—*Prabhakur*.

কালীপ্রসন্ন শৈশবে হুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা নন্দলাল ওরফে ছাত্তু সিংহের ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হয় (৬ এপ্রিল ১৮৪৬)। স্বনাগধন্য হরচন্দ্র ঘোষ কালীপ্রসন্নের অভিভাবক এবং পিতৃ-সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

১৮৫৪ সনের ৫ই আগষ্ট বাগবাজারের প্রসিদ্ধ বহু-বংশের লোকনাথ বহুর ভ্রাতা বেণীমাধব বহুর কস্তার সহিত চতুর্দশবর্ষবয়স্ক কালীপ্রসন্নের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। ‘সংবাদ প্রভাকর’ প্রকাশ :—

শ্রাবণ, ১২৬১।...মৃত বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের হুশীল পুত্র শ্রীমান বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের শুভ বিবাহ বাগবাজার নিবাসি গিষ্টভাষি সদ্ধিদান শ্রীযুত রায় লোকনাথ বহু বাহাদুরের ভ্রাতৃকস্তার সহিত অতি সমারোহ পূর্বক নির্বাহ হইয়াছে।—‘সংবাদ প্রভাকর,’ ১৬ আগষ্ট ১৮৫৪।*

কিছু দিন পরে কালীপ্রসন্নের জীবিয়োগ হইলে তিনি চন্দ্রনাথ বহুর এক কস্তার সহিত পরিণীত হন।

* ৮ আগষ্ট ১৮৫৪ তারিখে ‘সংবাদ প্রভাকর’ লিখিয়াছিলেন :—“গত শনিবার বাসরীয় [৫ আগষ্ট] যামিনীযোগে আমারদিগের প্রিয় বন্ধু পরলোকগত বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের বংশধর পুত্র শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবুর উদ্বাহ কার্য্য রঙ্গপুরের সদর আসীন শ্রীযুত বাবু বেণীমাধব বহুর কস্তার সহিত হুসম্পন্ন হইয়াছে...।”

৪ আগষ্ট ১৮৫৪ তারিখে ‘সংবাদ প্রভাকর’ ভ্রমক্রমে লিখিয়াছিলেন যে, “কালীপ্রসন্ন সিংহের শুভবিবাহ... লোকনাথ বহু বাহাদুরের কস্তার সহিত নির্বাহ হইবেক।” কালীপ্রসন্নের চরিতাকারে এই ভ্রমের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা

বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠাকাল

বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভাষার অনুশীলন। অনেকে বলেন, ১৮৫৫ সনে বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ইহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৩ সন মনে করিবার সম্ভব কারণ আছে। ১৮৫৬ সনের জানুয়ারি মাসে ইহার প্রথম সাধারণিক সভা অনুষ্ঠিত হইলে পরবর্তী ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ‘সংবাদ প্রভাকর’ যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

৭ মাঘ শনিবার যামিনী ৭ ঘটীর সময়ে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাধারণিক সভা নির্বাহিত হইয়াছে, এই সভা দ্বারা দেশের যে কত হিতসাধন হইবেক তাহা বলা যায় না। এই সভার বয়স্ক্রম এক বৎসর হইল ইহার মধ্যে দেশের অনেক কুপ্রথা পরিবর্তিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, প্রথমতঃ ইতিপূর্বে এই কলিকাতা নগরে একটিও বাঙ্গালা সভা ছিল না, শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করিবারে অধুনা অনেক ভ্রমসন্তানেরা আপনাপন বাটীতে এক এক বাঙ্গালা সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন...আমরা দেশীয় সকল ব্যক্তিকে এই পরামর্শ প্রদান করি যে শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দৃষ্টান্তের অনুগামি হউন, তাহা হইলে বোধ করি অতন্নকাল মধ্যে দেশস্থ তাবতেই সভাসামোপানে পদার্পণ করিতে পারিবেক।

১৮৫৬ সনের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণিক সভার উপরি উদ্ধৃত বিবরণে “এই সভার বয়স্ক্রম এক বৎসর হইল”—কথাগুলি হইতে ধরিয়া লওয়া স্বাভাবিক যে, বিদ্যোৎসাহিনী সভা ১৮৫৫ সনে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাধারণিক সভাগুলি যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয় নাই; বর্ষকালমধ্যেই প্রথম তিনটি সাধারণিক সভার অধিবেশন হয়। ১৯ জানুয়ারি ১৮৫৬ তারিখে বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রথম সাধারণিক সভা হয় সত্য, কিন্তু তৃতীয় সাধারণিক সভার অধিবেশন যে পর বৎসরের ১৪ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, একাধিক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত “বিজ্ঞাপন” হইতে তাহা জানা যাইবে :—

২ মাঘ বুধবার রাত্রি ৮ ঘটীর সময়ে বিদ্যোৎসাহিনী সভার তৃতীয় সাধারণিক সভা হইবেক, দর্শক মহাশয়গণ সভারোহণ করত বাধিত করিবেন।—শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক। (‘সংবাদ প্রভাকর’, ১ জানুয়ারি ১৮৫৭)

বিদ্যোৎসাহিনী সভার তৃতীয় সাধারণিক সভা প্রসঙ্গে ১২ জানুয়ারি ১৮৫৭ তারিখের ‘সমাচার চন্দ্রিকা’য় একটি সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল। ইহা পাঠ করিলে সভার প্রতিষ্ঠাকাল যে ১৮৫৩ সন, তাহা বুঝিতে কোন বাধা হইবে না :—

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত

বিদ্যোৎসাহিনী সভা।

যোড়াসাঁকোর বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুরোধে প্রকাশ করিতেছি যে আগামি ২রা মাঘ বুধবার সন্ধ্যার সময় শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের বাটীতে উক্ত সভার তৃতীয় সাধারণিক সভা হইবেক, সভা এবং দর্শক মহাশয়েরা ঐ সময়ে উপস্থিত হইবেন, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে যেরূপ এক অভাব তাহাতে যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা

বিশেষতঃ যখন সভার উন্নতি এবং স্থায়িত্ব সকল সভ্যের সমবেত যত্ন এবং চেষ্টার উপর সম্যক রূপে নির্ভর করে, তখন তিন বৎসর এমত হৃদীর্ঘকাল জীবিতা রহিয়াছে ইহাই অতিশয় আশ্চর্য্য এবং কে না অগ্নান বদনে সভা সংস্থাপক শ্রীযুত কলীপ্রসন্ন বাবুকে এবং সভ্যদিগকে সাধুবাদ করিবেন ; ...

এই সকল কারণে আমি মনে করি, বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৩ সন,— ১৮৫৫ নহে। এ-সম্বন্ধে একটি প্রমাণও উদ্ধৃত করিতেছি। ১৪ জুন ১৮৫৩ (১ আষাঢ় ১২৬০) তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকর’ প্রকাশ :—

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিবরণ ।...জনন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ

বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্ত এক সভা করিয়াছেন।

এই সভাই যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রথমাবস্থায় এবং পরেও অনেক দিন কালীপ্রসন্ন ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সভার বিজ্ঞাপন হইতে আমরা আরও কয়েক জনের নাম সম্পাদকরূপে পাই ; ইহারা উমেশচন্দ্র মল্লিক, ক্ষেত্রনাথ বসু ও রাধানাথ বিদ্যারত্ন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভায় সাহিত্যালোচনা

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য ছিলেন। এই সভা সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন কালীপ্রসন্নের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়।... তাঁহার বাড়ীর দোতালার একটি Debating Club ছিল, আমি সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। সেই স্থানে কৃষ্ণদাস পালের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এখনও আমার বেশ মনে আছে, যেদিন কৃষ্ণদাস পাল commerce সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন ; ইংরাজিতে তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।...আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, কিন্তু বাঙ্গালায়। আমি ছেলে মানুষ বলিয়াই হোক বা আর কোনও কারণেই হোক, প্রবন্ধগুলির জন্ত আমি প্রশংসা পাইতাম। একদিন আমার একটি প্রবন্ধের আলোচনা হইতেছিল—কি বিষয়ে সে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এখন আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় বিধবা-বিবাহের উপর,—এমন সময় একজন সভ্য বলিয়া উঠিলেন, ‘ছেলে মানুষের প্রশংসা ক’রে ক’রে রাত কাটান যাবে নাকি ?’ কালী সিংহ সভার নাম দিয়াছিলেন ‘বিদ্যোৎসাহিনী সভা’ ; ছুট লোকে তাহার নামকরণ করিল ‘বিদ্যোৎসাহিনী সভা’। তিনি সভার patron গোছ ছিলেন।...মধ্যে মধ্যে সভ্যদিগের ভোজনাদির ব্যবস্থা হইত ; আমি কিন্তু কখনও আহ্বারাদিতে যোগদান করি নাই। (‘পুরাতন প্রসঙ্গ,’ ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪-৮৫)

বিদ্যোৎসাহিনী সভায় অনেক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি পঠিত ও আলোচিত হইত। কালীপ্রসন্নও স্বরচিত অনেক প্রবন্ধ এই সভায় পাঠ করিতেন। এক জন প্রত্যক্ষদর্শী বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্বন্ধে ‘সমাচার সন্ধ্যাবর্ণন’ পত্রে (১৬ই-১৭ই আগষ্ট ১৮৫৫) যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা হইল :—

আমরা গত শনিবারীয় যামিনী যোগে ‘বিদ্যোৎসাহিনী সভায়’ গমন করিয়াছিলাম...। নানাবিধ দুই শত ভদ্র সম্ভান এই সভায় বিদ্যমান ছিলেন, কালীপ্রসন্ন বাবু প্রসঙ্গ বৃন্দে সম্ভাদির পূর্বক তাঁহারদিগকে সম্বোধন করিয়া অকুণ্ঠ স্বরে বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়

দিগের পত্র সকল পাঠ করিলেন, কানপুর দিনাজপুর বগুড়া বালেখরাদি নানা স্থানীয় গুণগ্রাহক গ্রাহক মহাশয়েরা বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা গ্রহণার্থ পত্র লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ঐ সকল পত্র পাঠ করিয়া মূল প্রস্তাব অর্থাৎ বাণিজ্য বিষয়ে কি উপকার, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ ব্যক্ত করিলেন তৎপরে সভা সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ শর্মা মল্লিখিত বিস্তারিত রূপে ঐ সকল বিষয় ব্যক্ত করেন অনন্তর কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবু ঈশদ্বাহু প্রসন্ন বদনে বলিলেন সভা ও দর্শক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রস্তাবিত বিষয়ে যে ভাষায় যিনি বাহা বলিতে পারেন বক্তৃতা, করুন তাহাতে আমরা আনন্দিত হইয়া সভার কার্য এবং উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ বলিয়াছি অসম্ভব করি সর্বসাধারণ লোকেরা বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকাতেই তাহা দেখিতে পাইবেন।”

সাধারণতঃ শনিবার সন্ধ্যাকালে বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধিবেশন হইত। সভায় কি ধরনের প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হইত, তাহার আভাস দিবার জন্ত সেকালের সংবাদপত্র হইতে কয়েকটি “বিজ্ঞাপন” উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) আগামি শনিবারে সি, জে, মনটেগিউ [ডেভিড হেয়ার একাডেমির প্রধান শিক্ষক] সাহেবের বক্তৃতা করিবার ভার ছিল, অকস্মাৎ তাঁহার কোন বাবা ঘটাবায় তিনি আগামি শনিবারে আসিতে অক্ষম, আগামি শনিবারের পর শনিবারে তিনি “Labour its importance dignity piety and triumphant results” এই বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, “সমুদায়িকতার সহস্র কি?” এই বিষয়ক প্রস্তাব শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথব বহুর দ্বারা এই শনিবারে পঠিত হইবেক।—শ্রীশ্রীধর শর্মা। (‘সংবাদ প্রভাকর’ ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬)।

(২) অত্র শনিবার সন্ধ্যার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রকান্ত সভা হইবেক, দর্শক ও সভাগণ সভাস্থ হইয়া বাধিত করিবেন। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সম্পাদকীয় আসনে এইবার শেষ উপবেশন করিয়া বঙ্গদেশের কুরীতি বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।—শ্রীউমাচরণ নন্দী। কক্ষাধ্যক্ষ। (‘সংবাদ প্রভাকর’, ১৫ মার্চ ১৮৫৬)

(৩) আগামী শনিবার সন্ধ্যার পরে যুগলসেতুস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় শ্রীযুক্ত কার্কেপেট্র ক সাহেব “Sentiments proper to the age and Country” অর্থাৎ দেশকাল বিষয়োগোণী অভিপ্রায় বিষয়ে লেকচার অর্থাৎ উপদেশ করিবেন, অতএব উক্ত বিষয়ে সভা ও বিদ্যোৎসাহি দর্শক মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। সম্পাদক। (‘সংবাদ প্রভাকর’, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬, বুধবার)

স্বলিখিত প্রবন্ধের জন্ত বিদ্যোৎসাহিনী সভা মাঝে মাঝে পুরস্কার প্রদান করিতেন। এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্র হইতে দুইটি “বিজ্ঞাপন” উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) “জগতে স্থিতি কে?” এই বিষয়ক প্রবন্ধ যে ব্যক্তি লিখিতে ইচ্ছা করেন উত্তম হইলে বিচার মতে ২২ আষাঢ়ের মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা তাঁহাকে ২০০ দুই শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন, ৮ পেজি ফরমার, ১ ফরমার নূন হইলে গ্রহণযোগ্য নহে।—কালীপ্রসন্ন সিংহ। সহকারী কক্ষাধ্যক্ষ। (‘সংবাদ প্রভাকর’, ৪ জুন ১৮৫৬)

(২) “হিন্দুধর্মের উৎকৃষ্টতা” বিষয়ক প্রবন্ধ নানী প্রকার প্রমাণাদি সহিত লিখিতে হইবে, যিনি লেখকগণের মধ্যে বিচারে উত্তম হইবেন তাঁহাকে বিদ্যোৎসাহিনী সভা তিন শত মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন ২ মাস সাপ্তাহিক সভায় প্রেরণ করিতে হইবেক।—শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক। (‘সংবাদ প্রভাকর’, ৪ নবেম্বর ১৮৫৬)

• বিদ্যোৎসাহিনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক-পত্রিকা

কালীপ্রসন্ন যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই বিদ্যোৎসাহিনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত হয়; এগুলির বিস্তৃত পরিচয় “কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনা”-বিভাগে দেওয়া হইয়াছে।

কালীপ্রসন্নের রচনা ছাড়া, অন্ততঃ আরও দুইখানি পুস্তক বিদ্যোৎসাহিনী সভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় :—

বিজ্ঞাপন।—নিম্নলিখিত পুস্তক বিক্রয়ার্থ তত্ত্ববোধিনী সভায় প্রস্তুত আছে।

মহুঘোর মহাধ্ব কি	...	মূল্য ৮/০
বালকরঞ্জন দুইখণ্ডে বিভক্ত	...	" ১/০

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

প্রথমখানির লেখক প্রিয়মাধব বসু, দ্বিতীয়খানির লেখক হালিশহর খাসবাটী নিবাসী উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়; ‘বালকরঞ্জন’ ১৮৫৫ সনের শেষার্শেই প্রকাশিত হয়।

‘বিধবোদ্ধাহ নাটক’ নামে উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের আরও একখানি পুস্তক বিদ্যোৎসাহিনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত হইবে বলিয়া ১৬ আগষ্ট ও ২০ নবেম্বর ১৮৫৫ তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ-পর্যন্ত “সভার অধ্যক্ষগণ মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ে অক্ষম হইবার” গ্রন্থকার নিজব্যয়ে মুদ্রাঙ্কন করাইতেছেন বলিয়া ৮ জুলাই ১৮৫৬ তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ বিজ্ঞাপিত করেন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র-স্বরূপ ‘বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা’ নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও কালীপ্রসন্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা “সাময়িক পত্রাদি পরিচালন”-বিভাগে পাওয়া যাইবে।

বিদ্যোৎসাহিনী সভায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও পাদরি লঙের সম্বন্ধনা

বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইবার সৌভাগ্য বোধ হয় মাইকেলের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে। বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন ও তাহার সাফল্য দেখিয়া গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিরব্রকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্ত ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখে একটি সভার আয়োজন করেন। এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্ত মাইকেলের গুণানুরক্ত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই আমন্ত্রণ-লিপি উদ্ধৃত করিতেছি :—

My dear Sir,

Intending to present Mr. Michael M. S. Dutt with a silver trifle as a mite of encouragement for having introduced with success the Blank verse

into our language, I have been advised to call a meeting of those who might take a lively interest in the matter at my house on the occasion of the presentation, in order to impart as much of solemnity as it is capable of receiving, while retaining its private character and therefore to serve perhaps its purpose better; I shall therefore be obliged, and I have no doubt all will be pleased, by your kind presence at mine on Tuesday next, the 12th Instant at 7 P. M.

Yours truly

Kaly Prussunnó Singh

Calcutta the 9th February 1861.

সম্বন্ধনা-সভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাশ্রীচাঁদ মিত্র, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সমাগম হইয়াছিল। বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিরবকে একখানি মানপত্র ও একটি মূল্যবান স্মৃতি রজত পানপাত্র উপহার দিয়াছিলেন। মানপত্রখানি এইরূপ :—

এজ্জেস।—

মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় সমীপেবু।

কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং।

যে প্রকারে ইউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকর্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে যে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোচর নাই। আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুরাগ অশ্রুতপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অনুরাগ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনাই হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্ত আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রোপাময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদদেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনাই আপনি ধন্য ও কৃতার্থমন্ত হইলাম হয়ত সেদিন তাহারা আপনার আদর্শজনিত দ্রুতশৈল শোকনাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময় বর্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার সহবাস হৃদয়ে পরিভূক্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্নবান হউন। আপনাকে কর্তৃত্ব যেন ভাবি বঙ্গসম্ভানগণ নিজ দ্বাখিনী

জনীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজি ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালান্তিপাত করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার অর্পণ উৎসবে যে এ সকল মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাঁহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাণ্ড গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন।

কলিকাতা

বিশ্বোৎসাহিনী সভা

বিশ্বোৎসাহিনী সভা সভ্যবর্ণাণাম্।*

২ ফাল্গুন ১৭৮২ শকাব্দ।

এই মানপত্রের উত্তরে মাইকেল বাংলায় একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার অনুলিপি নিম্নে দেওয়া হইল :—

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে, এদেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়। তবে গুণামুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্ম ও সজ্জনতা।

বিজ্ঞাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের স্থায়। ভগবতী বহুমতী সেই জল প্রাপ্তে যাদৃশ উর্বরতর হন, উৎসাহ প্রদানে বিজ্ঞাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিশ্বোৎসাহিনী সভা দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য।

আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। হুতরাং আপনার এ-প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সমাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি ইতি। (‘সোমপ্রকাশ’, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১)

রাজনারায়ণ বসুকে এই সম্বন্ধে মাইকেল একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

You will be pleased to hear that not very long ago the বিশ্বোৎসাহিনী সভা—and the President Kali Prasanna Singh of Jorasanko, presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers. Fancy! I was expected to speechify in Bengali!

কালীপ্রসন্ন মাইকেলের প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন। কবির সম্বন্ধনা করিয়াই তিনি নিজ কর্তব্য শেষ করেন নাই,—‘হতোম প্যাচার নকশা’য় অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ বিশ্লেষণ করিয়া দেশবাসীকে মাইকেলের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

* ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখের ‘সোমপ্রকাশ’ হইতে উদ্ধৃত।

বান্ধালী সাহিত্যে এবশ্প্রকার কাব্য উদ্ভিত হইবে বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।

‘—শুনিয়াছে বীণা ধ্বনি দাসী,
পিকবর রব নব পল্লব আকারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাথা কথা কভু এ ভগতে !’

হায় ! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। সংসারের নিয়মই এই প্রিয় বস্তুর নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদুপরাঞ্জির পরিচয় প্রদান করে ; তখন আমরা মনে মনে কত অসীম বস্তুণাই ভোগ করি। অন্ততাপ আমাদের শরীর জর্জরিত করে, তখন তাহারে স্মরণীয় করিতে যত চেষ্টা করি, জীবিতাবস্থায় তাহা মনেও আইসে না।

মাইকেল মধুসূদন দত্তজ জীবিত থাকিয়া যত দিন যত কাব্য রচনা করিবেন, তাহাই বাঙ্গলা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্রেশ স্বীকার করিয়া জলধিজল হইতে রত্ন উদ্ধারপূর্বক বহুমান অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্রেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্ন লাভে কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি এবং অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই ; কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণে লজ্জিত হইব।—‘বিসিদ্ধার্থ-সঙ্গু হ,’ আবার, ১৭৮৩ শক, পৃ. ৫৫-৫৬।

মাইকেলের সম্বন্ধনার পর-বৎসর কালীপ্রসন্ন পাদরি লঙকে সম্বন্ধিত করিয়াছিলেন। এদেশবাসীর অকৃত্রিম স্নেহদরূপে পাদরি লঙকে তিনি বিশেষ সম্মান করিতেন। দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ ইংরেজীতে প্রচার করার অভিযোগে নীলকরেরা লঙের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিলে কালীপ্রসন্ন স্বয়ং সূপ্রীমকোর্টে গিয়া মকদ্দমার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন। এই মকদ্দমায় বিচারপতি স্মার মর্ডাণ্ট ওয়েলস্ যখন লঙের এক মাস কারাবাস ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ করেন (২৪ জুলাই ১৮৬১), তখন কালীপ্রসন্নই অগ্রসর হইয়া অযাচিত ভাবে লঙের অর্থদণ্ড—সহস্র মুদ্রা আদালতে গণিয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে কালীপ্রসন্ন গুনিলেন—লং স্বদেশ যাত্রা করিতেছেন। তিনি বিদ্রোহ-সাহিনী সভার পক্ষ হইতে বিদায়ের প্রাকালে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে বিশ্বৃত হন নাই। এই উপলক্ষে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ ৩ মার্চ ১৮৬২ তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

Saturday, 1st March...

The Biddotshahince Shabha headed by Baboo Kaliprossunno Sing presented an excellent valedictory Address to the Rev. James Long on the day of his departure. The address does honor to those from whom it emanated.

সমাজসংস্কার-কার্যে বিদ্রোহ-সাহিনী সভা

কালীপ্রসন্নের বিদ্রোহ-সাহিনী সভা কেবলমাত্র সাহিত্যালোচনার বৈঠক ছিল না ; কল্যাণকর বা সমাজ-সংস্কারক অনুর্তানাদির সহিতও সভার যোগ ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র

বিভাগসাগর যখন বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে সাহায্য করিতে আগ্রহের হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন বিভাগসাগরকে ভক্তি করিতেন; বিভাগসাগরও তাঁহাকে পুত্রের স্থায় স্নেহ করিতেন। ১৮৫৬ সনের গোড়ায় যখন বিধবা-বিবাহ-আইন জারি করিবার আয়োজন চলিতেছিল এবং এই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে আবেদনপত্র পেশ হইতেছিল, তখন বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিয়া বহু গণ্যমান্ত লোকের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে-ছিলেন। এই সম্পর্কে ১২ মে ১৮৫৬ তারিখে ‘সংবাদ প্রভাকর’ লেখেন :—

বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবাবিবাহ পক্ষে লেজিসলেটিব কোর্সেলে যে দরখাস্ত দিতে ইচ্ছা করিতেছেন তাহাতে তিন সহস্র ভদ্র লোকের স্বাক্ষর হইয়াছে, যত্নদি কেহ স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছা করেন বিদ্যোৎসাহিনী সভায় আগমন করিলেই স্বাক্ষর পুস্তক পাইবেন।

১৮৫৬ সনের জুলাই মাসে বিধবা-বিবাহ-আইন জারি হইলে, কালীপ্রসন্ন সংবাদপত্রে ঘোষণা করেন যে, যিনি বিধবা-বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহাকে বিদ্যোৎসাহিনী সভা হইতে এক সহস্র মুদ্রা দেওয়া হইবে। ২২ নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ প্রকাশ :—

বিজ্ঞাপন।—বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবা বিবাহেচ্ছুক ব্যক্তিগণকে জ্ঞাত করিতেছেন যে ১৭৭৭ শকীয় ঊনবিংশ সভায় সভার অধ্যক্ষ মহোদয়গণ প্রতি বিবাহে এক২ সহস্র মুদ্রা প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন, অতএব প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ সম্বন্ধ নির্বন্ধ পত্রে স্বাক্ষরিত হইলেই বিবাহের পূর্বে বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্বন্ধিত অর্থ প্রদান করিবেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

এই সময় আরও একটি ব্যাপারে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন আন্দোলন করিয়াছিলেন। উহা কলিকাতা নগরপ্রান্তে বেঙ্গাদিগের বাসস্থল নির্দেশকরণ সম্বন্ধে। এই প্রসঙ্গে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে যে আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইবার প্রস্তাব হয় তাহা ১৯ নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ প্রকাশিত হইয়াছিল। আবেদনপত্রখানি এইরূপ :—

প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপে।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা, কলিকাতা নগরপ্রান্তে বেঙ্গাদিগের বাসস্থল নির্দিষ্ট জন্ত লেজিসলেটিব কোর্সেলে আবেদন করিবেন; আবেদনপত্র আপনায় নিকট প্রেরণ করিতেছি পাঠকবর্গের বিদিতার্থ প্রভাকরে প্রকাশ করিবেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

নগরপ্রান্তে বেঙ্গাগণ বসতিকরণ কার্য বঙ্গদেশবাসিগণের ভারতবর্ষীয় লেজিসলেটিব কোর্সেলে আবেদন।

মহামহিম ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়গণ সমীপে।

নিম্ন স্বাক্ষরিত বঙ্গদেশবাসীদিগের সবিনয় নিবেদন এই যে, বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত করায় বঙ্গদেশবাসিগণের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত, কারণ দেশের শান্তিরক্ষা ও কুরীতি

নিরাকরণ করাই ছত্রধরদিগের উচিত কার্য ও তাহাদিগের পরম ধর্ম। এক্ষণে পুলিশ কর্তৃক যেরূপ শাস্তিরক্ষা হইতেছে বর্ণন বাহুল্য; অতি হুচারণরূপেই হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই, নগরীয় বাবতীয় শাস্তিরক্ষার মধ্যে বেথুনকুল দ্বারা তাহার অনেক অংশের ক্রটি হয়, কারণ বারঘোষাকুল সমস্ত রাত্রি মদ্যপান দ্বারা গীতবাদ্যাদির কোলাহলে এত উৎপাত আরম্ভ করে যে ভদ্রলোক মাত্রেই উক্ত পল্লীতে শয়নাগার তাগকরণে বাধা হন, চৌধা কার্যাদ্বারা যে সমস্ত স্রবাদি সংগৃহীত হয় তাহা কেবল ঐ বারললনাগণের ব্যবহার কারণ। রাত্তিকালে মদ্য বিক্রয় যাহা ভয়ানক শাস্তিভঙ্গ তাহা কেবল বারঘোষাগণের নিমিত্তে হয়, কলহ, মদ্যপান দ্বারা জীবন সংহার, ব্যসন দ্যুতক্রীড়া ইত্যাদি ভয়ানক অত্যাচার করণ এই বারললগণের আলয়েই সম্পাদিত হয়, আরো বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের ইহা স্বভাব সংশোধন বলিলেও বলা যাউতে পারে, কারণ তাহারা কি প্রাতঃকালে কি সায়ংকালে সাবকাশ হইলেই এই কদাচার কর্ণে প্রবৃত্ত হয়, বেথুন সংখ্যার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে তাহার তাৎপর্য্য কি কেবল তাহাদিগের প্রতি কোন উক্ত নিয়ম অদ্যাবধি প্রচলিত হয় নাই বলিয়াই তাহারা খেচ্ছাচারিণী হইয়া যথেষ্ট তাহাই করিতেছে, কেবল যে বেথুনদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার এত উৎপাত হইতেছে তাহাও নহে, বঙ্গদেশীয় ধনবানগণ স্বীয় স্বীয় বসতবাটীতেও অধিক ভট্টালোভী হইয়া ভদ্রপল্লীমধ্যে বেথুনগণকে স্থান দান করিয়া অতুল স্বর্থ প্রাপ্ত হইতেছেন যদ্বারা এক ঘর বেথুনবৃদ্ধি হইবার সেই ভদ্রপল্লী একেবারে অভদ্র নিয়মে পরিপূর্ণ হইতেছে অতি নির্মূল নিষ্কলঙ্ক ধনবান মাত্ৰ বংশের প্রাসাদের নিকটেই বেথুনানিকেতন কেবলই ভয়ানক ব্যবহার প্রদর্শিত হইতেছে। অতএব হে সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা মনোযোগী হইয়া বেথুনগণকে নগরের প্রান্তে একত্রে নিবসতির আজ্ঞা করুন নতুবা কোন প্রকারেই ভদ্র ধনবানগণ এই বিশাল ধনপূর্ণ ভদ্র নগর বাসের উত্তম স্থল বোধ করিতে পারেন না। যদ্যপি রাজা হইয়া প্রজাদিগের শুভ চীৎকারের সময়ে কালার স্থায় ব্যবহার করেন তাহা হইলেই সেই রাজার রাজত্বের কীর্ত্তি কোন কালেই পতাকা রূপে উড্ডীন হইতে পারে না।

অতি পূর্বে দোণাগাজি নামক স্থান বেথুনদিগের বাসস্থল ছিল অদ্যাপিও তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় পূর্বে সময়ে যেরূপ শাস্তিরক্ষার নিয়ম ছিল মধ্যে তাহার উল্লেখ না হইবার একেবারে তাহা মিলিত হইয়া গিয়াছে, অযোধ্যা, কাশী, দিল্লী ইত্যাদি নগরে এবং ইউরোপীয় নানা নগরে এই প্রকার রীতি প্রচলিত আছে তজ্জন্ত আমরা বিনীতভাবে এই নিবেদন করি যে দেশীয় স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও শাস্তিকার্য্য উত্তমরূপে নির্বাহ জন্ত সভ্যমহোদয়েরা মনোযোগী হইয়া বেথুনদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র পল্লী নির্দিষ্ট করুন যদ্বারা আমাদের ঈঙ্গিত বিষয় হ্রাসিত হইবে সন্দেহ নাই।

মহোদয়গণ

আমরা আপনাদিগের নিতান্ত অনুগত ভূতা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

১৮৫৭ সনে বিদ্যোৎসাহিনী সভা জনসাধারণের সুবিধার জন্ত একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপনের আয়োজন করিতেছিলেন—সংবাদপত্রে এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ১২ মার্চ ১৮৫৭ তারিখের ‘সমাচার চন্দ্রিকা’য় প্রকাশঃ—

পুস্তকালয় সংস্থাপন।—আমরা গুনিলাম বোড়াসাঁকো বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্যেরা এক সাধারণ বা শাখা প্রকাশ্য পুস্তকালয় সংস্থাপন করিবেন, প্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাহাতে উচিত মত সাহায্য করিবেন, এবং আরো অবগতি হইল ঐ সভার সভ্যেরা বর্ধমানাবধিপতি বাহাদুরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবেন ॥

• বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা নাট্যশালার নবজীবন লাভ হয়। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক পুরাতন হইলেও এ পর্য্যন্ত উহা একটা স্থায়ী কীর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। এই বিফলতার একটি প্রধান কারণ বাংলা ভাষায় নাটকের অভাব। এক লেবেডেফ ১৭৯৫-৯৬ সনে ও নর্দীন বক্স ১৮৩৫ সনে তাঁহাদের নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয় করান; অথ সকলেই শেক্সপীয়রের নাটক অথবা কোন সংস্কৃত নাটকের ইংরেজী অনুবাদ অভিনয় করাইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৫৭ সনে কলিকাতায় একসঙ্গে তিনটি থিয়েটারে বাংলা নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল; তন্মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ কালীপ্রসন্নের উদ্যোগেই ১৮৫৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সহিত সংযুক্ত ছিল।* এই রঙ্গমঞ্চ পর-বৎসরের ১১ই এপ্রিল † শনিবার উন্মোচিত হয় ও উহাতে প্রথম অভিনীত হয় ভট্টনারায়ণ-কৃত ‘বেণীসংহার’ নাটকের রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক একটি বাংলা অনুবাদ। এই অভিনয় সম্বন্ধে ‘সংবাদ প্রভাকর’ নিম্নোক্ত বিবরণটি প্রকাশিত হয় :—

যুগলসেতু নিবাসি সিংহবাবুদিগের ভবনে গত শনিবার [১১ এপ্রিল] সন্ধ্যার পর মহাসমারোহে নাট্যক্রীড়া হইয়াছিল, সুপ্রসিদ্ধ কোর্টের বিচারপতি স্তার আরথর বুলার সাহেব, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্টের প্রধান সেক্রেটারী মেং সিসিল বিডন সাহেব প্রভৃতি ৫৭ জন প্রধান ইংরাজ এবং নগরীয় অনেক আচা মহাশয়েরা ঐ নাট্য ক্রীড়া দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই নাট্য কোঁতুক দর্শনে সমুদ্র হইয়াছেন, এবং বাবুরা সাহেবদিগকে পান ভোজনে পরিতোষ করিয়াছেন।—
‘সংবাদ-প্রভাকর,’ ১৫ এপ্রিল ১৮৫৭, বুধবার।

‘বেণীসংহার’ নাটকে কালীপ্রসন্ন নিজেও অভিনয় করিয়াছিলেন এবং তাহার অভিনয় খুব প্রশংসার হইয়াছিল। প্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া তিনি স্বয়ং নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ১৮৫৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কালিদাসের ‘বিক্রমোর্কশী’র অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহার ‘বিক্রাপন’ পাঠে আমরা বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমির কথা ও নাটক-রচনার উদ্দেশ্য জানিতে পারি :—

বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ বহুকালাবধি বঙ্গবাসিগণ দর্শন করেন নাই, কারণ অতি পূর্বকালে মহাকবি কালিদাসদিগের দ্বারা যে সমস্ত সংস্কৃত নাটক রচিত হয়, তাহারই অনুরূপ হইত, পরে প্রায়

* “The Bidyotsahinee Theatre is in the second year of its existence.”
Hindoo Patriot, 3 Decr. 1857.

† আমরা ‘বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে’ (পৃ. ৪৪) এই অভিনয়ের তারিখ “৯ই এপ্রিল” দেওয়া আছে। ইহা ভুল, এবং এই ভুলের জন্য প্রধানতঃ দায়ী ১৬ এপ্রিল ১৮৫৭ তারিখের ‘হিন্দু পেট্রিয়টে’ প্রকাশিত এক জন দর্শকের পত্র; তাহাতে অভিনয়ের তারিখ “৯ই এপ্রিল, শনিবার” মুদ্রিত হইয়াছে। ক্রীযুত সম্মাননাথ ঘোষও তাহার লিখিত কালীপ্রসন্ন সিংহের ইংরেজী জীবন-চরিতে (পৃ. ২৮) এই ভুল তারিখের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

দুই তিন শত বৎসর অতীত হইল সংস্কৃত ভাষায় নাটক ও অনুরূপাদি এককালেই রহিত হইয়াছে, সেই অবধি আর কোন ধনবান ভবনে নাটকাদির অভিনয় হয় নাই। পরে সেক্সপিয়র ও অন্যান্য ইংরাজি নাটকাদি বঙ্গদেশে অভিনয় হইলে হিন্দুগণের সংস্কৃত ও বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ করিতে ইচ্ছা হয়। উইলসন্ সাহেব লেখেন প্রায় অশীতিবর্ষ অতীত হইল কৃষ্ণনগরাধিপতি ৮ প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় বাহাদুরের ভবনে চিত্রবজ্র নামক এক সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ হয়, কিন্তু রঙ্গভূমির নিয়মাদির অনুবর্ত্তী হইয়া অভিনয় করেন নাই, ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইবার কারণ অনেকের মনোরঞ্জন হয় নাই।

এক্ষণে এই বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে বঙ্গবাসী গণ পুনরায় বাঙ্গলা নাটকের অনুরূপ দর্শনে পারগ হইলেন। প্রথমতঃ বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে ভট্টনারায়ণ শ্রীকান্ত বেণীসংহার নাটকের শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কৃত বাঙ্গলা অনুবাদের অভিনয় হয়, যে মহাশয়ারা উক্ত অভিনয় সময়ে রঙ্গভূমিতে উপনীত ছিলেন, তাহারাই তাহার উত্তমতার বিষয়ে বিবেচনা করিবেন, ফলে মান্তবর নটগণ যথাবিহিত নিয়ম ক্রমে অনুরূপ করায় দর্শক মহাশয়দিগের শ্রীতিভাজন ও শত শত ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন।

পরে উপস্থিত দর্শক মহোদয়গণের নিতান্ত আগ্রহাতিশয়ে এবং তাহাদিগের অনুরোধ বশতঃ পুনরায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে অনুরূপ কারণই বিক্রমোর্কশী অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল, এক্ষণে বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের পাঠযোগ্য এবং নাগরীয় অন্যান্য রঙ্গভূমির অনুরূপ যোগ্য হইলে আমরা শ্রম সফল হইবে।

২৪ নবেম্বর ১৮৫৭ তারিখে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গক্ষেত্রে বিক্রমোর্কশী নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হয়। এই অভিনয় প্রসঙ্গে ‘সংবাদ প্রভাকর’ লিখিয়াছিলেন :—

যোড়াসাঁকো নিবাসি ধনরাশি বিদ্যোৎসাহি শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটীর বৈঠকখানাস্থিত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে গত দিবস রজনী ৮ ঘটিকা হইতে একাদশ ঘটিকা পর্যন্ত নাট্যক্রীড়াঙ্কলে ‘বিক্রমোর্কশী’ নাটকের অনুরূপ প্রদর্শিত হয়, তদর্শনার্থ কয়েক জন স্রস্রাস্ত্র প্রধান ইংরাজ এবং বহু সংখ্যক এতদ্দেশীয় মান্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল, নেপথ্য এবং নাট্যাশালার স্রস্রজ্জায় এবং নট নটী প্রভৃতি সমুদয় ফেলিকিল অর্থাৎ ক্রীড়ক কদম্বের ক্রীড়ায় তাবতেই সমুদ্র হইয়াছেন।

এতদ্দেশীয় নাট্যক্রীড়ার প্রাচীন প্রথা, বাহা বহুকাল পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া সাধারণের গোচরপথের আগোচর রহিয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধাপনে যাহারা যত্নশীল হইতেছেন, আমরা সাধুবাদ সহযোগে অগণ্য ধন্যধনি-সম্বলিত তাহারদিগকে নমস্কার করিতেছি,.....।—‘সংবাদ প্রভাকর’, ২৫ নবেম্বর ১৮৫৭, বুধবার।

৩রা ডিসেম্বর তারিখের ‘হিন্দু পেট্রিয়টে’ এই অভিনয়ের এক সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহা পাঠে জানা যায়, কালীপ্রসন্ন স্বয়ং পুরুষবার ভূমিকা কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন।

১৮৫৮ সনে কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘সাবিত্রী সত্যবান নাটক’ প্রকাশিত হয়। এখানি তাহার নিজস্ব রচনা—কোন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ নহৈ। এই বৎসরের ৫ই জুন তারিখে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গক্ষেত্রে নাটকখানির মহলা দেওয়া হইয়াছিল, ‘সংবাদ প্রভাকর’ের নিম্নোক্ত অংশ হইতে একথা জানা যাইবে :—

আগামি শনিবার ৭ ঘটনার সময় কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গভূমিতে শ্রীযুত বাবু

কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত সাবিত্রী সত্যাবান নাটকের আভিনায়িক পাঠ হইবেক একুপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে ইংরাজী সেক্সপিয়র প্রভৃতি নাটক যেরূপ পঠিত হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপে পঠিত হইবেক অধিকন্তু ইহাতে বিস্তর গীত সংযোজিত হইবার তাহা যন্ত্রের সহিত মিলাইয়া গান করা যাইবেক।—‘সংবাদ প্রভাকর,’ ৪ জুন ১৮৫৮, শুক্রবার।

শুধু নাট্যকলা নহে, সঙ্গীতের উন্নতিকল্পেও কালীপ্রসন্নের বিশেষ চেষ্টা ছিল। হিতৈশ্বনাথ ঠাকুর “কালীপ্রসন্ন সিংহ” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

একজন বিশিষ্ট গায়কের মুখে শুনিয়াছি যে বিখ্যাত মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় স্বাভাবিক অলাবুর তুন্দের অনুকরণে কাগজের তুন্ড প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকাস্থ বৈঠকখানার মজলিসে আনা হইয়াছিল, তৎসাহায্যে গাওনাও হইয়াছিল। কাগজের তুন্ড অনেকটা শুদ্ধ অলাবুর তুন্দের কাছাকাছি যায়; কিন্তু কাষ্ঠের করিলে সেক্ষেপ হয় না।
কালীপ্রসন্ন মহাশয়ের তাম্বুক নামক কলাবতী বীণার একুপ কাগজের তুন্ডী নির্মাণের চেষ্টার জন্ত সমস্ত সঙ্গীত সমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। (‘পুণা’—পোর্ণ, মাস ১৩০৫, পৃ. ১৯০)

সাম স্বক পত্রাদি পল্লিচালন

‘বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা’

বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র ‘বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা’ মাসে মাসে প্রকাশিত হইত, প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক আনা কিন্তু সভার সভ্যেরা বিনামূল্যে এক খণ্ড করিয়া পাইতেন। ইহাতে কালীপ্রসন্নের রচনাবলী—বিশেষতঃ যে-সকল প্রবন্ধ তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে পাঠ করিতেন—প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যা সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে।* পত্রিকার মলাটের উপর মুদ্রিত আছে :—

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা।। মাসিক প্রকাশ।। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ দ্বারা বিরচিত।।
বঙ্গাল হুপিয়ারিয়ার যন্ত্রে মুদ্রিত।।

‘বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা’র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২০ এপ্রিল ১৮৫৫ তারিখে। এই সংখ্যায় “বিজ্ঞাপনে” কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছেন :—

যদিও আমার তাদৃশ বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি হয় নাই, তথাপি বিদ্যাবস্ত ব্যক্তিব্যাহের উৎসাহে এই কর্ণে প্রবৃত্ত হইলাম।

‘বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা’র প্রতি সংখ্যায় ১০ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখা থাকিত। প্রথম দুই সংখ্যায়—সভ্যতার বিষয়, চাঞ্চল্য; বাল্য-বিবাহ, কোলীজ, ও বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা, এই কয়টি প্রবন্ধ আছে। কালীপ্রসন্নের বাল্য-রচনার নিদর্শন-স্বরূপ শৈশবোক্ত প্রবন্ধটি হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

...মূলমান রাজারা রাজনীতি অনভিজ্ঞ ছিলেন, প্রজাদিগকে কিরূপ পালন করিতে হয় তাহা না জানাতে পালন স্থলে পীড়ন করিতেন, এবং এই দোষেই তাঁহাদিগের রাজ্য নষ্ট হয়।

* এই দুই সংখ্যার বিস্তৃত পরিচয় ১৩৪৩ মালের তৃতীয় সংখ্যা ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’য় (পৃ. ১২৬-৩৪৯) প্রকাশ করিয়াছি।

হিন্দু প্রজারা আর সহ করিতে না পারিয়া আপনাদিগের পরিত্রাণ নিমিত্ত ইংরাজদিগকে আহ্বান করিয়া বাঙ্গালারাজা অধিকার করিবার সত্ৰুপায় করিয়া দিলেন কিন্তু ব্রিটিশ্ গবর্ণমেন্ট ও বিজাতীয় পক্ষপাতশূন্য নহেন। মুসলমানদিগের অধীনে পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে পাওয়া যাইত না বলিয়া কেহ পরিশ্রম করিত না। কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা হয় তাহাও ভাল ছিল। এক্ষণে অবধে বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে সকলের মন উজ্জ্বল হইতেছে কিন্তু কি মনস্তাপ! যে ইংরাজদিগের সমকৃতবিদ্য হইলেও তাহারদিগের আয় উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক জন ইংরাজ যে কর্ম করে যদি সেই কর্ম এক জন বাঙ্গালি নির্বাহ করেন তাহা হইলেও তাহার বেতন সেই ইংরাজের আয় হইবে না, সমান বেতন পাওয়া দূরে থাকুক অপেক্ষাকৃত পারগ হইলেও সে পদ তাহার পাইবার বিষয় কি, ইহাকে কি বিজাতীয় পক্ষপাত বল না। এক্ষণে একবার আকবর বাদশাকে স্মরণ করি, তাহার সময়ে যোগ্যবাস্তি হইলেই রাজার গুরুতর কর্মের ভার গ্রহণ করিতে পারিত হিন্দু কি মুসলমান তাহার বিচার ছিল না। তাহার নিকট বিদ্যাই পূজা হইত, যেমন একচন্দ্র গগনমণ্ডলে উদয় হইয়া পৃথিবীর সকল অন্ধকার হরে, সেইরূপ তিনি উদয় হইয়া পূর্বমত মুসলমানদিগের, রাজধর্ম অনভিজ্ঞতা রূপ যে অন্ধকার ছিল, তাহা হরিয়াছিলেন দেখ ব্যবস্থাপক কোঁনসলে এক্ষণে প্রজাদিগের কোন হাত না থাকিতে কত অমঙ্গলের সম্ভাবনা কোন আইন প্রচার কালে প্রজাদিগের মত গ্রহণ হয় না ইহাতে তাহারা কোন নিয়ম অকল্যাণকর জ্ঞান করিলেও স্তব্ব থাকে পরন্তু মুসলমানদিগের প্রতি কোন দোষারোপ করা যাইতে পারে না তাহারা যে কালে রাজা ছিল সে কালে অসভ্যতাই সবল ছিল কিন্তু এইক্ষণে অসভ্যতা দূর হইয়া সভ্যতার সোপান বর্ধিত হইতেছে। আমাদের ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সভা বলিয়া লোকবিখ্যাত আছে অতএব বিজাতীয় পক্ষপাত থাকিতে ঐ বিষয়ে গবর্ণমেন্ট সভা বলিয়া পরিচয় দিতে অবশ্যই লজ্জা পাইবেন।

‘বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা’ সম্ভবতঃ এক বৎসরের অধিক কাল প্রকাশিত হয় নাই।

‘সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা’

‘বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা’র পর ১৮৫৬ সনের জুলাই (?) মাসে কালীপ্রসন্ন ‘সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা’ নামে আর একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ‘সংবাদ প্রভাকরে’ পরবর্তী ৬ই আগষ্ট তারিখে লেখেন :—

‘সর্ব তত্ত্ব প্রকাশিকা’ অর্থাৎ প্রাণি বিদ্যা, ভূতত্ত্ব বিদ্যা, ভূগোল বিদ্যা ও শিল্প সাহিত্যাদি দ্ব্যতক মাসিক পত্রিকা। ইতাভিধেয় এক খানি নূতন পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়া তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পুরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, পত্রিকা প্রকাশক বা প্রকাশকগণ যে যে বিষয় লিখিয়াছেন তাহার প্রায় সমুদয়শেকেই উত্তম বলিতে হইবেক, যেহেতু তাহাতে সুসাদু সরল বঙ্গ ভাষায় অতি পরিষ্কাররূপে অভিপ্রায় সকল ব্যক্ত হওয়াতে ঐ পত্রিকা সর্ব সাধারণের পাঠ্যোপযোগী হইয়াছে, বিশেষতঃ ‘কৃতকর্মদমন’ নামক প্রথম প্রস্তাব সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, আমাদেরদিগের পত্রের পরিমাণ দীর্ঘ নহে একারণ আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, তাহা সাধুরঞ্জন পত্রে প্রকটিত হইবেক, অধুনা আমরা জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে এই সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা পত্রিকা অবনীমণ্ডলে চিরস্থায়িনী হইয়া সকল লোক সকল প্রকার তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করিয়া তাহার অনির্বচনীয় কল্পণা সর্বত্র প্রকাশ করুক।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা-সম্পাদক কালীপ্রসন্নই যে ‘সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা’ প্রকাশ করেন ‘বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা’র নিম্নোক্ত অংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

- সমাচার।...বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক সর্ব তত্ত্ব প্রকাশিকা নামক এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। (১ম খণ্ড, ৮ সংখ্যা, ১২৬০)

‘বিবিধার্থ-সঙ্গুহ’

‘সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা’ পত্রিকার পর কালীপ্রসন্নকে আমরা আর একখানি মাসিকপত্র সম্পাদন করিতে দেখি। ইহা ‘বিবিধার্থ-সঙ্গুহ’। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই পত্রিকার প্রথম ৬ পর্ক সম্পাদন করিয়াছিলেন। ৭ম পর্ক সম্পাদন করেন কালীপ্রসন্ন।

‘বিবিধার্থ-সঙ্গুহের’ সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়া কালীপ্রসন্ন ৭ম পর্কের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৭৮৩ শক) ভূমিকা-স্বরূপ যাহা লেখেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

১৭৭৬ [১৭৭০ ?] শকে বঙ্গভাষানুবাদক-সমাজের আনুকূল্যে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কতৃক বিবিধার্থ-সঙ্গুহ প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং তদবধি ক্রমাগত ছয় বৎসর যথানিয়মে উদ্ভিত হইয়া আসিতেছে। কেবল মধ্যে কিয়ৎকাল বঙ্গভাষানুবাদক-সমাজের অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হওয়ায় তাহার অন্তথা হইয়াছিল।...বিবিধার্থ কি বিদ্যাবতী রমণীকুল কি তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতসমাজ, সর্বত্রই তুলা সম্মানে পরিগৃহীত হইয়াছে; এমন কি বর্ণ-পরিচয়বিহীন বালকগণও শুদ্ধ চিত্র দর্শনাভিলাষে বিবিধার্থের প্রকাশ-কাল প্রতীক্ষা করিয়াছে।...

বিবিধার্থ এতাবৎ কাল যাহার অবিচলিত অধ্যাবসায় ও প্রযত্নে পূর্বোন্নিখিত বহুতর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর আন্দোলনে পাঠকবর্গের স্নেহভাজন হইয়াছে—যিনি বাঙ্গালিভাষারে বিবিধ তত্ত্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন—এক্ষণে তিনি এতৎ পত্রের সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করায় বিবিধার্থ বিলক্ষণ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। জন্মদাতা হইতে স্ততন্ত্রিত ও সহনা অপরিচিত-হস্তে স্তম্ভ হওয়াতে অনেকে ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারেন; বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পরিবর্তে তৎপদে অপর ব্যক্তির হস্তস্থলে কার্য নির্বাহ করা নিতান্ত সহজ বাপার নহে। বিবিধার্থ যে প্রকার পত্র, মিত্র মহাশয়ই তাহার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন; অনুবাদক-সমাজ, বিবিধার্থ সহায়-সমাজের স্নেহভাজন ও পাঠকমণ্ডলীর নিতান্ত নিম্প্রয়োজনীয় নহে জানিয়াই অগত্যা আমারে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; কিন্তু বিবিধার্থ-সম্পাদন-পদ স্বীকার করিয়া আমি অসমসাহসিকতার কার্য করিয়াছি। সাহিত্য-সংসারে আমার নাম অশ্রুতপূর্ব; হুতরাং এতাদৃশ অসদৃশ গুণ্ড ভার মাদৃশ জন দ্বারা অব্যাঘাতে নির্বাহিত হইবে এমত আশা করা যায় না; কেবল ভূতপূর্ব সম্পাদক গুণ্ডবা পথ পরিকার করিয়া গিয়াছেন ভরসা আছে, আমি সাবধানে সেই পথে তাঁহার অনুসরণ করিলে ক্রমে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন সমর্থ হইব। সচ্ছিদ্র মণিখণ্ডে স্ত্রু প্রবেশনের স্থায় আমার পক্ষে অমূল্য হইবে না।...কালীপ্রসন্ন সিংহ।
বিবিধার্থ-সঙ্গুহ সম্পাদক।

কালীপ্রসন্ন সিংহ ‘বিবিধার্থ-সঙ্গুহ’র ৭ম পর্ক—১৭৮৩ শক,* বৈশাখ-অগ্রহায়ণ—সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহার পর আর ‘বিবিধার্থ-সঙ্গুহ’ প্রকাশিত হয় নাই।

* ‘বিবিধার্থ-সঙ্গুহ’র ৭ম পর্কের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ভুলক্রমে “১৭৮২ শক” মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মদননাথ ঘোষ এই তারিখ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন :—“Kali Prossunno began to edit the Magazine from Baisakh, 1782 Saka, corresponding to April, 1860.”—*Memoirs of Kali Prossunno Singh* (1920), p. 88.

‘পরিদর্শক’

‘বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ’র পর কালীপ্রসন্ন এবার একখানি দৈনিক সংবাদপত্র কিছু দিন পরিচালন করিয়াছিলেন। পত্রখানির নাম ‘পরিদর্শক’; ইহা ১৮৬১ সনের জুলাই (৭) মাসে প্রথম প্রচারিত হয়, তখন ইহার সম্পাদক ছিলেন জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী। ‘বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ’-সম্পাদনকালে কালীপ্রসন্ন ‘পরিদর্শকে’র সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন :—

পরিদর্শক।—এক খানি যথাবিহিত দৈনিক পত্রের নিমিত্ত আমরা বহু দিবসাবধি ক্ষুদ্র ছিলাম; পরিদর্শক আমাদের সে মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে। বর্তমানে বাঙ্গালিসমাজ পরিদর্শক হইতে যত উপকার লাভে সমর্থ হইবেন, সোমপ্রকাশের প্রকাশ পূর্বে অজ্ঞাত বহুল সংবাদপত্র হইতে তাহা প্রত্যাশা করা যায় নাই। পরিদর্শকের এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনটন দেখা যায়। আমরা পরিদর্শক হইতে যত দূর প্রত্যাশা করি, তাহার ক্ষুদ্র কলেবর সে ভার সহনে অসমর্থ; তন্নিমিত্ত আমরা পরিদর্শকসম্পাদকদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সাধারণের উপকারার্থ কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরিদর্শকের কলেবর বৃদ্ধি করুন।

‘পরিদর্শক’ পত্রের অনটনের উল্লেখ করিয়াই কালীপ্রসন্ন ক্ষান্ত হন নাই; সে অনটন দূর করিবার জন্ত শেষে তিনিই অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৮৬২ সনের ১৪ই নবেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৯) হইতে কালীপ্রসন্ন ‘পরিদর্শক’ পত্রের সম্পাদক হন, সঙ্গে সঙ্গে পত্রের কলেবরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ‘সোমপ্রকাশ’ লিখিলেন :—

পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত ও কলেবর বৃদ্ধি।—এই অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনাবধি পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত ও কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। এ দুটাই আমাদের আনন্দের হেতু হইয়াছে। পরিদর্শক দৈনিক পত্র। পাঠকগণ দৈনিক পত্র দ্বারা বহু বিষয় অবগত হইবার বাসনা করেন। কিন্তু এত দিন উহার যে রূপ ক্ষুদ্র অব্যব ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখন উহার আকার বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় উহাতে সমাবেশিত হইবে। দ্বিতীয় আফ্রাদের বিষয় এই, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উন্নতি কল্পে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ও যত্ন আছে। তিনি লাভার্থী নছেন। পরিদর্শকের আয়ের ন্যূনতা দর্শন করিলে তিনি যে ভয়োগসাহ হইবেন, সে সম্ভাবনা নাই। বৃহদাকার পত্রের নিত্য কার্য সমাধান স্বল্পব্যয়সাধ্য নয়, জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহার তৎসম্পাদন সামর্থ্যও আছে। আমরা প্রথমাধি কয়েক খানি পরিদর্শক অভিনিবেশ পূর্বক পাঠ করিলাম। যে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, প্রায় তাহার সমুদায়গুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। (‘সোমপ্রকাশ’, ২৪ নবেম্বর ১৮৬২)

কিন্তু কয়েক মাস যাইতে-না-যাইতেই কালীপ্রসন্ন ‘পরিদর্শক’ প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন।

১৮৬৩ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ‘সোমপ্রকাশ’ লিখিলেন :—

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, পরিদর্শক অকালে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। বাঙ্গলা ভাষায় এক খানিও উৎকৃষ্ট দৈনিক সম্বাদ পত্র নাই। ●পরিদর্শককে দেখিয়া আমাদের কথঞ্চিৎ এই আশা জন্মিয়াছিল যে ইহা ক্রমে সেই ক্ষোভ দূর করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু তাহাও উন্মূলিত হইল। সম্পাদক বিরক্ত হইয়া পরিদর্শক উঠাইয়া দিলেন। তিনি বিরাগের যে যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, গ্রাহকগণের অনাদর উহার অন্তর বলিয়া উপস্থিত হইয়াছে।...আমরা সম্পাদকের

একটা সঙ্কোভ অনুচিত প্রতিজ্ঞা দেখিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইলাম। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বাঙ্গালি সমাজের একরূপ অবস্থা থাকিতে তিনি আর বাঙ্গালিদিগের উপকার করিবেন না। তাঁহার সদুশ দেশহিতৈষী উদারদৃষ্টান্ত ব্যক্তির। যদি একরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তবে কাহা হইতে সমাজের অবস্থা সংশোধিত হইবে?

কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনা

“এই ভারতবর্ষে কত কত মহাবলপরাক্রান্ত রাজাধিরাজেরা স্মদূরবিস্তৃত পহ্লা, স্মদৌর্ঘ দীর্ঘিকা ও দুর্গম দুর্গ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কালের ভীষণ দশনে সেই সকলেরই কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিবে না। কত কত স্নসমুদ্র জনপদ গহন বিপিনে পরিণত ও নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কেবল জ্ঞানচিহ্নস্বরূপ গ্রন্থাদি ভিন্ন অপর কীর্তিমাত্রই বিনশ্বর। গ্রন্থাদি ভাষার সহিত চিরদিন বর্তমান থাকে এবং নবাবিভূত লোকের নিকট চিরদিন নবীন বলিয়া প্রতীত হয়।”—কথাগুলি কালীপ্রসন্ন সিংহের। জ্ঞানচিহ্নস্বরূপ তিনি যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি—বিশেষ করিয়া ‘হতোম প্যাঁচার নক্শা’ ও অষ্টাদশ পর্ক মহাভারতের গল্প-অমুবাদ তাঁহার অবিনশ্বর কীর্তি। কালানুসারে তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দিতেছি :—

(১) বাবু নাটক। ১৮৫৩ (?)

১৪ ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত “বিজ্ঞাপন” হইতে এই নাটকখানির কথা জানা যায় :—

পূর্বে প্রায় দুই বৎসর গত হইল আমি একবার বাবু নাটক নামক গ্রন্থ রচিয়া প্রকাশ করি কিন্তু তাহা এক্ষণে এমত ছুপ্পা প্য হইয়াছে যে কত লোক চারি মুদ্রা স্বীকার করিয়াও পান নাই, অতএব আমি পুনরায় মুদ্রিত করিবার অভিলাষি, যত্বপি কেহ গ্রাহক শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে তাহাকে গ্রাহকগণ মধ্যে গণ্য করা যাইবেক মূল্য ৫০, বিনা স্বাক্ষরকারী ৮০ মাত্র। কালীপ্রসন্ন সিংহ। সম্পাদক।

(২) বিক্রমোর্কশী নাটক। সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭। পৃ. সংখ্যা ৮৫।

ইহার বাংলা আখ্যাপত্র এইরূপ :—

বিক্রমোর্কশী নাটক। / মহাকবি কালীদাস বিরচিত। / শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক মূল / সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বাঙ্গলা ভাষায় / অনুবাদিত। / কলিকাতা / বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ। / তত্ত্ববোধিনী-সভার যত্নে / শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ দ্বারা মুদ্রিত। / ১৭৭৯ শক। / রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি ও উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে ‘বিক্রমোর্কশী নাটক’ আছে।

ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন :—

প্রস্তাবিত গ্রন্থের কিয়দংশ পূর্ণচন্দ্রোদয়-পত্রে প্রকটিত হইয়াছিল; ...রচনাচাতুর্য্য-দৃষ্টি প্রতীত হইতেছে যে ইদানীন্তনের বিষয়ী গ্রন্থকারদিগের স্থায় প্রশংসিত সিংহ মহাশয় ভট্টাচার্য্যদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই; যেহেতু ইহাতে নৃশূর গন্ধমাত্র বোধ হয় না।—‘বিবিধার্থ-সঙ্গহ’, আখ্যন ১৭৭৯ শক, পৃ. ১২৭।

(৩) সাবিত্রী সত্যবান নাটক । ১৮৫৮ । পৃ. সংখ্যা ১০০ + ৯৮ ।

‘বাবু নাটক’-এর ভায় এখানিও কালীপ্রসন্নের নিজস্ব রচনা । ইহার ইংরেজী ও বাংলা আখ্যাপত্র এইরূপ :—

Shabitree Shotyobhan Natuk. / A / Comedy / By / Kaliprosono Sing /
Member of the Asiatic and Agricultural and Horticultural / Societies
of India, and of the British Indian Association, / and President of the
Bedoyth Shahine Shobha / of Calcutta, etc. etc. etc. / Calcutta / Printed by
G. P. Roy & Co. for Bedoyth Shahine Shobha, No. 67/ Emaumbarry Lane,
Cossitollah. / 1858. /

সাবিত্রী সত্যবান নাটক । / শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ / প্রণীত । / কলিকাতা । / জি, পি,
রায় এণ্ড কোং দ্বারা বিত্তোৎসাহিনী / সভার কারণ মুদ্রিত, / কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং
৬৭ । / শকাব্দা ১৭৮০ / বিনা মূল্যে বিতরিতবাং । /

গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনটিও এখানে উদ্ধৃত করা হইল :—

বিজ্ঞাপন ।

সাবিত্রী সত্যবান নাটক, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল । মহাভারতীয় বন পর্বাস্তর্গত
পতিব্রতোপাখ্যানে সাবিত্রী সত্যবান বিষয়ক আখ্যায়িকা বিশেষ রূপে লিখিত থাকায় এস্থলে সে
বিষয় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন । মহাভারতীয় বনপর্বাস্তর্গত পতিব্রতোপাখ্যানের সাবিত্রী চরিত
হইতে কেবল মর্গ্য মাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে, নতুবা কোন কোন স্থান অসংলগ্নবোধে পরিত্যক্ত স্থান
বিশেষে নূতন ঘটনায় অলঙ্কৃত করা গিয়াছে, যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহারা অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার
করিবেন, যে মহাভারতীয় সাবিত্রী সত্যবানের উপাখ্যান অতীব সুন্দর, ইহার রমণীয়তাব ও কমনীয়
প্রতিভার দ্বারা পাঠকগণ সময়ে সুন্দর রসে সম্মোহিত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ বঙ্গীয়
স্ত্রীলোকের সাবিত্রী সত্যবান উপাখ্যান বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক, যদ্বারা পতিব্রতা ধর্মের
উদাহরণ স্বরূপে ও ধর্মজ্ঞান শিক্ষায় তদনুসরণে সমর্থ হইবে । এক্ষণে সাবিত্রী সত্যবান উপাখ্যান
নাটকাকারে পরিণত করিয়া সুন্দর পাঠকগণ সমীপে সমর্পণ করিলাম, বিত্তোৎসাহী মহোদয় গণের
পাঠ যোগ্য এবং নগরীয় অস্ফল্ল রঙ্গভূমির অভিনয়্যার্থ হইলেই পরিশ্রম ও ধন ব্যয় সার্থক বিবেচনা
করিব ।

কলিকাতা
বিত্তোৎসাহিনী সভা
১৭৮০ শকাব্দা

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ ।

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে এক খণ্ড ‘সাবিত্রী সত্যবান নাটক’ আছে ।

(৪) মালতী মাধব নাটক । ১৮৫৯ । পৃ. সংখ্যা ১০০ + ৯১ ।

ইহার ইংরেজী আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

Malatee Mudhaba / A / Comedy / of / Bhubabhootee. / Translated
into Bengalee from the original Sanscrit, / By / Kali Prusno Sing. /
M. A. S. / Calcutta : / Printed for the Beedut Shaheenee Shova, by
G. P. Roy & Co., / No. 67, Emaumbarry Lane. / Cossitollah. / 1859. /

বাংলা আখ্যাপত্র এইরূপ :—

মালতী মাধব নাটক । / মহাকবি ভবভূতি বিরচিত । / জীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে / বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত । / কলিকাতা । / জি, পি, রায় এণ্ড কোং দ্বারা বিজ্ঞোৎসাহিনী / সভার কারণ মুদ্রিত, / শকাব্দা ১৭৮০ / বিনা মূল্যে বিতরিতব্য । /

গ্রন্থকারের “বিজ্ঞাপন” হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

মালতীমাধব নাটক মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল, বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের অবিকল লালিত্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা নিরর্থক, কারণ অবিকল অনুবাদিত গ্রন্থ সহজেই পাঠ করিতে ঘৃণা বোধ হয়, বিশেষতঃ প্রত্যেক পদের বাঙ্গালা অর্থ ও শব্দানুসরণে যথার্থ ভাব সংরক্ষণ করা কাহারও সাধ্য নহে, ইহার প্রথম উত্তম স্বরূপে মহাকবি কালিদাস প্রণীত বিক্রমোর্কশী নাটকেই সংপূর্ণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্নিমিত্ত এবার তাহা হইতে সতর্কিত হইতে হইয়াছে।...

মুদ্রিত সংপ্রণীত ও মদনবাদিত অল্প অল্প নাটক হইতে মালতীমাধবের ভাষারও প্রভেদ হইয়াছে, কারণ অভিনয়্যার্থ নাটক সকল ইদানিন্তন যে ভাষায় লিখিত হইতেছে আমিও সেইরূপ অবলম্বন করিয়া দ্রুত বিময় স্নান করণ মানসে সচেষ্ট ছিলাম, এক্ষণে সহায় রঙ্গপ্রিয়-মহোদয়গণ মালতীমাধব নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ অভিনয়্যার্থ ও পাঠ্য বিবেচনা করিলেই পরিশ্রম ও ধন ব্যয় সফল বিবেচনা করিব।

কলিকাতা ।
বিজ্ঞোৎসাহিনী সভা ।
শকাব্দা ১৭৮০ ।

জীকালীপ্রসন্ন সিংহ ।

(৫) হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন । ১৮৬১। পৃ. সংখ্যা ১৬।

১৪ জুন ১৮৬১ তারিখে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে কালীপ্রসন্ন এই পুস্তিকাখানি রচনা করিয়া সাধারণের মধ্যে বিতরিত করেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র তৎসম্পাদিত *Indian Field* পত্রে এই পুস্তিকাখানির সমালোচনা-গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন :—

We have received a funeral eulogy by Bahoo Kali Prossunno Singh on the late editor of the *Hindoo Patriot* which has been published at the Pooran Sangraha Press. The language used is chaste and classical but perhaps too refined and elevated for common readers. The writer depicts the character and delineates the career of the late Harish Chunder Mookerjee. He calls on his fellow-countrymen to open their purse-strings to commemorate the distinguished services of the deceased and we trust the call will be cordially responded to. *

* জীমন্মথনাথ ঘোষ-রচিত *Memoirs of Kali Prossunno Singh* (1920) পুস্তকের ৫০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগারে ও তদন্তভুক্ত বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে এই পুস্তিকার দুই খণ্ড আছে।

(৬) ছতোম প্যাঁচার নকশা।

‘ছতোম প্যাঁচার নকশা’ প্রথমে খণ্ডঃ পুস্তিকাকারে ১৮৬১ (?) সনে প্রকাশিত হয়। এরূপ এক খণ্ড পুস্তিকা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগারে আছে। পুস্তিকাখানির (পৃ. সংখ্যা ১৬) আখ্যাপত্র এইরূপ :—

ছতোম প্যাঁচার / কলিকাতার নকশা। / চড়ক। / প্রথম খণ্ড। / “উৎপৎসাতেত্তি মন্ত কোপি সমানধর্মী। / কালোহায়ং নিরবধিবিপুলী চ পৃথী” / ভবভূতি। / আশ্মান। / রামপ্রসে মুদ্রিত। / নং ৮৪ হঁকো রাম বহর ইষ্টীট। / মূল্য পয়শায় দুপানা। /

ইহার উপহার-পৃষ্ঠায় “১৭৮৩ শক” (= ১৮৬১ ?) পাইতেছি। পুস্তিকার ভূমিকা-স্বরূপ নিম্নোক্ত অংশটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

বিজ্ঞাপন।—ছতোম প্যাঁচা এখন মধ্যে মধ্যে ঐ রূপ নকশা প্রস্তুত করবেন। এতে কি উপকার দর্শিবে, তা আপনারা এখন টের পাবেন না; কিন্তু কিছু দিন পরে বুজতে পারবেন। ছতোমের কি অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু হয় ত সে সময় হতভাগ্য ছতোমকে দিনের বালা দেখতে পেয়ে কাক ও ফরমাসে হারামজাদা ছেলেরা ঠোট ও বাঁস দিয়ে, খোঁচাখুঁচি করে মেরে ফেলবে। হতরাং কি দিক্কার কি ধন্তবাদ ছতোম কিছুই শুনতে পাবেন না।

এই পুস্তিকায় দুইখানি লাইন-এনগ্রেভিং আছে। একখানি—“ছতোম প্যাঁচা আশ্মানে বসে নকশা উড়াচ্ছেন”; অপরখানি—“ঠগ ঠগের হঠাৎ অবতার”।

১৮৬২ সনের শেষার্ধ্বে ‘ছতোম প্যাঁচার নকশা’ প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। ইহার এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে। পুস্তিকাখানির ইংরেজী ও বাংলা আখ্যাপত্র এইরূপ :—

Sketches by Hootum / illustrative of / Every Day Life and Every Day / People. / Vol. 1 / “By heaven, and not a master thought.” / “Mislike me not for my complexion.” / Shakespeare. / Calcutta. / Bose and Company, Printers & Publishers. / 1862. /

ছতোম প্যাঁচার নকশা। / (প্রবন্ধ কল্পনা।) / প্রথম ভাগ। / স্বর্গাদি মন্তপ্রাপ্তঃ নাচাৰ্য্য মুখ কন্দরাং প্রকাশায় চরিত্রাণাং মহৎস্বাভাবন শুখা। / চিত্রবৃত্তেচ দত্তাশ্চৈ প্রতিভা পরিসজ্জিতা। / কলিকাতা। / রাম প্রেন্ / বহ কোম্পানী কর্তৃক প্রচারিত। / দরজী পাড়া। / ১৭৮৪। / [পৃ. সংখ্যা ১৭৬]

পুস্তকের আরম্ভেই একটি অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা। কবিতাটি এই :—

হে শারদে ! কোন্ দোষে দুখি দাসী ও চরণতলে ?

কোন্ অপরাধে হলিলে দাসীরে দিয়ে এ সম্ভান ?

এ কুৎসিতে ! কোন্ লাজে ষপত্নী সমাজে পাঠাইব,

হেরিলে মা এ কুরূপে—দুখিবে জগৎ—হাঁসিবে

সতিনী পোড়া ; অপমানে উভ্রায়ে কাঁদিবে

কুমার—সে সময় মনে ম্যান থাকে ; চির অনূগত লেখনীরে !

শেষের সংস্করণগুলিতে এই কবিতাটির পরিবর্তে একটি টপ্পার দুই পংক্তি দেওয়া আছে।

‘হতোম প্যাচার নকশা’র দ্বিতীয় ভাগ অল্প দিন পরেই প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম দুই ভাগ একত্রে (পৃ. ১৮০+৫৪) প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ সনে এবং পুনর্মুদ্রিত হয় (পৃ. ১৩৮+৫৪) ১৮৬৮ সনে। এই দুই সংস্করণের পুস্তক ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।

(৬) কল্কেতার হাট্‌হন্দ। ১৮৬৪ (১)

ডক্টর স্ননীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার পুস্তকাগার হইতে সম্প্রতি আমাকে এক খণ্ড ‘হতোম প্যাচার নকশা’, ১ম ভাগ (১ম সংস্করণ) দিয়াছেন, এবং ইহার সহিত একত্রে বাঁধা ৬৮ পৃষ্ঠার এক খণ্ড পুস্তকের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

পুস্তকখানির আখ্যাপত্র নাই। ইহা চারিটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ :—আলীপুরের কৃষিপ্রদর্শন, (২) সরস্বতী পূজা, (৩) পল্লীগ্ৰাম তীর্থ, (৪) উপসংহার। পুস্তকের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে ইহার প্রকাশকাল যে ১৮৬৪ সন তাহা জানিতে পারা যায় :—

আজ ১২৭০ সালের ৬ই মাঘ সোমবার.....(১ম পৃষ্ঠা)

হতোম [১৮৬২ সনে প্রকাশিত] আজো দুবছর হয় নাই বাহির হয়েছে,....(পৃ. ২৪)

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ইহা কালীপ্রসন্নেরই রচনা বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে। ৪৯ পৃষ্ঠার নিম্নোদ্ধৃত পাদটীকাটি আমার অনুমান সমর্থন করে :—

(৫) সহরে যাত্রা কবির সময় যে রকম সমারোহ হয়ে থাকে, তদ্বিষয় প্রথম ভাগ হতোম প্যাচার নকশার বারোয়ারি পূজা গর্তাঙ্গে দেখ।

এই পুস্তকখানিই বোধ হয় ‘কল্কেতার হাট্‌হন্দ’। ‘হতোম প্যাচার নকশা’, ১ম ভাগের (১ম সংস্করণ) শেষে ‘কল্কেতার হাট্‌হন্দ’ পুস্তকের এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছিল :—

যদি হতোমের নকশার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সহদয় সমাজে গ্রাহ্য হয় তবে হতোম প্যাচা লিখিত

কল্কেতার হাট্‌হন্দ

অর্থাৎ

Mysteries of Calcutta

পুস্তকের ছাপা আরম্ভ করা যাবে।

আমার মনে হয় ‘কল্কেতার হাট্‌হন্দ’ প্রকাশিত হইয়াছিল। আলোচ্য পুস্তকের ৮ম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পাদটীকায় “হাট্‌হন্দ” কথাটির প্রয়োগও পাইতেছি :—

(২) এই পরিচ্ছেদে ও পরিচ্ছেদান্তরে যে সকল ব্রাহ্মের কুজিয়ার হাট্‌হন্দ আছে...

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের আর একটি খণ্ড আছে ; তাহাও আখ্যাপত্রবিহীন। পুস্তক-তালিকায় ইহা ‘আলীপুরের কৃষিপ্রদর্শন’ নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

(৭) পুরাণসংগ্রহ। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত। ১-১৭শ খণ্ড। ১৮৫৮-৬৬।

কয়েক জন পণ্ডিতের সাহায্যে কালীপ্রসন্ন মূল সংস্কৃত হইতে মহাভারত গড়ে অনুবাদ করেন। কাঁয়ারস্বরের পূর্বে পণ্ডিত-সংগ্রহের জন্ত ২ জুলাই ১৮৫৮ তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ তিনি নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন :—

বিদ্যোৎসাহিনী সভার বিজ্ঞাপন।—বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে কোনো সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ কারণ ১০ জন পণ্ডিতের প্রয়োজন আছে, বেতন ১০, ১২, ১৬ টাকা, বেলা ১০টা হইতে তিনটা পর্যন্ত সভাগারে উপস্থিত থাকিতে হইবেক, এবং দেবনাগর অক্ষরও জানা আবশ্যক হইতেছে যাহারা উক্ত পদ গ্রহণেচ্ছুক হন আমার নিকট আসিলেই সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।—
শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

কালীপ্রসন্ন এই অনুবাদ-গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছিলেন ‘পুরাণসংগ্রহ’। নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপন হইতে জানা যাইবে ১৮৫৮ সনের জুলাই মাসের মাঝামাঝি মহাভারতের অনুবাদ-কার্য আরম্ভ হয় এবং রামায়ণ-অনুবাদের সম্বন্ধও কালীপ্রসন্নের ছিল :—

বিজ্ঞাপন।—মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয়েরা ১লা শ্রাবণ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় উপস্থিত হইবেন, ঐ দিনে রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদারম্ভ হইবে। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।
—‘সংবাদ প্রভাকর,’ ১৩ জুলাই ১৮৫৮।

মহাভারতের অনুবাদ-কার্য শেষ করিয়া সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশ করিতে দীর্ঘ আট বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার ১৭শ বা শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৮৮ শকে (১৮৬৬)। “অষ্টাদশ পর্ক অনুবাদের উপসংহার” রূপে কালীপ্রসন্ন ১৭শ খণ্ডের শেষে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

১৭৮০ শকে সংকীর্ষিত ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া ৭ জন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই আট বর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া বিষণ্ণতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অল্প সেই চিরসঞ্চিত কঠোর ব্রতের উদ্যাপনস্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্কের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম।...অনুবাদসময়ে মূল মহাভারতের কোন স্থলই পরিচাপ্ত করি নাই ও উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক কোন অংশই সম্মিলিত হয় নাই; অথচ বাঙ্গালাভাষার প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন পাইয়াছি এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে সকল দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, সেগুলির নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম।...

বহু দিবস সংস্কৃত সাহিত্যের সমাক পরিচালনার বিলক্ষণ অসম্ভাব হওয়াতে আপাতত মূল মহাভারতের হস্তলিখিত পুস্তকসমুদায়ের পরস্পর একপ্রকার বৈলক্ষণ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, ২১৪ খানি গ্রন্থ একত্র করিলে পরস্পরের স্রোত, অধ্যায় ও প্রস্তাব্যটিত অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তন্নিবন্ধন অনুবাদকালে সবিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমি বহুত্রে আসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত এবং সভাবাজারের রাজবাটীর, স্বত বাবু আশুতোষ দেবের ও শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকালয়স্থিত, তথা আমার প্রপিতামহ দেওয়ান ৬ শান্তিরাম সিংহবাহাদুরের কাশী হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তকসমুদায় একত্রিত করিয়া বহুত্বলের বিরুদ্ধভাবের ও ব্যাসকূটের সন্দেহ নিরাকরণ পূর্বক অনুবাদ করিয়াছি। এই বিষয়ে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়মন্দিরের হবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।...

আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাপদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং অনুবাদিত প্রস্তাবের কিয়দংশ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও ক্রিয়ন্ত্ৰণ পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সরলহৃদয়ে মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না। তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কাৰ্যোগপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রায়ন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন। ফলত বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠ্যবহুবাধি আমি যে কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বারা নির্দেশ করা যায় না।...হৃদয়ের শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনুবাদিত ভাগ হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল সংগ্রহ করিয়া অমিত্রাক্ষর পণ্ডিত ও নাট্যকারের পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমারে বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছেন।

যে সকল মহাত্মা সময়ে সময়ে আমার সদস্তপদে ব্রতী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের ব্যাকরণের অধ্যাপক ও সংস্কৃত রথবংশের বাঙ্গলা অনুবাদক ৬ চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, ৬ কালীপ্রসন্ন তর্করত্ন, ৬ ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরমাত্মীয় ৬ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৬ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও ৬ অযোদ্যানাথ ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি ১০ জন অনুবাদশেষের পূর্বেই অদম্যে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সকল মহাত্মাদিগের নিমিত্ত আমারে চিরজীবন যাবৎ পর নাই দুঃখিত থাকিতে হইবে।

এক্ষণকার বর্তমান শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রামদেবক বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সদস্তদিগকে মনের সহিত সন্তুষ্টিচিহ্নে বার বার নমস্কার করিতেছি। এই সমস্ত সুবিচক্ষণ কর্ণধারদিগের কৃপাবলেই আমি অনায়াসে মহাভারতস্বরূপ সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম।...

মহাভারতের প্রত্যেক খণ্ড তিন সহস্র মুদ্রিত হয়। সমগ্র গ্রন্থ বিনামূল্যে ও বিনামাণ্ডলে প্রার্থীদিগকে দান করা হইয়াছিল।

(৮) বঙ্গেশবিজয়।

কালীপ্রসন্ন এই নামে একখানি গ্রন্থ লিখিতেছিলেন। ১৮৬৮ সনে ইহার দুই ফর্মা ছাপাও হইয়াছিল, * কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা।

/ মূল, অষ্টম ও মহাত্মা ৬কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত / বঙ্গানুবাদ
আচার্য্যগণের টীকানুযায়ী / পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। / জনঃ সংসারদুঃখার্থো গীতাজ্ঞানং
সমালভেৎ। / গীতা গীতাস্তং লোকে লক্ষা ভজিৎস্ববীভবেৎ ॥ / ৩৮ নং নন্দলাল দেব স্ট্রীট, বরাহনগর,
“শ্রীরামকৃষ্ণ-লাইব্রেরী” হইতে শ্রীমত্যাচরণ মিত্র কর্তৃক / প্রকাশিত। / কলিকাতা। / শক
১৮৩৩।১৩৮।১৯১১। / মূল্য উত্তম বাঁধাই ৮০ বার আনা / [পৃ. সংখ্যা ৫২২]

* প্রতাপচন্দ্র ঘোষ তাঁহার ‘বাল্যবন্ধু কালীপ্রসন্নের নামে ‘বঙ্গাধিপ-পরাজয়’ গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন। ইহার ভূমিকায় (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ সনে লিখিত) প্রকাশ :—

“...গ্রন্থের নাম ‘বঙ্গেশবিজয়’ দিয়া মুদ্রাক্ষনার্থে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমার বন্ধু দ্বারা পাঠাইলে শুনিলাম যে, উক্তাভিধেয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের রচিত একখানি গ্রন্থের দুই ফর্মা ভট্টাচার্য্য যন্ত্রে ছাপা হইয়াছে, একারণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের, তথা শ্রীযুক্ত সিংহ মহোদয়ের ও আমার সম্যক আত্মীয়ের অনুবোধে ‘বঙ্গেশবিজয়’ নামের পরিবর্তে এই গ্রন্থের নাম ‘বঙ্গাধিপ পরাজয়’ দিলাম।... (২ আশ্বিন ১২৭৫)”

‘শ্রীমদ্ভগবদগীতা’ কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় ইহার এক খণ্ড শ্রীযুক্ত ক্ষিরণচন্দ্র দত্তের নিকট দেখিয়াছি। পুস্তকে “প্রকাশকের নিবেদনে” প্রকাশ :—

গল্প মহাভারতের লঙ্কা-প্রতিষ্ঠা অনুবাদক পূর্ণা শ্লোক ধনকুবের ও কালীপ্রসন্ন সিংহ এই সংস্করণ যন্ত্র করিয়া অকালে স্বর্গারোহণ করেন, সুতরাং এতাবৎকাল ইহা আদৌ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। আমরা উহার উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে জীর্ণ জীর্ণ কীটদষ্ট হস্তলিখিত পুথির প্রকাশসত্ত্বে ভার গ্রহণ করিয়া মহাত্মার শেষ কীর্ত্তি স্বরূপ এই “শ্রীমদ্ভগবদগীতা” সাধারণের সুবিধার জন্য স্বহস্তে পকেট এডিশনে প্রকাশ করিলাম।

কালীপ্রসন্ন-লিখিত ‘শ্রীমদ্ভগবদগীতা’র “ভূমিকা” নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

মহাভারতীয় ভীষ্ম পর্ব জম্বুখণ্ডবিনির্মাণ, ভূমি, ভগবদ্গীতা ও ভীষ্মবধ এই চারি পর্বে বিভক্ত। এই পর্ব পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বতন হিন্দুরা সকল কার্যই ধর্মের অনুমোদিত করিয়া সম্পন্ন করিতেন। যুদ্ধ যে এমন নৃশংস ব্যবহার, তাহাও ধর্ম বুদ্ধিতেই সম্পাদিত হইত। উভয় পক্ষ, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে, যে সকল সাংখ্যমিক নিয়ম সংস্থাপিত করেন, তাহাতেই উহা সপ্রমাণ হইতেছে। উভয় পক্ষই মধ্যে মধ্যে আপনাদের সংস্থাপিত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতেন বটে, কিন্তু যিনি ঐ রূপ করিতেন, তিনি জনসমাজে অন্ত্যাকারী বলিয়া সাতিশয় নিন্দনীয় হইতেন। এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যে ভূরি ভূরি লোক ক্ষয় ও অনিষ্ট ঘটনা হইবে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে উভয় পক্ষই বিলক্ষণ রূপে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; কিন্তু হৃদয়োধন স্বার্থপরতায় ও যুদ্ধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে পরাভূম্ব হইলে অধর্ম হয়, এই রূপ সংস্কারেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ব্যাসদেবের সময়ে কিরূপ ভূগোল বিজ্ঞান আলোচনা হইত, জম্বুখণ্ডবিনির্মাণ ও ভূমি পর্বে তাহাও এক প্রকার অবগত হওয়া যায়।

ভগবদ্গীতা পাঠ করিলে পূর্ব পুরুষদিগের বিজ্ঞা বুদ্ধি স্মরণ করিয়া আশ্চর্য্যে পরিপূর্ণ হইতে হয়। কত শতাব্দী অতীত হইল ভগবদ্গীতা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু উহার অধিকাংশ মতের সহিত অধুনাতন বিখ্যাত আধ্বিকী ও ত্রয়ী বেত্তাদিগের মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে প্রান্তিসংকুল মতও নিবেশিত আছে যথার্থ বটে, কিন্তু উহার মধ্যে যে সকল অমূল্য সত্য অক্ষত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই ভারতবর্ষীয় আধ্বিকী ও ত্রয়ী বেত্তাদিগের গৌরবের একমাত্র দৃষ্টান্ত হইতে পারে। এখানে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে যুদ্ধপর্যন্ত যুদ্ধ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তই ভগবদ্গীতা অবতারণিত হইয়াছে, সুতরাং যুদ্ধোৎসাহ উদ্দীপিত করা উহার যত উদ্দেশ্য, মনোবিজ্ঞা প্রভৃতি প্রচার করা তত উদ্দেশ্য ছিল না। ভগবদ্গীতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সঞ্জয় একেবারে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করাইতেছেন, কিন্তু ইতিপূর্বে কোন স্থলেই যুদ্ধের কথা উল্লিখিত হয় নাই। ব্যাসদেব কেবল মহাভারতের ঘটনাসম্পাদিতা সম্পাদন করিবার নিমিত্তই এই রূপ কৌশল করিয়াছেন।

পূর্বতন হিন্দুরা কিরূপ উৎসাহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, অরাজিকগণকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত হৃদয়বলকে কেমন আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিতেন, ধর্ম রক্ষার অনুরোধে প্রাণভ্যাগ কেমন সামান্য বোধ করিতেন, কি প্রকারে সেনাপতি নিয়োগ, সেনা বিভাগ, যুদ্ধযাত্রা, বাহু নিৰ্ম্মাণ, যুদ্ধ আরম্ভ, যুদ্ধ অবহার ও নিরঙ্কণে বিশ্রাম করিতেন এবং যুদ্ধে মৃত ও আহত ব্যক্তিদিগের প্রতি কিরূপ আচার করিতেন, ভীষ্ম বধ পর্ব পাঠ করিলে বিলক্ষণ জ্ঞাত হওয়া যায়। ফলত যিনি স্তম্ভ তম্ন করিয়া ইতিহাস পাঠ করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি ভীষ্ম পর্বে অভূতপূর্ব আনন্দ লাভ ও অনেক সত্য উপার্জন করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। আমি যে দুঃসাহা ও চিরজীবন-

সেবা কঠিন ব্রতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তাহা যে নির্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব, আমার এ প্রকার ভরসা নাই। ভগবদ্বাক্তীতা অনুবাদ করিয়া যে লোকের নিকট যশস্বী হইব, এমত প্রত্যাশা করিয়াও এ বিষয়ে হস্তার্পণ করি নাই।* যদি জগদীশ্বর-প্রদানে পৃথিবী-মধ্যে কুত্রাপি বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকে, আর কোন কালে এই অনুবাদিত পুস্তক কোন ব্যক্তির হস্তে পতিত হওয়ায় সে ইহার মৰ্ম্মানুধাবন করত হিন্দু কুলের কীর্ত্তিস্তম্ভরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্তীতার মহিমা অবগত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলোই আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

এই সকল পুস্তক ছাড়া কালীপ্রসন্ন বহু প্রবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন। তাহার অনেকগুলি ‘বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা’য় প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম দুই সংখ্যা ছাড়া এই পত্রিকার অন্য সংখ্যাগুলি এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

ডেবিড হেয়ার সাংস্কৃতিক সভাতেও কালীপ্রসন্ন কয়েক বার প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।* ডেবিড হেয়ারের মৃত্যুর পর প্রতি বৎসর জুন মাসে এই সভার অধিবেশন হইত; সভায় বহু মাছগণ্য লোকের সমাগম হইত, প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতাাদিও হইত। কালীপ্রসন্ন নিজ বাটীতে কয়েক বার এই সাংস্কৃতিক সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। এই স্মৃতিসভায় তিনি যে সকল বাংলা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

১ জুন	১৮৫৬,	১৪শ সাংস্কৃতিক সভা	প্রবন্ধ।
১ জুন	১৮৫৭,	১৫শ ”	বঙ্গভাষার অনুশীলন সম্বন্ধে প্রবন্ধ।
১ জুন	১৮৫৯,	১৭শ ”	বাংলা নাটক
২ জুন	১৮৬১,	১৯শ ”	প্রবন্ধ।
১ জুন	১৮৬৩,	২১শ ”	কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ।†

কালীপ্রসন্নের এই সকল রচনার কোনটিই এ-যাবৎ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।

কালীপ্রসন্ন সিংহের বদাশুভতা

কালীপ্রসন্নের বদাশুভতা ছিল অনন্তসাধারণ এবং বহুমুখী; দেশের বহুবিধ হিতকর কার্যে ব্যক্তিগত ভাবে এবং সামাজিক ভাবে অকাতরে দান করিতে তাঁহার মত সে-যুগে আর কাহাকেও দেখি না। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে সভাই লিখিয়াছেন, “তিনি যেমন তাঁহার Purse-এর সন্ধ্যাবহার করিতে জানিতেন, তেমন আর কেহই জানিত না।” তাঁহার বদাশুভতার বিস্তৃত পরিচয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভবপর নহে। আমরা এখানে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

* Peary Chand Mittra : *A Biographical Sketch of David Hare, (1877)*, pp. 94, 99, 101-02 দ্রষ্টব্য।

† ১ জুন ১৮৬৩ তারিখের ‘সোমপ্রকাশে’ প্রকাশ :—

“বিবিধ সংবাদ। ১৬ জ্যোষ্ঠ।—১লা জুন সোমবার শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে মৃত মহাত্মা ডেবিড হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সাংস্কৃতিক সমাজে বঙ্গদেশীয় কৃষিকার্যের বর্তমান অবস্থার সমালোচন, কৃষিকার্যের উপযোগিতা, কৃষিসমাজ ও কৃষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যিকতা এবং কৃষিজাত দ্রব্য ও কৃষিসাধন অস্ত্র ও যন্ত্রাদি প্রদর্শনের মহোপকারিতা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

মাতৃভাষা-চর্চায় ছাত্রদের উৎসাহ দান

ছাত্রদিগকে বাংলা-রচনায় উৎসাহিত করিবার জন্ত কালীপ্রসন্ন সময়ে সময়ে পদক ও পুরস্কার বিতরণ করিতেন। ১ জুন ১৮৫৮ তারিখের ‘হিন্দুরত্ন কমলাকর’ পত্রে প্রকাশ—

ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ছাত্রদের শিক্ষার পরীক্ষায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ইংরাজি চারি শ্রেণীতে বাঙ্গালা বিষয়ে প্রশ্ন প্রদান ও উত্তর লেখক চারি বালককে পদক প্রদান করিয়াছিলেন। • শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালা শিক্ষার পরীক্ষা করিয়া, ছাত্রগণকে পারিতোষিক দিয়া এবং এক বক্তৃতা দ্বারা তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি সিংহ মহাশয়ের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।*

সাহিত্যের উৎসাহদাতা

মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে কালীপ্রসন্ন অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। লেখক-বর্গের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ মাঝে মাঝে তিনি পুরস্কার ঘোষণা করিতেন—বিদ্যোৎসাহিনী স্তভার বিবরণে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

‘সংবাদ প্রভাকর’ যন্ত্রালয়ে চৈত্র মাসের শেষ দিবসে একটি সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইত। সম্মিলনে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সমাগম হইত, প্রবন্ধাদি পঠিত হইত, ভোজেরও ব্যবস্থা ছিল। এই বার্ষিক সম্মিলনে বহু লেখককে পুরস্কার বিতরণ করা হইত। এই সকল পুরস্কার দিতেন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির; তাহাদের মধ্যে কালীপ্রসন্নের নাম সর্বোপরে উল্লেখ করা কর্তব্য। এরূপ পুরস্কার প্রদানের একটি বিবরণ ১ বৈশাখ ১২৬৮ সালের ‘সংবাদ প্রভাকর’ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

বঙ্গভাষা লেখক ও অল্প ভাষা হইতে বাঙ্গালা অনুবাদকদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ প্রভাকর পত্রের বর্ধবৃদ্ধির আনন্দজনক এই বার্ষিকী সভায় পারিতোষিক প্রদানের যে নিয়ম এতৎপত্রের জন্মদাতা কবিবর গুণাকর ৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কতিপয় দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহি ব্যক্তিদিগের বিশেষানুরাগ ও সাহায্য দ্বারা নিরূপণ করিয়াছিলেন...বহুবাজার নিবাসি বহুগুণসম্পন্ন বিদ্যানুরাগী সরলস্বভাব বাবু ৬ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কয়েক বৎসর ঐ বিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন,...। উমেশ বাবুর অভাবে উক্ত লেখক ও অনুবাদকগণের উৎসাহবর্দ্ধন বিষয়ে আমারদিগেরও অনুরাগ অনেকাংশে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল, কিন্তু যুগলসেতুনিবাসি ধনরাশি বিদ্যোৎসাহী সরলস্বভাব হৃৎপ্রসন্নচিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধন বিষয়ে সমধিক উৎসাহী হইয়া যথেষ্ট রূপে আনুকূল্য করাতে আমারদিগের ঐ ক্ষুদ্রোৎসাহ বর্দ্ধমান হইয়াছে, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন বিষয়ে কালীপ্রসন্ন বাবুর বৈরাগ্য অনুরাগ ও বক্তৃতা আছে, তাহা সাধারণের অবদিত নাই, তিনি ঐ বিষয়ে কেবল অর্থ ব্যয় করিতেছেন, এমত নষ্টে স্বয়ং লেখনীধারণ পূর্বক অবিশ্রান্তরূপে পরিশ্রমও করিতেছেন, বঙ্গভাষার স্বলেখকদিগকে তিনি সমাদর পূর্বক গ্রহণ করেন, এবং তাহারদিগের দ্বারাই সর্বদা পরিবেষ্টিত থাকেন, স্বয়ং মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপন করিয়া মহাভারতাদি মহাপুরাণ ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থাদি বঙ্গভাষায় অনুবাদ পূর্বক উত্তম রূপে মুদ্রাঙ্কণ করিয়া অকাতরে সাধারণকে বিতরণ করাতে যে উপকার হইতেছে তাহা

* “পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রে বিগত শতাব্দীর বাংলার কথা,” “ভারতবর্ষ,” আখিন ১০০৯, পৃ. ৫৬১।

বিবেচনা করিলে স্বদেশহিতোচ্ছু ব্যক্তিদিগকে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের নিকটে বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করিতে হইবেক। অধুনা আমরা এইস্থলে তাঁহার বিদ্বৎ অধিক না। লিখিয়া পরসেখরের নিকটে একান্তিচিন্তে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি অরোগী এবং দীর্ঘায়ু হউন, এবং বঙ্গভাষার উন্নতিবর্দ্ধন বিষয়ে তাঁহার যত্ন ও অনুরাগ এবং উৎসাহ ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকুক, স্বজাতীয় ভাষার অবস্থা সংশোধন বিষয়ে তিনি অবিচলিত অনুরাগ প্রকাশ করিয়া আপনার যথার্থ কর্তব্যাকাঙ্ক্ষা সাধন করিতেছেন, তিনি তদ্বিষয়ে যে সমস্ত সংস্কার করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইলে এদেশের এক চির উপকার সাধন করা হইবেক। পুরাবৃত্তলেখক মহানুভবেরা হেমাঙ্করে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের গুণাবলী বর্ণন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় অনুবাদের নিমিত্ত দুইটি প্রশ্ন প্রদান করিয়া ছিলেন, যথা।

ইংলণ্ডীয় কবির তামস্ মুর সাহেবের বিরচিত লালারুক বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ পারিতোষিক ১০০ টাকা।

টড্ সাহেবের রাজস্থাননামক পুস্তক হইতে উদয়পুরের রাজকুমারী কৃষ্ণকুমারীর বিচিত্র চরিত্র বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ পারিতোষিক ৩০ টাকা।

ইহার মধ্যে কোন অনুবাদক লালারুক অনুবাদ করিয়া প্রেরণ করেন নাই, ...।

দ্বিতীয় বিষয়, অর্থাৎ কৃষ্ণকুমারীর বিচিত্র চরিত্র বর্ণন দুই জন অনুবাদ করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু গৌসাই দাস গুপ্তের লেখা পরীক্ষকদিগের বিবেচনায় উত্তম হওয়াতে তাঁহাকে অবধারিত পারিতোষিক ৩০ টাকা প্রদানানুমতি হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় পদ্য রচনাবিষয়ে তিনটি বিষয় প্রেরণ করেন যথা।

রূপকচ্ছলে সমস্ত রজনীবর্ণন, বঙ্গভাষার সমালোচন এবং তাহার বর্তমান অবস্থাবর্ণন কবিতা ৪০০ পঙ্ক্তির নূন না হয়, পারিতোষিক ৫০ টাকা, ... শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়মাধব বহুর রচনা উত্তম হওয়াতে তিনি অবধারিত পঞ্চাশত মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বিতীয় বিষয়, নগর মধ্যে রজনী সম্ভোগ এবং কলিকাতা নগরের বর্তমান অবস্থা বর্ণন। কবিতার সংখ্যা চারিশত পঙ্ক্তির অধিক না হয়, এই বিষয় কেবল শ্রীযুক্ত রাধামাধব মিত্র লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন, ... তাঁহাকে অবধারিত ত্রিশ টাকা প্রদান করা গেল।

শেষ প্রশ্নাব গল্প রচনা পুরাণ পাঠের ফল, এই বিষয়ে যে কয়েকটি রচনা আসিয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী সেনের রচনা পরীক্ষকদিগের বিবেচনায় উত্তম হওয়াতে তাঁহারা উভয় লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ অবধারিত পারিতোষিক ত্রিশশং মুদ্রা সমভাগ করিয়া দিবার আদেশ করিয়াছেন।

১২৭০ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির বার্ষিক সভার জন্মও কালীপ্রসন্ন স্বনামে ও বেমানীতে কয়েকটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। পুরস্কারের বিষয়গুলি এই :-

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের প্রদত্ত।

পুরাণ পাঠের ফল কি ?

পরিমাণ প্রভাকর পত্রের চারি ফরমা, পুরস্কার ২৫ টাকা।

পরীক্ষক ব্রহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াসী।

শ্রীমূলকর্ষণদ শর্মা প্রদত্ত।

প্রথম। “ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা অণ্বেক্ষা কি কি বিষয়ে এইক্ষেণে উন্নতি হইয়াছে” যিনি

- লিখিবেন, তাঁহার এই লেখা অনুান বিশেষতঃ পত্র হয়, পারিতোষিক ১০ টাকা মাত্র, পরীক্ষক
- শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়।

দ্বিতীয়, বঙ্গদেশাধিপতি হুবিখ্যাত রাজা বল্লাল সেনের জীবন বৃত্তান্ত ১২ পুঞ্জি ফরমার এক শত পৃষ্ঠার নূন না হয়, পারিতোষিক ৪০ চল্লিশ টাকা।

পরীক্ষক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ও বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ।... (‘সংবাদ প্রভাকর’, ২৫ মার্চ ১৮৬৪)

কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিতায় অনেক লেখক তাঁহাদের সাহিত্যচর্চার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৬৩ সনের ৩০ নবেম্বর তারিখের ‘সোমপ্রকাশে’ প্রকাশ :—

নূতন পুস্তক।... বাঙ্গলা নাগানন্দ। ইহা সংস্কৃত নাগানন্দের অনুবাদ। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুমতি অনুসারে এই অনুবাদ করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন বাবু ইহার সমুদয় ব্যয় দিয়াছেন। লেখা মন্দ নহে। চিত্তপুর পুরাণসংগ্রহ যত্নে মুদ্রিত; ...

কালীপ্রসন্ন সাহিত্যিকগণকে নানা ভাবে সাহায্য করিতেন। ১৮৬২ সনের মাঝামাঝি ফেব্রুয়ারি মাসে ভট্টাচার্য্য তৎসম্পাদিত ‘সম্বাদ রসরাজ’ পত্রে কতকগুলি কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করার অপরাধে নূতন ফৌজদারী বিধিগত দণ্ড হইয়া জেলে গমন করিলে, কালীপ্রসন্নই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে জামিনে খালাস করেন। এই সম্পর্কে ৯ জুন ১৮৬২ তারিখের ‘হিন্দু পেট্রিয়টে’ নিম্নের সংবাদটি প্রকাশিত হয় :—

The same paper [*The Sajjan Ranjan*] mentions that Baboo Kali Prosunno Sing has got the editor of the *Russoraj* released from jail by paying into Court the adjudged amount for bail for his appearance during trial.

বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ দ্বারা স্বদেশের অশেষবিধ কল্যাণের কথা স্মরণ করিয়া কালীপ্রসন্ন সময়ে সময়ে এই সকল পত্রিকার উন্নতিবিধানের জন্য অর্থসাহায্য করিতেন। ইহার দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

(ক) ১৮৬১ সনের মে মাসে ‘ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্র’ নামে রাজনীতি-সংক্রান্ত একখানি পাক্ষিক সমাচার পত্র তারকচন্দ্র চূড়ামণির সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। এই পত্র প্রকাশে সাহায্যার্থ কালীপ্রসন্ন সম্পাদককে পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছিলেন। (‘সোম-প্রকাশ’, ১ জুলাই ১৮৬১)

(খ) ১৩ অক্টোবর ১৮৬২ তারিখে ‘সোমপ্রকাশ’-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, জোড়ানাকোহ প্রসিদ্ধ দাতা স্বদেশহিতৈষী

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সোমপ্রকাশের উন্নতির নিমিত্ত ২০০ টাকা দান করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন তত্ত্ববোধিনী সভাকে একটি মুদ্রাযন্ত্র দান করিয়াছিলেন (১৮৫৬ সনে ?) বলিয়া জানা যায়। শ্রীযুক্ত চিত্তামণি চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

কালীপ্রসন্ন নিজে একটি প্রেস কিনিয়া তত্ত্ববোধিনী সভাকে দান করেন। তাহা আজও আদি-ব্রাহ্মসমাজের কার্যে লাগিতে রহিয়াছে। তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ঐ সময়ে

মিশিয়াছিলেন। আমাদের বতবুদ্র স্মরণ হয় তাহাতে আদিব্রাহ্মণমাজের ব্যবহারের জন্ত তিনি একটি ঝাড়ু দিয়াছিলেন। সেটা রূপান্তরিত হইয়া আজও সমাজের ত্রিতলে বিরাজমান। মাঘাৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিনায়দানের আংশিক ভারও তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। (‘কালীপ্রসন্ন সিংহ,’ ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’, জ্যৈষ্ঠ ১৮৪২ শক, পৃ. ৩৭)

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, কালীপ্রসন্ন পাঁচ ছয় বৎসর ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই সমাজে নিয়মিত ভাবে অর্থ দান করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ শকের কার্তিক সংখ্যা (১৮৫৬) ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় (পৃ. ১০৩) “দানপ্রাপ্তির বিবরণে” “শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ... ১০ টাকা”—এই উল্লেখ পাইতেছি। ১৭৮২ শকের আষাঢ় সংখ্যা (১৮৬০) ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’তে “সাম্বৎসরিক দান। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ... ১৫০” উল্লেখ আছে। ১৭৮৩ শকেও তাঁহার দানের প্রাপ্তিস্বীকার ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’তে পাওয়া যায়। ১৮৫৭ সনে তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রায়ন্ত্রের কার্যের তত্ত্বাবধারণার্থ তিনি অত্যন্ত “যত্নাধ্যক্ষ” নির্বাচিত হইয়াছিলেন (‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,’ ফাল্গুন ১৭৭৮ শক, পৃ. ১৬০)।

কালীপ্রসন্ন যে কেবল বাংলা পত্রিকাগুলিরই প্রতি সদয় ছিলেন একরূপ মনে করিলে অগ্রা্য হইবে। শিক্ষিত স্বদেশবাসী কর্তৃক পরিচালিত ইংরেজী পত্রিকাগুলির প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। ১৮৬১ সনে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *Mookerjee's Magazine* (১ম পর্ব) প্রকাশিত হয়। ইহার মুদ্রণের সাহায্যার্থ কালীপ্রসন্ন স্বয়ং একটি মুদ্রায়ন্ত্র ক্রয় করিয়া শম্ভুচন্দ্রকে যথেষ্ট ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যায়। কিছু দিন পরে, ১৮৬২ সনের মে মাসে গিরিশচন্দ্র বোস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ‘বেঙ্গলী’ নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রের সাহায্যার্থ কালীপ্রসন্ন মুদ্রায়ন্ত্রটি দান করিয়াছিলেন।* সম্ভবতঃ এই প্রসঙ্গেই ‘সোমপ্রকাশ’ ৫ জানুয়ারি ১৮৬৩ তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

বিবিধ সংবাদ।...১৭ই পৌষ বুধবার। আমরা এবারের বাঙ্গালি পত্র পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। সম্পাদক বলেন, স্বদেশহিতৈষী প্রসিদ্ধ দাতা বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ ঐ পত্রের নিমিত্ত একটা স্বতন্ত্র মুদ্রায়ন্ত্রের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। জানুয়ারি মাস অবধি ঐ পত্রের অবয়ব বৃদ্ধি হইবে। কালীপ্রসন্ন বাবুর তুলা সং কার্যো উৎসাহ দাতা লোক অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ ও ‘দূরবীণ’

১৪ জুন ১৮৬১ তারিখে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে পরিবারবর্গের জন্ত তিনি একখানি বাড়ী ও হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস ভিন্ন আর কিছুই সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। এ অবস্থায় ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ের ত্রায় দেশহিতকর পত্রের বিলোপ অবশ্যসম্ভাবী হইয়াছিল। এই সময় কালীপ্রসন্নই ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’কে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রের পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া প্রেস ও পত্রের

* *Memoirs of Kali Prossunno Singh*, p. 48.

সর্বস্বত্ব ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা শুধু পত্রিকাখানি রক্ষা পায় নাই, পরন্তু হরিশ্চন্দ্রের পরিবারবর্গও যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন। স্থানভাবে ‘হিন্দু পেট্রিয়টে’র পরবর্তী ইতিহাস এখানে দেওয়া সম্ভবপর নহে।

হরিশ্চন্দ্রের ত্রায় দেশহিতব্রতের প্রতি কালীপ্রসন্ন বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। স্বহৃৎভাবে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন-স্থাপনে সহায়তার জন্য কালীপ্রসন্ন একখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়া দেশবাসীর প্রতি তাঁহার নিবেদন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ‘হরিশ মেমোরিয়াল ফণ্ডে’ পাঁচ শত টাকা দান করেন; এমন কি হরিশ্চন্দ্র-স্মৃতিমন্দির স্থাপনার্থ বাহুড়াবাগানে দুই বিঘা জমি দান করিবার প্রস্তাব করিয়া স্মৃতি-সমিতিতে ৯ নবেম্বর ১৮৬২ তারিখে পত্র লিখিয়াছিলেন। সমিতি এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই।

নীলকর-অত্যাচার প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র ‘হিন্দু পেট্রিয়টে’ আর্চিবল্ড হিল্‌স নামে এক জন সাহেব কর্তৃক হরমণি নামী এক রমণীর সতীত্বনাশের উল্লেখ করেন। হিল্‌স হরিশ্চন্দ্রের নামে মানহানির মকদ্দমা করিয়াছিলেন। ১৮৬২ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারি আলীপুরে এই মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় এবং বাদী মকদ্দমার খরচখরচার ডিক্রী পান। হরিশ্চন্দ্র তখন মৃত; কয়েক শত টাকা মকদ্দমা-খরচের দায়ে তাঁহার বাড়ীখানি বিক্রয় করিবার কথা হইতেছিল। এই সময় কালীপ্রসন্ন হরিশ্চন্দ্রের গৃহরক্ষা-তহবিলে শত মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৩ তারিখের ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রে প্রকাশ :—

বঙ্গালী বলেন হিল সাহেবের মকদ্দমায় মৃত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যে বাটী বিক্রয়ের কথা হইতেছিল, ঐ বাটী রক্ষার্থ এক্ষণে ৫১৬ টাকা চাঁদা হইয়াছে। বাহারা এই চাঁদায় দান করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ও বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দানই উচ্চ হইয়াছে। তাহাদিগের প্রত্যেকের দান ১০০ টাকা।

বালীপ্রসন্ন এক সময় আর একখানি সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া উহার পরিচালনে সহায়তা করিয়াছিলেন।* এই কাগজখানির নাম ‘দূরবীণ’, ইহা ফার্সী সংবাদপত্ররূপে ১৮৫৪ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়।†

দুর্ভিক্ষে দান

দানবীর কালীপ্রসন্ন জাতিনির্বিশেষে দান করিতেন। ১৮৬২ সনে ল্যাক্সাশায়ার দুর্ভিক্ষ-

* “His patronage of the press was catholic, for he extended it even to that Urdu newspaper, the *Doorbin*, the proprietary right in which he bought at the instance of a Mahomedan friend [Nawab Abdul Latif Khan Bahadur.] —*The Hindoo Patriot* for July 25, 1870.

† “পারস্য ভাষায় দূরবীণ নামে এক নূতন পত্র প্রকাশারম্ভ হইয়াছে তাহার লেখা অতি উত্তম, তাহাতে নানা স্থানের সংবাদাদি প্রকাশ হইয়া থাকে আমরা ঐ পত্রের দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পরিমাণ সিটজানের ত্রায়, প্রতি সপ্তাহে দুই দিবস প্রকাশ হয়, ছাপা অতি উত্তম, মাসিক মূল্য দুই টাকা শত্রু-বাহার-প্রমোজন-হয়-নীমতলার মসজীদ খাটীতে পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।” —‘সংবাদ প্রভাকর’, ২৪ এপ্রিল ১৮৫৪ (১২ বৈশাখ ১২৬১)।

তহবিলে তিনি সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। এই সংবাদ আমরা ১৫ ডিসেম্বর ১৮৬২ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে পাই। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিয়াছিলেন :—

We are glad to see the subscriptions in aid of the Lancashire [Famine] Fund are pouring in rapidly. Some of our leading townsmen have subscribed munificently. Rajah Pertaub Chunder Sing has contributed another thousand. The other one-thousand-wallahs are Rane Surnomoyee, Baboo Prosunno Coomar Tagore, Baboo Kali Prossunno Sing, and Baboo Herallaul Seal. Lesser stars then follow...

১৮৬১ সনে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। ইহার নিবারণকল্পে কালীপ্রসন্ন নিজে সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

একবার উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে খুব দুর্ভিক্ষ হয়। সেই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজে একটা সভা হয়। সেই সভায় পিতৃদেব বেদী হইতে বেরূপ সর্দঙ্গপাশী বক্তৃতা করেন তাহা আমি কখন ভুলিব না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া লোকেরা এমন মুগ্ধ ও উত্তেজিত হইয়াছিল যে, যাহার কাছে যাহা কিছু ছিল, তৎক্ষণাৎ সে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে দান করিল। কেহ আঙ্গুল হইতে আংটি খুলিয়া দিল, কেহ ঘড়ি ও ঘড়ির চেন খুলিয়া দিল। আমার স্মরণ হয় কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার বহুমূল্য উত্তরীয় বস্ত্র (বোধ হয় শাল) তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দান করিলেন। (“পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি,” ‘প্রবাসী’, মাঘ ১৩১৮, পৃ. ৩৮৯-৯০)

জনহিতকর কার্যে দান

কলিকাতায় যখন বিশুদ্ধ পানীয় জলের সৃষ্টি হয় নাই, তখন কালীপ্রসন্ন বিলাত হইতে চারিটি ধারায়ন্ত্র আনাওয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়’ ৬ ডিসেম্বর ১৮৬৫ তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দত্ত দুই সহস্র টাকা দ্বারা ইংলণ্ড হইতে ধারায়ন্ত্র ৪টি আনয়ন করা হইয়াছে। উহার ব্যয় সর্বশুদ্ধ ২৯৮৫৯/০ আনা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্থাপনের ব্যয় স্বতন্ত্র দেওয়া হইবে।*

স্বাভ্যাসোৎসাহ

স্মরণ মর্ডান্ট ওয়েলস্ স্প্রিং কোর্টের বিচারাসন হইতে প্রায়ই বলিতেন বাঙালী মিথ্যাবাদী ও প্রতারণক। নীলদর্পণ-মকদ্দমায়ও তিনি এইরূপ কটুবচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সমগ্র জাতিকে এরূপভাবে অপমানিত করায় তাঁহার বিরুদ্ধে চারি দিকেই অসন্তোষের গুঞ্জনধ্বনি

* ১১ ডিসেম্বর ১৮৬৫ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে প্রকাশ :—We are glad to notice that the Town will be soon provided with four drinking fountains, the cost of which has been defrayed by Baboo Kaliprossunno Sing with his usual liberality. The same gentleman we are told has applied to Emperor Napoleon for permission to translate into Bengalee his Imperial Majesty's Life of Julius Caesar.

এই প্রসঙ্গে ২৫ এপ্রিল ১৮৬৪ ও ১৩ এপ্রিল ১৮৬৮ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' দ্রষ্টব্য।

শোনা যাইতে লাগিল। ২৬ আগষ্ট ১৮৬২ তারিখে দেশীয় নেতৃবর্গ রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে এক বিরাট সভা করিলেন। নির্ভীক কালীপ্রসন্নও এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন; শুধু যোগদান করিয়াছিলেন বলিলে ঠিক হইবে না,—বাঙালী-চরিত্রে অযথা কলঙ্ক-লেপনের জ্ঞাত্তি তিনি বিচারপতি ওয়েলসের বিরুদ্ধে এই জনসভায় বক্তৃতা করিতেও শঙ্কিত হন নাই। সভায় রাজা রাধাকান্ত দেব, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

ওয়েলসের বিরুদ্ধে বহু সহস্র লোকের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মারফৎ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬১ তারিখে বিলাতে সেক্রেটারী-অব-ষ্টেট শ্রুর চার্লস উডের নিকট পাঠান হইল। এই আবেদনের উত্তরে পরবর্তী ২৪ ডিসেম্বর তারিখে শ্রুর চার্লস উড গবর্নর-জেনারেলকে লেখেন :—

2. I regret that any language used on the Bench of Justice should be supposed by any persons to convey general imputations on the moral character of the whole Native inhabitants of Bengal...

3. I will conclude by expressing a hope that the feelings of which this memorial contains the evidence, may of themselves subside with time and reflection, that those who hold the Judicial office may be sensible of how great importance it is that their denunciations of crime may not be interpreted into hasty imputations against a whole people or country.*

কালীপ্রসন্নের ‘হতোমে’র ভাষায় “সেই অবধি ওয়েলসও ত্রেক হলেন”।

১৮৬৩ সনে ওয়েলস যখন এদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন যাহারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কালীপ্রসন্নও অন্যতম।† ইহা তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব বলিতে হইবে।

প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসন্ন মনে মনে ইংরাজ-বিদ্বেষ পোষণ করিবার মত অহুদার ছিলেন না। বরং দেখা যায়, যে-সকল ইংরেজ এদেশের হিতসাধন করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে মোটেই পশ্চাদ্গত হন নাই। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ক্ষমাশীল ব্যবহারের জ্ঞাত্তি লর্ড ক্যানিং এদেশবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি বহু ইংরেজের—বিশেষতঃ বণিক-সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন ক্যানিংয়ের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবিত ছিলেন। তিনি একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন; পুরস্কারের বিষয় ছিল—“শ্রীযুক্ত লর্ড ক্যানিং বাহাদুর ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশের কি কি উপকার করিয়াছেন, ...শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাহার উত্তর লিখিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।” পুরস্কৃত রচনাটি ‘লর্ড কেনীং’ নামে ১৮৬১ সনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।‡

* ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৬২ তারিখের ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ দ্রষ্টব্য।

† ‘সোমপ্রকাশ’, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬৩, পৃ. ৬৫৯ দ্রষ্টব্য।

‡ ‘সোমপ্রকাশ’, ৮ জুলাই ১৮৬১।

ইহার পর লর্ড ক্যানিংয়ের স্বদেশগমনের সঙ্কল্পের কথা যখন প্রচারিত হইল, তখন তাঁহাকে কি ভাবে সম্মানিত করা যায়, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্ত টাউন-হলে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬২ তারিখে এক বিরাট জনসভা হয়।* এই সভায় স্থির হয়, রাজা রাধাকান্ত দেব, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, মৌলবী আবদুল লতীফ প্রমুখ নেতৃবর্গ লর্ড ক্যানিংয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া এদেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে একখানি মানপত্র দিবেন। এই সকল দেশনায়কের দলে কালীপ্রসন্নও ছিলেন। পরবর্তী ১৪ই মার্চ লর্ড ক্যানিংকে মানপত্র দেওয়া হয়। সভায় আরও স্থির হইয়াছিল, চাঁদা তুলিয়া লর্ড ক্যানিংয়ের একটি মন্দির-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই স্থতিরক্ষাকল্পে কালীপ্রসন্ন সহস্র মূদ্রা দান করিয়াছিলেন।*

নীলকর-গীড়িত প্রজাদিগের দুঃখমোচনকারী লেফটেন্যান্ট গবর্নর স্তর জন্ পীটার গ্রান্ট যখন এদেশ ত্যাগ করেন, সেই সময় তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দনপত্র দিবার জন্ত দেশের যে-সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি ২২ এপ্রিল ১৮৬২ তারিখে বেলভিডিয়ায় হাউসে সমবেত হইয়াছিলেন, কালীপ্রসন্ন তাঁহাদের অন্ততম।† গ্রান্ট সাহেবের অরণ্যার্থ তহবিলেও কালীপ্রসন্ন শত মূদ্রা দান করিয়াছিলেন।‡

স্বনামধন্য অধ্যাপক ডি. এল. রিচার্ডসন যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন যে-সকল কৃতবিত্ত ব্যক্তি তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র ও পাথেরস্বরূপ কয়েক সহস্র মূদ্রার থলি প্রদান করেন, কালীপ্রসন্ন ও তাঁহাদের মধ্যে এক জন।

বিচারকের কার্য

১৮৬৩ সনে কালীপ্রসন্ন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ও জুডিস অব দি পীস নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৪ মে ১৮৬৩ তারিখের ‘সোমপ্রকাশে’ প্রকাশ :—

আমরা শুনিয়া আশ্চর্যিত হইলাম শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ অনরারী ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন অনেক বার অস্থায়ী ভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যও করিয়াছিলেন। ৩ জুন ১৮৬৫ তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ প্রকাশ, “কলিকাতা পুলিশের প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট ব্রান্সন সাহেব অধ্ব হইতে পতিত হইয়া বিচারালয়ে আসিতে অশক্ত হওয়ায় অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার কার্য করিতেছেন এবং ব্রান্সন সাহেবের নিয়োগের পূর্বে সিংহ মহাশয় ঐ পদে কিছু দিন কার্য করিয়াছিলেন।”§ ১৮৬৪ সনেও তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে দুই মাস কাজ করিয়াছিলেন; ৩১ অক্টোবর ১৮৬৪ তারিখে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ লেখেন :—

Baboo Kally Prossunno Sing has been requested by the Commissioner of Police to officiate for Mr. Dickens, the Southern Divisional Magistrate,

* ৩১ মার্চ ১৮৬২ তারিখের ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ দ্রষ্টব্য।

† The Indian Field for 26 April 1862.

‡ ৬ জুলাই ১৮৬৩ তারিখের ‘সোমপ্রকাশ’ দ্রষ্টব্য।

§ “সংবাদ প্রভাকরে বাংলার পুরাতনী,” ‘ভারতবর্ষ,’ ভাদ্র ১৩০৯, পৃ. ৪৫৪।

for two months. It is but bare justice to the Bahoo to say that he has taken the shine out of all the Honoraries of Calcutta, whether European or native, and the public spirit which he is exhibiting by thus employing his leisure for the benefit of the public is indeed entitled to high commendation.

বিচারকার্যে কালীপ্রসন্নের সুনাম ছিল। সে-যুগের সংবাদপত্রে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ২০ আগষ্ট ১৮৬৪ তারিখের ‘ইণ্ডিয়ান ফীল্ড’ নামক ইংরেজী সংবাদপত্রে নিম্নোক্ত অংশটি প্রকাশিত হয় :—

News of the Week. Saturday, 20th August.—The *Lahore Chronicle* thus speaks of the impartial decision of a case by our energetic Honorary Magistrate Baboo Kali Prosonno Singh :—We quote the following Police Report from the *Englishman*, not because the Honorary Magistrate by whom it was tried is a Bengalee gentleman of independent and self-reliant character—Baboo Kali Prosono Sing—who won't allow himself to be turned from doing what he believes to be—and what we believe was—right even by the arguments of a High Court practitioner. Our contemporary should know that Baboo Kali Prosono has become since his accesssion to the Honorary Magisterial bench of Calcutta a terror to Bengalee Villains and European rogues.

১২ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখের ‘হিন্দু পেট্রিয়টে’ কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে :—

A blind beggar was the other day brought up before Baboo Kali-prosonno Singh, Honorary Magistrate, on a charge of begging for alms in the Streets. The appearance of the man at once excited the sympathy of the Magistrate who far from punishing him gave him a donation of 2 Rs. out of his own pocket and promised him a monthly relief of one Rupee. A letter to the Secretary of the District Charitable Society was also directed to be written. We wish however the Magistrate had shown some sense of his displeasure to the over-zealous Police Officer, who hauled up a blind man for begging.

আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৫ তারিখে কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে ‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়’ পত্রে নিম্নাংশ প্রকাশিত হয় :—

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ।—ডেলি নিউসের একজন পত্র প্রেরক বলেন, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট একদিন মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বিচার কালে হেলথ আফিসার ডাক্তার টনিয়র সম্মুখে ছিলেন; ডাক্তার টনিয়র বলিলেন নেটবদিগের সাক্ষ্য বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই কথায় কালীপ্রসন্ন বাবু বলেন, অনেক মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত মোকদ্দমা আমার নিকট উপস্থিত হয়, অতএব আমি কোন মিউনিসিপ্যাল আফিসারের কথা শুনিয়া তাহার বিচার করিব না। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীদিগের সাক্ষ্যও আমি অগ্রাহ্য করিব না। সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় সাক্ষিদিগের কথা যত দূর বিশ্বাস করি, সম্ভ্রান্ত দেশীয় লোকের কথা তত দূর বিশ্বাস করিব। একটুকুও ন্যূন করিব না। টনিয়র সাহেব দেখি দ্বিতীয় ওয়েলস্ হইলেন।

স্মৃতি

২৪ জুলাই ১৮৭০ (৯ আশ্বিন ১২৭৭) তারিখে কালীপ্রসন্ন অপুত্রক অবস্থায় অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' বাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে সেটি উদ্ধৃত করা হইল :—

Among the wealthy and aristocratic classes of Calcutta there are few, young or old, that could equal the accomplishments of Kali Prossono Singh, whose death during the last week it is our melancholy duty to record. The only son of a wealthy father, he left his college studies while very young, and his character gave little indication of any future worth or usefulness. But as he with increased years imbibed a taste for the pleasures of opulence and youth, he also imbibed higher and more refined tastes, and became such an ardent lover of literature and wit as few of his class have ever seen. His celebrated translation of the *Mahavarata*, which before his time never stood in decent Bengali, and the free distribution of the fifteen volumes of his great work, made him popular with every native of Bengal that could spell a sentence of his mother-tongue. His exquisite sketches of Calcutta society published under the humorous title of *Hootum* are inimitable, and would not, we advisedly say, dishonor the genius of a Swift or a Dickens. He it was who originally introduced into Bengal the taste for indigenous theatricals, and his translation of *Vikramorvasi* was the first play ever represented in a Bengali stage. He started a daily vernacular newspaper, under the model of English journalism, called the *Paridarshaka*, for some time conducted the well-known Bengali monthly journal *Vividartha Sungraha*, and when the *Hindoo Patriot* was on the verge of ruin, he rescued it at great expense, and entrusted it to competent hands. Nor was he wanting in public spirit. The ardent co-operation which he rendered to Dr. Duff during Famine of 1861 in the N. W. Provinces, the ready help which Mr. Long received from him during the *Nil Durpan* troubles, and the munificent gift of the stone fountains which he made to the Municipality amply testify to this. Handsome, young, rich, and generous he was ever a prey to the temptations that infest native society, and to nothing more than the dreadful vice of intemperance. Last Sunday at about 3 o'clock P. M. he died of a disorder of the liver brought on by his excesses, in the 29th year of his age.—*The Indian Mirror* for 29 July (Friday), 1870.

উপসংহার

কালীপ্রসন্ন সিংহের বহুমুখী প্রতিভা এবং আরক্ত ও অসম্পূর্ণ বহুবিধ কীর্তির এই সংক্ষেপ-পরিচয়ের মধ্যে সমগ্র মানুষটির যে রূপ প্রায় সপ্ততি বৎসরের ব্যবধানেও আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে, কলিকাতার ধনী জমিদার বা বাবুসম্প্রদায়ের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ একক এবং তৎকালীন বৃহত্তর বাঙালীসমাজে তাহা অনন্তসাধারণ। অকালমৃত্যু তাঁহার মূল্যবান

জীবনকে মধ্যপথে খণ্ডিত করিয়া বাংলাদেশ ও জাতিকে যে কতখানি বঞ্চিত করিয়াছে, এই অসম্পূর্ণ ইতিহাস হইতে আমরা তাহা উপলব্ধি করিয়া আজিও ক্ষুব্ধ না হইয়া পারি না। এই সামান্য পরিচয় হইতেই আমরা নিঃসন্দেহে আজ বলিতে পারি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালীর সামাজিক জীবনের বহুবিধ সংস্কার ও উন্নতির ভিত্তিমূলে যুবক কালীপ্রসন্নের নাম চিরকাল ক্ষোদিত থাকিবে; তাহার হৃদয়ের উদারতা, স্বদেশপ্রেম ও স্বাভাৱ্যবোধ, শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য ও সমাজ সংস্কারে তাহার দূরদর্শিতা ও অধ্যবসায় তাহার অসাধারণ প্রতিভার সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহাকে চিরদিন আমাদের স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

কালীপ্রসন্ন যে আদর্শ অনুসরণ করিয়া জীবনে চলিতে চাহিয়াছিলেন, তদানীন্তন সুখবিলাসলালিত ধনি-সন্তানদের তাহা কল্পনার অতীত ছিল; তাহার জীবনে এই আদর্শ পরিপূর্ণতা লাভ করিলে বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ইতিহাস আরও কিছুপরিমাণ গৌরবময় হইত। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু এদেশের পক্ষে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা।

মহাভারতের উপসংহারে কালীপ্রসন্ন আপন জন্মভূমির উন্নতি বিষয়ে যে কামনা করিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া প্রসঙ্গের শেষ করিতেছি,—

জগদীশ্বরসমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, দেশীয় ক্ষমতাশালী ধনবান ব্যক্তির কায়মনে জন্মভূমির উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হইয়া ধনের সার্থকতা সম্পাদনপূর্বক অধিনায়ক সংকীর্ণ লাভ করুন। তাহাদিগের যশঃসৌরভে ভূমণ্ডল পরিপূরিত হউক। বিদ্যার বিমলজ্যোতি সাধারণের হৃদয়নিহিত মোহান্ধকার দূর করুক। দীর্ঘকালমলিনা ভারতবর্ষের সৌভাগ্য দিন দিন নবোদিত শশিকলার স্থায় বৃদ্ধি হউক। সহৃদয় সাধু জনেরা নিরাপদে চিরদিন স্বদেশীয় সাহিত্যরসাস্বাদনে কালতিপাত করুন এবং শত শত অনুবাদক, গ্রন্থকার ও কবিবরেরা জন্মগ্রহণ পূর্বক ভাষাদেবীরে অনুপম অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া সাধুসমাজের মনোরঞ্জন করত অমরতা লাভ করুন।

শ্রী ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দু জ্যোতিষে শককাল

প্রস্তাবনা—সংশয়

হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে সাধারণতঃ শককালের উল্লেখ দ্বারা সময় নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। মাত্র দুচার স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। যথা, আচার্য্য আর্যভট্ট লিখিয়াছেন, ৩৬০০ কল্যাণে তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর ছিল।^১ কালিদাস নামে জনৈক গণক লিখিয়াছেন যে, ৩০৬৮ কলিকালে তিনি ‘জ্যোতির্বিদ্যভরণ’ প্রণয়ন করেন।^২ টীকাকার মন্নিভট্ট একটা উদাহরণে “হংসোভব” (৪৪৭৮) কল্যাণের ব্যবহার করিয়াছেন।^৩ শতানন্দ- (১০২১ শক) প্রমুখ দুতিন জন জ্যোতিষী কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে শকাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন।^৪ এতদ্ব্যতীত আর কোথাও শকাব্দ ভিন্ন কল্যাণ বা অপর কোন অব্দের প্রয়োগ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। হিন্দুস্থানে বহু অব্দের প্রচলন আছে। বিভিন্ন প্রদেশে লোকসাধারণ বিভিন্ন অব্দের প্রতি বিশেষ অহুত। আবার বিক্রমাব্দ বা সংবৎ সমধিক প্রসিদ্ধ। অথচ জ্যোতিষশাস্ত্রে সর্বত্র শকাব্দ ব্যবহৃত হয় কেন? উহার মধ্যে হিন্দুজ্যোতিষের কোন অজ্ঞাত পুরাকাহিনী নিহিত আছে কি? অধিকাংশ পণ্ডিতবর্গ মনে করেন যে, জ্যোতিষের শকাব্দ এবং প্রচলিত শকাব্দ—যাহা সাধারণতঃ শালিবাহনশকাব্দ নামে পরিচিত—অভিন্ন। উহার আরম্ভ ১৩৫ বিক্রমসংবতে বা ৭৮ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু কেহ কেহ উহাতে সংশয় করেন। তাঁহারা বলেন, অন্ততঃ আচার্য্য বরাহমিহির কর্তৃক ব্যবহৃত শককালের আদি উহা হইতে পারে না। ঐ শকাব্দের আরম্ভ কখন হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের বিভিন্ন জনে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন বটে। কিন্তু উহা যে, প্রচলিত শককাল হইতে ভিন্ন, উহার আরম্ভ যে ১৩৫ বিক্রমসংবতে নহে, এ বিষয়ে তাঁহাদের সকলে একমত। আমরা এখানে ঐ বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। প্রচলিত শকাব্দ কে প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা এখনও নিঃসন্দেহরূপে নিশ্চিত হয় নাই। উহা শালিবাহনশকাব্দ নামে খ্যাত। কিন্তু ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রাজা সাতবাহন বা শালিবাহন উহার প্রবর্তক কি না, সন্দেহ। এ

১। ‘আর্যভট্টীয়’, কালক্রিয়াপাদ, ১০ম শ্লোক। এ বিষয়ে লেখকের “আচার্য্য আর্যভট্ট ও তাঁহার শিষ্টানু-শিষ্যবর্গ” নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (‘সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা’, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ১২৯-১৩০ পৃষ্ঠা; বিশেষত, ১২৯ পৃষ্ঠা।

২। “বর্ষে সিন্দুরদর্শনাঘরগণৈর্ঘাতে কলৌ সন্নিতে।

মাসে মাধবসংজ্ঞিতেহত্র বিহিতৌ গ্রহক্রিয়োপক্রমঃ ॥”

‘জ্যোতির্বিদ্যভরণ’, ২২।২১

এই বচনানুসারে ৩৪ (= ৩১০২—৩০৬৮) খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কালিদাস জীবিত ছিলেন। উহা সত্য নহে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি বস্তুতঃ ১১০০ শকের প্রায়কালে লোক।

৩। ‘সিদ্ধান্তশেখর’, ২।৩২ (টীকা)

৪। শতানন্দকৃত ‘ভাস্করী’, ১।১-৩।

দেশের প্রাচীন জ্যোতিষিগণ এই বিষয়ে কি বলিয়াছেন, আমরা প্রসঙ্গক্রমে তাহাও সংগ্রহ করতঃ এখানে লিপিবদ্ধ করিব। ষাঁহারা উহার বিশেষ চর্চা করেন, হয় ত তাহাদের কোন উপকারে আসিবে।

সংশয়ের হেতু—একাধিক শককাল

প্রধানতঃ তিনটা হেতুতে বরাহমিহিরের শককাল সম্বন্ধে লোকের মনে সংশয় জন্মিয়াছে। প্রথমতঃ, একাধিক শকাব্দের সম্ভাব। দ্বিতীয়তঃ, বিশিষ্ট নামোল্লেখের অভাব। এবং তৃতীয়তঃ দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনীধারার স্থলে স্থলে সংমিশ্রণ।

বিখ্যাত ফরাসী পুরাতত্ত্ববিদ ফিনো লিখিয়াছেন যে, কথোজ দেশের লাউ প্রদেশের অধিবাসিগণ তিনটা শককালের ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা, চুল্লশকরাজ, মহাশকরাজ ও বুদ্ধশকরাজ। উহাদের প্রারম্ভ যথাক্রমে ৬৩৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে, ৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ তারিখে এবং ৫৪৪ খৃষ্টপূর্বাব্দের বৈশাখ মাসে ভগবান বুদ্ধের নির্বাণের পরের দিনে। দ্বিতীয়টা বিশেষভাবে শিলালেখাদিতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা যায়, বুদ্ধদেবের নির্বাণ হইতে একটা অব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। এবং উহাকেও ‘শক’ বলা হইত। প্রাচীন কথোজ দেশ হিন্দুস্থানেরই উপনিবেশবিশেষ। সুতরাং হিন্দুস্থানেও এক সময়ে এই শকব্রয় প্রচলিত ছিল। বোধ হয় ‘যুধিষ্ঠিরশক’র ব্যবহারও কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়।^৫ কালিদাস গগক (১১০০ শক প্রায়) লিখিয়াছেন,—

“যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনো নরাধিনাথো বিজয়াভিনন্দনঃ।

ইমেহন্ত নাগার্জুনমেদিনীবিভূবলিঃ ক্রমাৎ ষট্ শককারকাঃ নৃপাঃ ॥”^৬

‘যুধিষ্ঠির, বিক্রম, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জুন ও বলি (বা বঙ্কি), এই ছয় জন রাজা শককারক।’ মুনীশ্বর ও (১৫৫৩ শক) এই শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি ‘বিক্রমশক’ ও ‘শালিবাহনশক’র নামোল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায় যে, হিন্দুস্থানে একাধিক শকাব্দের সম্ভাব আছে। সময় নির্দেশে এই সকল শকাব্দের নামের ‘যুধিষ্ঠির’, ‘বিক্রম’ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অংশ সর্বদা উল্লিখিত হয় না, দেখা যায়। শুধু শক বা শাক বলিলে লোকে সাধারণতঃ শালিবাহনশককেই বুঝিয়া থাকে।

৫। *Bull. Ecol. Franch. Extr. Orient, XVII, 1917.*

৬। আমরা ‘বোধ হয়’ বলিয়াছি। কারণ, উত্তরভারতে প্রচলিত বুদ্ধনির্বাণাব্দের আদিও যে উহাই, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না (পরে দেখ)।

৭। “The Age of Kalidas” নামক প্রবন্ধে আল্পাশাস্ত্রিধৃত ‘জিনবিজয়’ গ্রন্থের বচন। (‘সংস্কৃত-চন্দ্রিকা’, ৯ম খণ্ড)।

৮। ‘জ্যোতিষবিদ্যাবলী’, ১০।১১০। এই শ্লোকের পাঠান্তর আছে।

“যুধিষ্ঠিরাবিক্রমশালিবাহনো ততো নৃপাঃ স্রাদ্ধবিজয়াভিনন্দনঃ।

ততন্ত নাগার্জুনভূপতিঃ কলৌ বঙ্কিঃ ষড়্ভেতে শককারকাঃ নৃপাঃ ॥”

সেব্রপ সন্ধ্যা বলিলে বিক্রমসংবৎকে বুঝায়। কিন্তু কখন কখন উহার ব্যতিরেকও দেখা যায়। একটা শিলালেখ আছে, উহা ১২৭৫ শাকে, চিত্রভানুসংবৎসরে, মাংগশির্ষা শুক্লা পঞ্চমী, শনিবারে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উহা যে কোন্ 'শক,' তাহা বিশেষ করিয়া নির্দেশিত হয় নাই। কানিংহাম দেখাইয়াছেন, এটা বিক্রমশক বা বিক্রমসংবৎ; শালিবাহনশক নহে। ১২৭৫ বিক্রমসংবৎতেরই বার্ষিক্য সংবৎসরের নাম চিত্রভানু। উহার ধারাবাহিক সংখ্যা, প্রভবাদি গণনায়, ১৬১২৭৫ শালিবাহনশকের বার্ষিক্য সংবৎসর, উত্তরীগণনারীতি মতে, বিকারীন, ৩৩ সংখ্যক; দক্ষিণী গণনারীতি মতে, বিজয়, ২৭ সংখ্যক। উভয়েই চিত্রভানু হইতে বহু ব্যবধানে অবস্থিত।

জ্যোতিষিক শকাব্দ ও কল্যাণ

হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে কলিগত অহর্গন অর্থাৎ কলির প্রারম্ভ হইতে কোন অভীষ্ট সময় পর্যন্ত যত সাবন দিন ব্যতীত হইয়াছে, কলিযুগের সেই অতীত দিনসমূহ গণনার বিধি আছে।^{১০} উহাতে আছে যে, প্রথমে ঐ অভীষ্ট সময়ের শকাব্দের সহিত ৩১৭২ যোগ করিতে হইবে। যথা, বুদ্ধভাস্কর (৪৪৪ শকপ্রায়) লিখিয়াছেন,—

“নবাব্দিক্রপায়াসংযুক্তা মহীভূজাং শকেন্দ্রান্নঃগতবর্ষসংগ্রহাৎ।”^{১০}

“নবাব্দ্যেকায়াসংযুক্তা শকাব্দঃ দ্বাদশাহতাঃ।

চৈত্রাদিমােসংযুক্তাঃ পৃথ্ যুগাধিকৈঃ ॥”^{১১}

অপর জ্যোতিষিগণও তাহাই বলিয়াছেন।

“নবাব্দিক্রন্দ্রানলসংযুক্তো ভবেচ্ছকক্ষিতীশাদগণো গতঃ কলেঃ।”^{১২}

—লল (৪২৭ শকপ্রায়)

“কল্পপর্য্যন্তে মনবঃ ঘটকস্য গতচ্চতুষ্টয়ংগজিঘনাঃ।

ত্রীণি কৃতাদীনি কলের্গোহশৈকগুণাঃ শকান্তেহদ্বাঃ।

নবনগশশিমুনিকৃতনবযমনগানন্দেন্দব শকনূপান্তে ॥”^{১৩}

—ব্রহ্মগুপ্ত (৫৫০ শকাব্দ)

“যাতাঃ কলেনবনগেন্দুগুণাঃ শকান্তে”^{১৪}

—শ্রীপতি (২৬১ শক)

১০। গ্রহাদির পরিভ্রমণকালের আরম্ভ হইতে অভীষ্ট মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সাবনদিনসমূহের নাম অহর্গন। সৃষ্টি হইতে বর্তমান চতুষ্টয়ের কলিযুগের আরম্ভ পর্যন্ত কত দিন গত হইয়াছে, তাহা পরিগণিত হইয়া আছে। কলিগত অহর্গন গণনা করিয়া উহার সহিত যোগ দিলেই অভীষ্ট সময়ের অহর্গন পাওয়া যায়। গণনা-লাঘবার্থে এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে।

১০। ‘মহাভাস্করীয়’, ১১৪

১১। ‘লঘুভাস্করীয়’, ১১৪

১২। ‘শিষ্টধীযুক্তি’, ১১৫

১৩। ‘ব্রাহ্মসুটসিদ্ধান্ত’, ১২৬-৭

১৪। ‘সিদ্ধান্তশেখর’, ১২৫; আরও দেখ, ১২৬

“যাতাঃ যগ্ননবো যুগানি ভমিতান্তদযুগাঃ ত্রিভয়ঃ

নন্দাদ্রীন্দুগুণান্তথা শকনৃপস্তান্তে কলবৎসরাঃ ।

গোহন্দ্রিকৃতাস্বদশ্রনগগোচন্দ্রাঃ শকাধাষিতাঃ

সর্বে সঙ্কলিতা পিতামহদিনে স্যার্বর্তমানে গতাঃ ॥”^{১৫}

—(দ্বিতীয়) ভাস্কর (১০৭২ শক)

শতাব্দীর ‘ভাষ্যতীতে’ আছে, ৪২০০ কল্যাদ = ১০২১ শকাব্দ^{১৬} । মল্লিকার্জুন স্থরি ও চণ্ডেশ্বর লিখিয়াছেন,^{১৭}—

৪২৭২ কলিগতাব্দ = ১১০০ শক,

৪২৮৬ কলিগতাব্দ = ১১০৭ শক ।

আরও অধিক বচন উদ্ধার নিম্নয়োজন । এইরূপে দেখা যায়, এ সকল জ্যোতিষিগণ এক বাক্যে প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে, কলির ৩১৭২ বৎসর গতে চৈত্র-শুক্রপ্রতিপদ হইতে শকাব্দের আরম্ভ হয় । সুতরাং কল্যাব্দের আদি নির্ণীত হইলেই হিন্দুজ্যোতিষে ব্যবহৃত শককালের আদিও নির্দিষ্ট হইয়া যায় ।

তাহাদের আরম্ভকাল

হিন্দু জ্যোতিষে সৃষ্টির প্রথম হইতে কালগণনা হইয়া থাকে । ঐ কালকে আবার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগ, মন্বন্তর, কল্প ইত্যাদি প্রকারে বিভাগ করা হইয়া থাকে । এবং তাহাদের প্রত্যেকের পরিমাণও নির্দিষ্ট আছে । সৃষ্টি হইতে কলিযুগের আরম্ভ পর্য্যন্ত ১,২৫৫,৮৮০,০০০ সৌর বৎসর । সৃষ্টির পর সূর্য, চন্দ্র, তাহাদিগের পাতস্থান এবং উচ্চ নীচ বিন্দুগুলি সকলেই পৃথিবী ও অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম বিন্দুর সহিত সমসূত্রপাতে ছিল । সুতরাং সূর্য চন্দ্রাদির গতির হার জানা থাকিলে কলির প্রারম্ভে তাহাদের সংস্থান গণনা করিয়া বলা যায় । বস্তুত হিন্দু জ্যোতিষগ্রন্থে কোন অভীষ্ট সময়ে গ্রহাদির মধ্য-নয়নের বিধি সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে । কোন কোন গ্রন্থে স্পষ্টতই উল্লিখিত আছে যে, কলিযুগের প্রারম্ভে সূর্য্যোদয়সময়ে মধ্য সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহসমূহ সমসূত্রে শূন্য দেশান্তরে অবস্থিত ছিল ।^{১৮} উহা হইতে গণনা করিয়া সুবিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্বিদ বেলি-প্রমুখ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নির্ণয় করেন যে, ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ১৮ (কি ১৯) ফেব্রুয়ারি তারিখে সূর্য্যোদয়ে হিন্দু জ্যোতিষোক্ত কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছে । ঐ সিদ্ধান্ত এখন সকলে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন । তদনুসারে শককালের আদি ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থির হয় । অতএব হিন্দু জ্যোতিষে ব্যবহৃত শককাল ও শালিবাহনশককাল অভিন্ন বলিয়া সিদ্ধ হয় । ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে, যুগমন্বন্তরাদি কালবিভাগ কল্পিত । সেই হিসাবে কলিকালের

১৫। ‘সিদ্ধান্তশিরোমণি’, মধ্যমাধিকারে কালমানাধায়, ২৮শ্লোক ।

১৬। ‘ভাষ্যতী’ ১১২

১৭। শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, “প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্বিদ মল্লিকার্জুন স্থরি,” ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,’

১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ৮৩-৯৪ পৃষ্ঠা ; বিশেষতঃ ৮৪-৫ পৃষ্ঠা ।

১৮। যথা, ‘সিদ্ধান্তশিরোমণি’ ।

আদিও এক প্রকার কল্পিত। শকাব্দের ৩১৭২ বৎসর পূর্বে আকাশে গ্রহাদির অবস্থিতি বস্তুত পর্যবেক্ষণ করত যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা নহে, বোধ হয়।

পৌরাণিক কলিকাল

যুগমন্তরাদি কালবিভাগের উল্লেখ মহাভারত পুরাণাদিতেও পাওয়া যায়^{১৯}। ঐ বিষয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রে সঙ্গ তাহাদের কোন ভেদ নাই^{২০}। কলিযুগের পূর্বে কত কাল গত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও জ্যোতিষশাস্ত্র এবং ইতিহাসপুরাণাদির মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু পুরাণাদিতে বিশেষভাবে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দ্বারা কলিকালের আরম্ভ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, গ্রহাবস্থিতির উল্লেখ নহে। যথা, ‘বিষ্ণুপুরাণে’ উক্ত হইয়াছে,—

“যদৈব ভগবদ্বিষ্ণোরংশো যাতো দিবং দ্বিজ।

বহুদেবকুলোদ্ভূতস্তদৈব কলিরাগতঃ” ৥^{২১}

‘হে দ্বিজ! যে সময়ে ভগবান্ বিষ্ণুর বহুদেবের কুলে জাত অংশ (অর্থাৎ কৃষ্ণ) স্বর্গ গমন করেন, সেই সময়েই কলি আগমন করিয়াছে’।

“যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।

প্রতিপন্নং কলিযুগং..... ৥”^{২২}

‘যে দিন যে সময়ে কৃষ্ণ স্বর্গে গমন করেন, সেই দিন সেই সময়েই কলিযুগ আরম্ভ হয়^{২৩}।’ ভাগবতাদি অপর কোন কোন পুরাণেও ঐ প্রকার উক্তি পাওয়া যায়।^{২৪}

ঐ সকল পুরাণে কিঞ্চিৎ ভিন্ন মতও দেখিতে পাওয়া যায়।

“তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।

তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ৥”^{২৫}

‘হে দ্বিজোত্তম! তাঁহারা (সপ্তর্ষিগণ) পরীক্ষিতকালে কিন্তু মঘায় ছিলেন। তখন দ্বাদশশতবৎসরাত্মক কলি প্রবৃত্ত হয়।’ কলিকালের পরিমাণ দিব্য মানে ১২০০ বৎসর। তাই বলা হইয়াছে, “দ্বাদশশতবৎসরাত্মক কলি” অর্থাৎ ‘যে কলির পরিমাণ

১৯। ‘মহাভারত’, শান্তিপর্ক, ২৩।৩।১১ অধ্যায়, বনপর্ক, ১০৮।২২; ‘বিষ্ণুপুরাণ’, ১।১।১২; ১।৩।৫।

২০। একমাত্র দ্বিতীয় আর্ঘ্যভট্টগৃহীত যুগমন্তরাদি বিভাগ পৌরাণিক মত হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন।

২১। ‘বিষ্ণুপুরাণ’, ৪।২৪।৩৫

২২। ‘বিষ্ণুপুরাণ’, ৪।২৪।৪০। এই শ্লোকাংশ ‘মৎস্রপুরাণ’ (২।৭৩।৪৮) এবং ‘ভাগবতে’ (১২।২।৩৩)ও আছে।

“যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।

প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি শ্রীঃ পুরাণবিদঃ ৥” (ভাগবত)

২৩। ‘বিষ্ণুপুরাণ’, ৪।২৪।৩৬, ৬০৮।৮ প্রভৃতিতেও দ্রষ্টব্য।

২৪। ‘ভাগবত’, ১২।২।৩৩; আরও দেখ ১।৩।৪৫; ১।১৮।৫-৬; ১২।২।২৯; ‘ব্রহ্মপুরাণ’, ২।১৮।৫।

২৫। ‘বিষ্ণুপুরাণ’, ৪।২৪।৩৪ এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ ‘ভাগবতে’ (১২।২।৩১)ও আছে।

১২০০ (দিব্য) বৎসর, সেই কলি।’ ২৬ পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেকসময় হইতে পরীক্ষিত-কাল আরম্ভ। স্মতরাং ঐ বচনের মূলে কলির প্রারম্ভেই পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক হয়। পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেকের কিয়ৎকাল পরে, তাঁহার রাজত্বকালেই কলি প্রবৃত্ত হয়, এরূপও বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পূর্বে যে কলিকাল আরম্ভ হয় নাই, ঐ বচনমূলে তাহা প্রতিপন্ন হয়। কৃষ্ণের দেহত্যাগের অন্তত ছয় মাস পরে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক হয়। স্মতরাং কৃষ্ণের দেহত্যাগের দিনেই যে কলিযুগ আরম্ভ হয়, সে কথা টিকে কই? কৃষ্ণের মাহাত্ম্য খ্যাপনার্থই ঐ প্রকার কল্পিত হইয়াছে কি না, বিবেচ্য। পঞ্চাশ্তরে ‘বায়ুপুরাণে’ আছে,—

“অষ্টাবিংশতিমে তদ্বাপরস্যাংশস্ত সংক্ষয়ে।

নষ্টে ধর্ম্মে তদা জঙ্জে বিষ্ণুর্বৃষ্ণিকুলে প্রভুঃ ॥” ২৭

‘অষ্টাবিংশতিম দ্বাপরের সন্ধ্যাংশ সম্যক্ ক্ষয় হইলে, ধর্ম্ম নষ্ট হয়। তখন ভগবান্ বিষ্ণু বৃষ্ণিকুলে জন্ম গ্রহণ করেন।’ এই মতে কৃষ্ণের জন্মের পূর্বেই কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল।

মহাভারতের মত

কলিকালের আরম্ভ সম্বন্ধে ‘মহাভারতে’ যে প্রমাণসমূহ পাওয়া যায়, এখন আমরা উহাদের আলোচনা করিব। তথায় এক স্থলে আছে, কলি ও দ্বাপরের অন্তরে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হইয়াছিল।

“অন্তরে চৈব সম্ভ্রাণ্ডে কলিদ্দ্বাপরয়োঃ ৬৭।

সমস্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ ॥” ২৮

ঐ কালনির্দেশটি অতি স্থূল, সন্দেহ নাই। কলি ও দ্বাপর যুগের ঠিক সন্ধিকালেই

২৬। কেহ কেহ ‘বিষ্ণুপুরাণের’ এই বচন ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের মতে উহার তাৎপৰ্য্য, পরীক্ষিতের সময়ে কলির ১২০০ বর্ষ গত হইয়াছিল। ঐ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। কেন না, উক্ত বচনের ঠিক পূর্ববর্তী শ্লোকে কথিত আছে যে, কৃষ্ণের দেহত্যাগের পরেই কলি প্রবেশ করে। কৃষ্ণের দেহত্যাগের ১২০০ বৎসর পরে পরীক্ষিত বর্তমান ছিলেন, ইহা সম্ভব নহে। ভাগবতের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন,—“দ্বাদশাংশতাস্কক ইতি। দিব্যেন মানেন সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশাভ্যাং সহ যো দ্বাদশাংশতাস্ককঃ স কলিঃ তদা” ইত্যাদি। (ভাগবত, ১২।২।৩১)।

২৭। ‘বায়ুপুরাণ, ৯৮।৯৭

২৮। আদিপর্ব, ২।১৩। কোন কোন পুরাণে আছে যে, কৃষ্ণ “দ্বাপরাস্তে” জন্ম গ্রহণ করেন।

“পুরা গগেণ কথিতমষ্টাবিংশতিমে যুগে।

দ্বাপরাস্তে হরের্জন্ম যদোর্ধ্বংশে ভবিষ্যতি ॥”—(বিষ্ণুপুরাণ, ৫।২।৩২৫)

এখানে ‘দ্বাপরাস্তে’ অর্থ দ্বাপরের শেষভাগে, ‘দ্বাপরের শেষ হইলে’ নহে। কেন না, উহার কিঞ্চিৎ পূর্বে বলরামের সহিত রেবতীর বিবাহোপলক্ষে বলা হইয়াছে, “সাস্ত্রতম্ ভূতভেদষ্টাবিংশতিমস্ত মনোচ্চতুর্গমতীত-প্রায়ম্ আসন্নো হি তৎ কলিঃ।” (ঐ, ৪।১।২৩)। স্মতরাং ঐ সময়ে কলি আসে নাই। অতএব কৃষ্ণের জন্ম কলির আগমনের পূর্বে।

- যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহাই বিবক্ষিত কি? যদি উহার কিঞ্চিৎকাল আগে বা পরে হইয়া থাকে, তবে কত কাল অন্তরে হইয়াছিল, তাহা না বলিলে কালজ্ঞান সূক্ষ্ম বলা যাইতে পারে না। কলির পরিমাণ ৪৩২০০০ সৌর বৎসর এবং দ্বাপরের পরিমাণ ৮৬৪০০০ সৌর বর্ষ। তাহাদের সন্ধিসময়ের হাজার দুই হাজার এ দিকে কিম্বা ঐ দিকে কোন ঘটনা ঘটিলেও ঐ দীর্ঘ কালের অপেক্ষায় উহাকে সন্ধিকালের ঘটনা বলা যাইতে পারে। তাই বলিয়াছি, ঐ কালনির্দেশ স্থূল। তবে ‘মহাভারতোক্ত’ অপর প্রমাণ দ্বারা আরও সূক্ষ্ম কাল নিরূপণ করা যায়। মহাযুদ্ধের সময়ে ভীষ্ম দুর্যোধনের নিকটে কৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

“দ্বাপরস্ত যুগশ্চান্তে আদৌ কলিযুগস্ত চ॥

সাত্ত্বতং বিবিমাস্থায় গীতঃ সন্ধর্ষণেন যঃ ॥” ২৯

সেই প্রকার ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন,—

দ্বাপরস্ত কলৈশ্চৈব সন্ধৌ পর্য্যবসানিকে ।

প্রাতুর্ভাবঃ কংসহেতোর্শ্বখুরায়াং ভরিষ্মতি ॥” ৩০

সুতরাং বলরাম ও কৃষ্ণ দ্বাপরের শেষ ভাগে এবং কলির প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। অতএব কৃষ্ণের জীবিতকালেই কলির আরম্ভ হয়।

রাজসুয়মহাযজ্ঞের পর ঈর্ষাবিদগ্ধ দুর্যোধন কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া পুত্রস্নেহদুর্বল ধৃতরাষ্ট্র দ্যুতক্রীড়ায় সম্মতি দেন। তাহা শুনিয়া ধীমান্ বিহুর ভাবিলেন, কলি আসিবার সময় হইয়াছে (“কলিদ্বারমুপস্থিতম্” ৩১)। তাহাতে বোঝা যায়, তখনও কলি আসে নাই।

পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে গন্ধমাদন পর্বতে হনুমান্ ভীমকে বলিয়াছিলেন, অচিরে কলিকাল প্রবৃত্ত হইবে। সাগরলঙ্ঘনকালে হনুমান্ যেই রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ভীম সেই রূপ দেখিতে আগ্রহ করেন। হনুমান্ উত্তর করেন, তাহা সম্ভব নহে। কেন না,—

“কালাবস্থা তদা হস্তা ন সা বর্ততি সাম্প্রতম্ ॥ ৬ ॥

অন্তঃ ক্লতযুগে কালস্ত্রোতায়াং দ্বাপরে পরঃ ।

অয়ং প্রধ্বংসনঃ কালো নাশ তদ্রূপমস্তু মে ॥

...

এতৎ কলিযুগং নাম অচিরাদ্ যৎ প্রবর্ততে ।

যুগানুবর্তনং ত্বেতৎ কুর্বন্তি চিরজীবিনঃ ॥ ৩৮ ॥” ৩২

বনবাসকালে যুধিষ্ঠির যখন গন্ধমাদন পর্বতে প্রবেশ করেন, তাহার প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে ধনঞ্জয় তপস্যার্থ গিয়াছিলেন^{৩৩}। অঞ্জলাভানন্তর অজ্ঞানের প্রত্যাগমনের পর

২৯। ভীষ্মপর্ব, ৬৬।৪০। ৩০। শান্তিপর্ব, ৩৩৯।৮৯। ৩১। সভাপর্ব, ৪৯।৫২। ৩২। বনপর্ব, ১৪৯ অধ্যায়।

৩৩। বনপর্ব, ১৪১।৭, আরও দেখ ১৫৮।৩৯, ১৬৪।১৭, ১৭৪।৯।

পাণ্ডবগণ গন্ধমাদন পর্বতে কুবের-প্রদত্ত গৃহে চারি বৎসর বাস করেন। তৎপূর্বে ছয় বৎসর অতীত হইয়াছিল^{৩৪}। স্ততবাং ষষ্ঠ বর্ষের শেষ ভাগে হনুমানের সহিত ভীমের সাক্ষাৎ হয়। তাহার প্রায় আট বৎসর পরে কুরুক্ষেত্র-মহাযুদ্ধ হয়। এইরূপে দেখা যায়, ভারতযুদ্ধের প্রায় আট বৎসর পূর্বেও দ্বাপর যুগ ছিল। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন,—

“সংক্ষেপো বর্ততে রাজন্! দ্বাপরেহস্মিন্নরাধিপ।”^{৩৫}

স্ততরাং তখনও দ্বাপর যুগ বর্তমান।

অপর পক্ষে, যুদ্ধের শেষভাগে কলিকাল প্রবর্তিত ছিল দেখা যায়। মহাসমরের উপসংহারে গদাযুদ্ধে ভীম ছর্ঘ্যোধনের উদ্ধভঙ্গ করেন। নাভির নীচে আঘাত করা গদা-যুদ্ধের নীতি-বিগর্হিত। স্ততরাং উহা অধর্ম। ভীমের এবন্ধিধ অধর্মাচরণে বলরাম অতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। তাঁহাকে শাস্ত করিতে গিয়া কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

“প্রাপ্তং কলিযুগং বিদ্ধি”^{৩৬} ‘কলিযুগ-উপস্থিত হইয়াছে জানিবে।’

তিন মতের পৌরাণিক সমন্বয়

এইরূপে আমরা মহাভারতপুরাণাদিতে কলিযুগের আরম্ভ সম্বন্ধে তিনটি মতের সম্মান পাই। এক মতে কৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে কলিযুগের আরম্ভ। অপর মতে কৃষ্ণের জন্মের পূর্বেই কলি প্রবর্তিত হইয়াছিল। তৃতীয় মতে কলির আরম্ভ কৃষ্ণের জীবনকালেই, তাঁহার দেহত্যাগের প্রায় ছত্রিশ বর্ষ পূর্বে, কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের আরম্ভকালেই হয়। এই শেষোক্ত মতবাদ বিশেষভাবে মহাভারতে এবং প্রথম মতবাদ মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে পরিগৃহীত হইয়াছে। এই বাদত্রয়ের একটা সামঞ্জস্যের আভাসও পুরাণে পাওয়া যায়। যথা বিষ্ণুপুরাণে আছে,—

“যদা স পাদপদ্মাভ্যাং পস্পর্শেমাং বসুন্ধরাম্।

তাবং পৃথ্বীপরিধঙ্গে সমর্থো নাভবং কলিঃ ॥”^{৩৭}

ভাগবতে সেই কথার প্রতিধ্বনি হইয়াছে,—

“যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশ্মাসে রমাপতিঃ।

তাবং কলিবৈ পৃথিবীং পরিক্রান্তং ন চাশকং ॥”^{৩৮}

তথায় আরও স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে (১।১৮।৫)—

“তাবং কলিন্ প্রভবেৎ প্রবিষ্টোহপীহ সর্কতঃ।” ইত্যাদি

এই মতে কৃষ্ণ সশরীরে বর্তমান থাকিতেও কলিকাল স্থল বটে। কিন্তু তখন উহার কোন প্রভাব ছিল না। কৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে কলির প্রভাব বৃদ্ধি পায়; উহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়। তাই পুরাণাদিতে বলা হইয়াছে, তখন হইতেই কলির আরম্ভ।

৩৪। বনপর্ব, ১৭৬।৫।

৩৫। ভীষ্মপর্ব, ১০।১৫; আর দেখ, ১০।৪।

৩৬। শল্যপর্ব, ৬০।২২

৩৭। ‘বিষ্ণুপুরাণ’, ৪।২৪।৩৬।

৩৮। ‘ভাগবত’, ১২।২।৩০।

এই সামঞ্জস্য দ্বারা কলির আদি নিরূপিত হয় না। এমন কি, উহার প্রত্যাসন্ন ফলও পাওয়া যায় না। কেন না, কলির সন্ধ্যার পরিমাণ পুরাণ ও জ্যোতিষের মতে ১০০ দিব্য বর্ষ বা ৩৬০০০ সৌর সংবৎসর। কৃষ্ণের বর্তমান কালে ঐ সময়ের কতটা অতীত হইয়াছিল, উল্লিখিত হয় নাই।

মহাভারতে কথিত আছে যে, দুর্যোধন কলির অংশ। লোকসংহার হেতুই তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

“কলেরংশস্ত সংজ্ঞে ভূবি দুর্যোধনো নৃপঃ।” ইত্যাদি।^{৩৯}

তাহার জন্ম হইতে কলির আরম্ভ কি? কিন্তু এইরূপ অনুমান করিলে অনেক অসঙ্গতি আসিয়া পড়ে।

আধুনিক মত

আধুনিক কালে কেহ কেহ অভিনব প্রকারে মহাভারত ও পুরাণের উক্তিসমূহের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন কালে এদেশে নানা প্রকারের মহাযুগ বা চতুর্যুগ গণনার রীতি ছিল। যথা—চার বছরে যুগ, পাঁচ বছরে যুগ, বার হাজার বছরের মহাযুগ। এ সকল বর্ষ সৌর বর্ষ। চতুর্বর্ষীয়ক যুগের চারি বছর যথাক্রমে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামে অভিহিত হইত। পঞ্চবর্ষীয়ক যুগ গণনায় সত্যাদি বিভাগ হইত না। বার হাজার বছরের মহাযুগে সত্যাদি যুগের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৮০০, ৩৬০০, ২৪০০ ও ১২০০ সৌর বর্ষ। প্রত্যেক যুগে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ যথাক্রমে ৪০০, ৩০০, ২০০ ও ১০০ সৌর বর্ষ। এটাকে মধ্যম যুগ ও চার বছরের যুগকে ক্ষুদ্র যুগ বলা যাইবে। এতদ্ব্যতীত একটা বৃহৎ মহাযুগ গণনার রীতি ছিল। উহাতে কলির পরিমাণ ১২০০ দিব্য বর্ষ বা ৪৩২০০০ সৌর বর্ষ। এ সকল যুগ গণনার উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়। অধুনা যুগ বলিতে সাধারণত বৃহৎ যুগকেই বুঝায়। রায় মহাশয় বলেন, কলিযুগ সত্যই পরীক্ষিত হইতে আরম্ভ। তবে উহা জ্যোতিষিক কলি বা ৩১৭৯ শকপূর্বমুখ কলি নহে। ১২০০ দিব্যবর্ষীয়ক পাদৈকধর্ম কলি বা বৃহৎ কলি। ভীমহতু-মানসংবাদোক্ত কলি ক্ষুদ্র কলি বা কলিবর্ষ। যদি বৃহৎ কলি হয়, তবে বলিতে হয়, ঐ অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত। কৃষ্ণ-বলরাম-সংবাদে কৃষ্ণের মুখে ক্ষীণধর্ম কলিযুগের কথা বসাইয়া কবি আপনাকে অর্বাচীন প্রতিপন্ন করিয়াছেন। “অন্তরে চৈব সস্ত্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োঃ” বাক্যস্থ কলি ও দ্বাপর বর্ষীয়ক। ঐ সময়ে মধ্যম দ্বাপর এবং মধ্যম কলিরও অন্তর ছিল। ইহাই রায় মহাশয়ের সুদীর্ঘ আলোচনার শারমর্ম।^{৪০} অপর পক্ষে, বৈষ্ণব বলেন, চার বছরে মহাযুগ-গণনা রীতি মহাভারতে বস্তুত নাই। কোন কোন বচন হইতে আপাতদৃষ্টিতে আছে বলিয়া মনে হয় বটে। কিন্তু তিনি দেখাইয়াছেন, সূক্ষ্ম বিচার করিলে ঐ অনুমান নির্মূল প্রমাণিত

৩৯। ‘আদিপর্ব’, ৬৭।৮৭। পরমর্ষি ব্যাসও ধৃতরাষ্ট্রকে এরূপ বলিয়াছিলেন। স্ত্রীপর্ব, ৮।২৭

৪০। ‘ভারতবর্ষ’, ২১ (১) ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ৩৬১ পৃষ্ঠা।

হয়।^{১১} আপন কল্পনার সঙ্গে যাহার সঙ্গতি হয় না, তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিলে কোন বাস্তব সামঞ্জস্য হয় না। বিশেষ হেতু ব্যতীত প্রক্ষিপ্ত বলিলে মহা অনর্থের সৃষ্টি হয়।^{১২} ধর্মক্ষীণতার স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় নিশ্চিত হয় যে, হনুমান, অশ্বখামা, ব্যাস ও কৃষ্ণ-কথিত কলি বৃহৎ কলিই। কেহ কেহ মনে করেন যে, ভারতযুদ্ধ শেষ হইবার দেড় মাস পরে কলিযুগ আরম্ভ হয়^{১৩}। মহাভারতের কৃষ্ণোক্তির সহিত ইহার বিরোধ হয়।

• জ্যোতিষে পৌরাণিক প্রভাব

পৌরাণিক কলিকালের প্রারম্ভ এবং জ্যোতিষিক কল্যাদের প্রারম্ভ অভিন্ন কি না, সন্দেহ। অপর কথায়, কুরুক্ষেত্র-মহাসমর কিম্বা কৃষ্ণের দেহত্যাগ ও পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান ৩১৭৫ শালিবাহনশকপূর্বাব্দে (বা ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) ঘটয়াছিল কি না, সন্দেহ। ঐ যুদ্ধ বসন্ত কবে ঘটয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নানা মত আছে। অধিকাংশ আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণের মতে উহা খ্রীষ্টপূর্ব ১৫শ হইতে ১৩শ শতকের ঘটনা। কেহ কেহ ত উহাকে আরও পরেকার বলিয়াও প্রচার করিয়াছেন। সে বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আমাদের পক্ষে বর্তমানে নিম্প্রয়োজন। আমরা প্রসঙ্গক্রমে যথাপ্রয়োজন কোন কোন প্রাচীন মতের উল্লেখ করিব। তৎপূর্বে প্রদর্শন করিব যে, পূর্বোক্ত পৌরাণিক মতের প্রভাব জ্যোতিষশাস্ত্রের উপরও পড়িয়াছে। কোন কোন হিন্দু জ্যোতিষী স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন, কুরুক্ষেত্র-মহাযুদ্ধের সময় হইতেই কলিযুগের আরম্ভ। যথা, আচার্য্য (দ্বিতীয়) আর্ধ্যভট (৪২১ শক) লিখিয়াছেন,—

“কাহো মনবো চ মনুষ্যগ শ্খ গতাশ্চ চ মনুষ্যগ ছনা চ।

কাল্লাদেয়ুর্গপাদা গ চ গুরুদিবসাং ভারতাং পূর্বম্ ॥”^{১৪}

‘ব্রহ্মার এক দিনে ১৪ মনুষ্য এবং এক মনুষ্যের ৭২ মহাযুগ। কল্পের আদি হইতে ৬ মনুষ্য অতীত হইয়াছে। সপ্তম মনুষ্য ২৭ মহাযুগও গিয়াছে। বর্তমান মহাযুগের তিন পাদ ভারত পর্য্যন্ত, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত গিয়াছে।’ সেইরূপ আচার্য্য ত্রীপতি (১৬১ শক) বলেন,—

“বর্তমানে কদিনে মনবঃ ষট্ সপ্তমস্ত চতুর্য়ুগসংখ্যা।

ভৈর্মিতাহল্ চ যুগত্রয়মন্মদ্ ভারতাদ্ গুরুদিনাচ্চ গতং প্রাক্ ॥”^{১৫}

এই দুই স্থলে ‘ভারত’ শব্দে ‘ভারতযুদ্ধ’ গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু সূর্য্যদেব যজ্ঞপ্রমুখ টীকাকারগণ বলেন, ভারতবংশজাত যুধিষ্ঠিরাদিই ভারত। তাঁহাদিগকে উপলক্ষণ করত দ্বাপরের শেষ গুরুদিবসকেই ভারতগুরুদিবস বলা হইয়াছে। ঐ দিনে যুধিষ্ঠিরাদি রাজ্য পরিত্যাগ করতঃ মহাপ্রস্থান করেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে^{১৬}।

৪১। ‘হিন্দী মহাভারত মীমাংসা’, ৪২৬ পৃষ্ঠা। ৪২। ত্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ‘যুধিষ্ঠিরের সময়’ প্রবন্ধ।

৪৩। ‘আর্য্যভট্টীয়’, ১১৩।

৪৪। ‘সিদ্ধান্তশেখর’, ১২৩।

৪৫। ‘ভারতবংশজাত যুধিষ্ঠিরাদয়ো ভারতাঃ ভৈরুপলক্ষিতদ্বাং দ্বাপরাস্তিমো গুরুদিবসো ভারতগুরু-
• দিবসঃ। তস্মিন্ অহ্নি যুধিষ্ঠিরাদয়ো রাজ্যমুৎসজ্য মহাপ্রস্থানং গত ইতি প্রসিদ্ধম্।’ (সূর্য্যদেব)।

ভরতবংশজ বলিলে একমাত্র পাণ্ডবগণকে বুঝাইবে কেন? আসল কথা, পৌরাণিক প্রসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্তই তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া ঐ প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। ‘ভারত’ অর্থে ‘ভারতযুদ্ধ’ ধরিলে কল্যাণের আরম্ভ সম্বন্ধে মহাভারতোক্ত মতবাদের সহিত সামঞ্জস্য হয়।

কালিদাস গণক (১১ শতাব্দী) লিখিয়াছেন,—

“যুধিষ্ঠিরাদে বেগযুগাধ্বনায় (৩০৪৪) কলধবিশ্বে (১৩৫)২ ত্রখথাষ্টভূময়ঃ (১৮০০০)

স্ততোহযুতং লক্ষচতুষ্টয়ং ক্রক্ষাৎ ধরাদৃগষ্টা (৮২১)বিতি শাকবৎসরাঃ ॥”^{৪৬}

সুতরাং যুধিষ্ঠিরাদের ৩০৪৪+১৩৫ বা ৩১৭৯ বর্ষ গতে শালিবাহনাদের আরম্ভ। অতএব এই মতে কল্যাণ ও যুধিষ্ঠিরাদে অভিন্ন দেখা যায়।

জ্যোতিষিক কল্যাণের প্রচার

কালক্রমে পুরাণ-প্রভাবিত জ্যোতিষিক কল্যাণই সর্বত্র প্রচলিত হয়। অপর কথায়, কল্যাণ বলিলে লোকে ৩১৭৯ শকপূর্বাব্দমুখ কলিকেই বুঝিয়া থাকে; এবং ঐ সময়েই ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল কিম্বা যুধিষ্ঠিরাদি মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন মনে করিয়া থাকে।

চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর এক শিলালেখে এক মন্দির নির্মাণের তারিখ আছে।^{৪৭}

ত্রিংশংসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ ।

সপ্তাদশতযুক্তেষু শ (? গ)তেষদেষু পঞ্চসু ॥

পঞ্চাশংসু কলৌ কালে ষট্শ পঞ্চশতায়ু চ ।

সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাং ॥”

ইহাতে স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে যে, ভারতযুদ্ধ হইতেই কলিকাল আরম্ভ হয়। এবং ভারতযুদ্ধ হইতে ৩০+৩০০০+৭০০+৫=শকাব্দ হইতে ৫০+৬+৫০০=সুতরাং শকাব্দের ৩১৭৯ বৎসর পূর্বেই ভারতযুদ্ধ হয় এবং তখন হইতেই কল্যাণ আরম্ভ হয়।^{৪৮}

‘কলিযুগরাজবৃত্তান্তে’ উক্ত আছে,—

“পঞ্চবিংশতিবর্ষেষু প্রযাতেষু কলৌ যুগে ।

যুধিষ্ঠিরজ্ঞাপনার্থে লৌকিকোহন্ধঃ প্রবর্তিতঃ ॥”^{৪৯}

৪৬। ‘জ্যোতির্বিদ্যাবলি’, ১০।১১১

৪৭। *Epigraphia Indica*, III, P.P. 7.

• ৪৮। এই সম্বন্ধে নরসিংহ স্বামী-লিখিত “The Kaliyuga, Yudhisthira and Bharatayuddha Eras” নামক প্রবন্ধ জটব্য। (*Indian Antiquary*, XL, pp. 162—)

নরসিংহ স্বামী লিখিয়াছেন, যুধিষ্ঠির ১৫ বৎসর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাধীনে থাকিয়া এবং ৩৬ বৎসর স্বতন্ত্রভাবে মোট ৫১ বৎসর রাজত্ব করেন। অতঃপর কৃষ্ণের দেহতাগের সমাচার পাইয়া মহাপ্রস্থান করেন। এক কথা সত্য নহে।

৪৯। ‘কলিযুগরাজবৃত্তান্ত’, ৩য় ভাগ, ৩য় অধ্যায়। এই গ্রন্থ আমরা দেখি নাই। অপরের গ্রন্থে অনূদিত বচন এখানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

‘কলিযুগের ২৫ বৎসর গতে যুধিষ্ঠিরের স্বত্বার্থ লৌকিকাব্দ প্রবর্তিত হয়।’ এটা কোন্ কলি? জ্যোতিষিক কলি, না পৌরাণিক কলি, না মহাভারতের কলি? যুধিষ্ঠিরের স্মৃতিরক্ষার্থ প্রচলিত অব্দ তাঁহার তিরোধানের কিছু কাল পরে আরম্ভ হইয়াছিল, এরূপ কল্পনা সমীচীন নহে। তাই বলিতে হয় যে, উহার অব্যবহিত পরে বা তৎপূর্বে উহা প্রবর্তিত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরে রাজ্যভিষেক, অশ্বমেধমহাযজ্ঞানুষ্ঠান, মাতৃশোক, কৃষ্ণশোক, মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ ব্যতীত যুধিষ্ঠিরের জীবনের অপর কোন বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ মহাভারতাদিতে পাওয়া যায় না। যুদ্ধের পর ছয় মাসের মধ্যে যুধিষ্ঠির রাজা হন। তাহার স্বল্পকাল পরে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। যুদ্ধের ১৮ বৎসর পরে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী এবং ৩৬ বৎসরে কৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। উহার অল্প কাল পরে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করেন। সুতরাং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হইতে ২৫ বৎসরে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই, যাহার স্বত্বার্থ একটা নূতন অব্দ প্রবর্তিত হইয়াছিল মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং ঐ বচনোক্ত কলি ‘মহাভারতে’র কলি নহে।

যদি পৌরাণিক কলি হয়, বলিতে হয়, মহাপ্রস্থানের ২৫ বৎসর পরে যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করেন; উহারই স্বত্বার্থ লৌকিকাব্দ প্রবর্তিত হয়। আমরা অগ্রত্ব দেখাইয়াছি, ৫০ মহাপ্রস্থানের দীর্ঘ কাল পরে স্বর্গারোহণ ঘটে। ঐ কাল ২৫ বৎসর হওয়া অসম্ভব নহে। যদি প্রকৃত পক্ষে তাহাই হয়, তবে উক্ত বচনের কলি পৌরাণিক কলি।

যাহা হউক, এ সকল কল্পনা মাত্র। কারণ, অগ্র প্রকারে প্রমাণিত হয় যে, উহা জ্যোতিষিক কলি। লৌকিকাব্দ বিশেষ ভাবে কাশ্মীরেই প্রচলিত। সুতরাং তথ্য হইতেই প্রমাণ সংগ্রহ করা উচিত। স্বকৃত ‘ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা-বিবৃতি-বিমর্শিনী’ বা ‘বৃহতী-বিমর্শিনী’র অন্তে কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ দর্শনাচার্য্য অভিনবগুপ্ত উহার রচনা-কাল নির্দেশ করিয়াছেন।

“ইতি নবতিতমেইশ্বিন্ বৎসরেহন্ত্যে যুগাংশে

তিথিশশিভলধিস্থে মার্গশীর্ষাবসানে।

জগতি বিহিতবোধোঃ ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাঃ

ব্যবহৃত পরিপূর্ণাং প্রেরিতঃ শত্ৰুপাদৈঃ ॥”

এখানে ৪০২০ সপ্তর্ষিসম্বৎ বা লৌকিকাব্দকেই ‘নবতিতম’ বৎসর বলা হইয়াছে। তাহাতে পাওয়া যায়—

(১) ৪০২০ লৌকিকাব্দ = ৪১১৫ কল্যাব্দ

সুতরাং এই কল্যাব্দ এবং ‘কলিযুগরাজবৃত্তান্তে’ উক্ত কল্যাব্দ অভিন্ন। কহলন পণ্ডিত লিখিয়াছেন,—

৫০। “বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের বয়স,” নামক ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’র পরে প্রকাশ্য প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

“লৌকিকাব্দে চতুর্বিংশে শককালস্য সাম্প্রতম্।

সপ্তত্যাভ্যধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরাঃ ॥”^{৫১}

তাহা হইতে পাওয়া যায়,—

(২) ৪২২৪ লৌকিকাব্দ = ১০৭০ শককাল

(১) ও (২) হইতে আমরা পাই—

৪২৪২ কল্যাব্দ = ৪২২৪ লৌকিকাব্দ = ১০৭০ শকাব্দ

• সুতরাং ঐ কল্যাব্দের প্রারম্ভ শকাব্দের ৩১৭২ বৎসর পূর্বে। অতএব উহা জ্যোতিষিক কল্যাব্দ।

অনর্থের উৎপত্তি

কলিকালের প্রারম্ভ সম্বন্ধে জ্যোতিষিক ও পৌরাণিক প্রবাদের সংমিশ্রণের ফলে বড় অনর্থের উদ্ভব হইয়াছে। তাহাতে আচার্য্য বরাহমিহিরের সময় সম্বন্ধে একটা অযথা সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা ক্রমে তাহা প্রদর্শন করিব। বরাহমিহির-বিরচিত ‘বৃহৎসংহিতা’য় কথিত আছে,—

“আসন্ মঘাস্ত মনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতো।

ষড়্ দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ ॥”^{৫২}

নৃপতি যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাশমনকালে সপ্তর্ষিগণ মঘায় ছিলেন। শককালের সহিত “ষড়্ দ্বিকপঞ্চদ্বি” যোগ করিলে ঐ রাজার সময় পাওয়া যায়।^{৫৩} এই বচনটি নাকি ‘গর্গসংহিতা’র। বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় উহার অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র। বরাহের উক্তি (“কথয়িষ্যে বৃদ্ধগর্গমতাত্”) হইতে বুঝা যায়, বৃদ্ধগর্গের মতানুসারে তিনি ঐ প্রকার বলিয়াছেন। কল্লন পণ্ডিতও (১০৭০ শক) স্বপ্রণীত ‘রাজতরঙ্গিনী’তে উহাকে ধরিয়াছেন।^{৫৪} ঐ মতে পাওয়া যায়, “শককালে”র “ষড়্ দ্বিকপঞ্চদ্বি” বৎসর পূর্বে যুধিষ্ঠির জীবিত ছিলেন। উহা যে কোন্ “শককাল”, তাহা বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হয় নাই। তাহাতেই শঙ্কা উৎপত্তির অবকাশ হইয়াছে।

কল্লন মনে করেন, গর্গোক্ত “শককাল” শালিবাহন-শকই ; “ষড়্ দ্বিকপঞ্চদ্বি” = ২৬২৫। তাই তিনি লিখিয়াছেন, কুরুপাণ্ডবগণ ৬৫৩ (= ৩১৭২—২৫২৬) কল্যাব্দে (জ্যোতিষিক) বর্তমান ছিলেন।

৫১। ‘রাজতরঙ্গিনী’, ১।৫২। ৫২। ‘বৃহৎসংহিতা’, ১৩।৩।

৫৩। ‘ঐ রাজার সময়’ বাক্যের তাৎপর্য্য কি, চিস্তনীয়। ঐ সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির বর্তমান ছিলেন, এই সাধারণ অর্থেই উহাকে গ্রহণ করিতে হইবে? • না কি ‘যুধিষ্ঠিরাব্দ’ই উহার বিবক্ষিত মর্ম্ম? এই শেষোক্ত অর্থে গ্রহণ করিলে বুঝিতে হয় যে, শকাব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দের অন্তর নির্দেশ করাই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দের উদ্দেশ্য।

৫৪। ‘রাজতরঙ্গিনী’, ১।৫৬। এই গ্রন্থে “রাজ্ঞশ্চ” স্থলে “রাজ্যাস্ত” পাঠ আছে।

“শতেষু ষট্শু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে ।

কলের্গতেষু বর্ষাণামভুবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥”^{৫৫}

যাঁহারা মনে করেন যে, কুরুপাণ্ডবগণ “দ্বাপরাস্তে” (দ্বাপরের শেষ ভাগে বা কলির প্রারম্ভে) বর্তমান ছিলেন, তাঁহাদিগকে কহলন মোহগ্রস্ত ও মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন ।

“ভারতং দ্বাপরাস্তেহভূদার্তয়েতি বিমোহিতাঃ ।

কেচিদেতাং মুবা তেষাং কালসংখ্যা প্রচক্রিরে ॥”^{৫৬}

এইরূপে দেখা যায়, গর্গোক্তির সার্থক্য রক্ষার জন্ত কহলন পণ্ডিত মহাভারতপুরাণ-পন্থীদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই । কল্যানের আদি সম্বন্ধে তিনি জ্যোতিষিক মত অঙ্গীকার করিয়াছেন ।

শাক্যকালবাদ

পৌরাণিক মতবাদের সঙ্গে কঠোর বিরোধ হয় বলিয়া কেহ কেহ কহলনের ব্যাখ্যা সঙ্গত মনে করেন না । তাঁহারা উক্ত বচনের ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন । তাঁহাদের প্রায় সকলেই কহলনের হ্রায় মনে করেন যে, কল্যানের আরম্ভ শালিবাহন-শকের ৩১৭২ বৎসর পূর্বে । তবে কহলন গর্গবরাহোক্ত শককালকে শালিবাহন-শককাল ধরিয়া যুধিষ্ঠিরের সময় এ দিকে, ৬৫৩ কল্যানে টানিয়া আনিয়াছেন । আর ইহারা ঐ শককালকে শাক্যকাল গ্রহণ করতঃ উহার আদি শালিবাহন-শকারম্ভের পূর্বে ঠেলিয়া নিয়াছেন । তাঁহারা উহাকে বরাহমিহিরের বচন বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন । তাই বলেন, বরাহ কর্তৃক ব্যবহৃত শাককাল শাক্যকালই ।

রামপ্রসাদ বলেন,^{৫৭} বরাহমিহির কর্তৃক ব্যবহৃত শককাল বস্তুত শাক্যকাল । উহা শালিবাহন-শকাদ এবং বিক্রমশকাদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন । উহার আরম্ভ ৬২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, শাক্যমুনি গৌতমের জন্মদিনে । তাঁহার মতে, কুরুক্ষেত্র-মহাসমর ৩১৩৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সংঘটিত হয় ।

গোপাল আয়ার মনে করেন,^{৫৮} গর্গবচনের প্রচলিত পাঠ ভুল । উহাতে ‘শককাল’ স্থলে ‘শাক্যকাল’ পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে । উহার আরম্ভ ৫৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, শাক্যমুনি গৌতমের মহাপরিনির্বাণের দিনে । তাঁহার মতে ‘ষড়্ দ্বিকপঞ্চদ্বিক’ = $২৬ \times ২৫ = ৬৫০$ । সূত্ররাজ যুধিষ্ঠির ৬৫০ + ৫৪৩ অর্থাৎ ১১৯৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জীবিত ছিলেন । অতএব কল্যানের প্রারম্ভ ১১৭৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ।

৫৫। ঐ, ১।৫১,

৫৬। ঐ, ১।৪৫

৫৭। Rama Prasad, “The Date of the Bhagavad Gita,” *Theosophist*, 1908, pp. 512, 619, 708.

৫৮। Gopal Aiyar, *Chronology of Ancient India*; *Indian Review*, Nov, 1909.

অধ্যাপক রামদেব লিখিয়াছেন,^{৫৯} গর্গোক্ত শককাল শাক্যসিংহ বা শকসিংহ গৌতমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাল। গৌতমের ৫০ বৎসর বয়সকালে উহা প্রবর্তিত হয়। গৌতমের জন্ম শালিবাহনাব্দের ৭০১ (= খ্রীষ্টাব্দের ৬২৩) বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। অতএব ৬২৩ - ৪৯ = ৫৭৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ঐ শককাল প্রচলিত হয়। পরে তিনি এই মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করেন। তখন লিখেন,^{৬০} শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের পর যুধিষ্ঠিরের দেহান্ত হয়। ঐ সময় হইতেই কলিযুগের আরম্ভ। উহা ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ঘটে। বরাহমিহিরের মতে যুধিষ্ঠিরের মৃত্যুর ২৫২৬ বর্ষ পরে শককাল আরম্ভ হয়। সুতরাং শককালের আরম্ভ ৩১০২ - ২৫২৬ বা ৫৭৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়^{৬১} গোপাল আয়ারের ভাষ্য, মনে করেন যে, গর্গ-বরাহ-মিহির-ব্যবহৃত শককাল প্রকৃত পক্ষে শাক্য বা বুদ্ধকাল এবং বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দিন হইতেই উহার আরম্ভ। কিন্তু তন্মতে উহার আদি ৫৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং “ষড়্ দ্বিকপঞ্চদ্বি” = ২৫৫৬। তাহাতে যুধিষ্ঠিরের কাল ২৫৫৬ + ৫৪৬ বা ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হয়। এই প্রকারে কল্যাণের আদি এবং যুধিষ্ঠিরের সময় সম্বন্ধে পৌরাণিক প্রবাদেব সঙ্গে ঐ গর্গ-বরাহ-বচনের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়।

পারশ্বশককালবাদ

নারায়ণ শাস্ত্রী বলেন,^{৬২} বরাহমিহিরদ্বারা গর্গবচনোক্ত শককালের আরম্ভ ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। কলিযুগের আরম্ভ ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তাহার ২৬ বৎসর পরে ৩০৭৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, লৌকিকাব্দ বা সপ্তর্ষিকালের আদিতে, যুধিষ্ঠির দেহত্যাগ করেন। গর্গ-বচনের মতে শককালের সহিত ২৫২৬ যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরের সময় পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ শককালের আদি নিশ্চয়ই ৩০৭৬ - ২৫২৬ বা ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এইরূপে নারায়ণ শাস্ত্রী মনে করেন যে, হিন্দুজ্যোতিষে ব্যবহৃত শককালের আদি ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তিনি বলেন, ঐ শকের প্রবর্তক সুপ্রসিদ্ধ পারশ্বরাজ সাইরস। গ্রীক ইতিবৃত্তলেখক হেরোদোটাস ও জেনোফনের বিবৃতি হইতে জানা যায়, ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বীর সাইরস মিডিয়া দেশকে পরাস্ত করতঃ পারশ্ব সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনা করেন। পারশ্বের ইতিহাসে উহা নবযুগের সূচনা করে। উহার স্মৃতিরক্ষার্থ সাইরস এক নবীন সংবৎ প্রবর্তন করেন। ঐ সংবৎ হিন্দুস্থানেও প্রচলিত হয়। এবং উহাই কালক্রমে হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৫৯। শ্রীরামদেব প্রণীত ‘ভারতবর্ষ কা ইতিহাস’, প্রথম খণ্ড, ১৯৬৮ বিক্রমসম্বৎ, ৩৫৮ পৃষ্ঠা।

৬০। ‘ভারতবর্ষ কা ইতিহাস’, তৃতীয় খণ্ড, শ্রীরামদেব ও শ্রীসত্যকেতু বিদ্যালঙ্কার প্রণীত, ১৯৯০ সম্বৎ, ১৩ পৃষ্ঠা।

৬১। D. N. Mukhopadhyaya, “Gupta Era,” *Indian Historical Quarterly*, VIII (1932), pp. 88 ff.

৬২। T. S. Narayana Sastri, *The Age of Sankara*, Part I—A, Madras, 1916, Appendix I, pp. 159 ff; Appendix II, pp. 144 ff.

হিন্দুগণ পারশ্বসংবৎ কেন গ্রহণ করিলেন, তাহার একটা হেতুও নারায়ণ শাস্ত্রী প্রদর্শন করিয়াছেন। সিদ্ধদেশের রাজা ঐ যুদ্ধে সাইরসের বিশেষ সহায়তা করেন; বস্তুত তাঁহার সাহায্যেই সাইরসের বিজয় হয়। গ্রীক ইতিবৃত্তলেখকগণ তাহা লিখিয়াছেন। সেই হেতু ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দকে পারশ্ববাসীদিগের গ্রায় সিদ্ধদেশবাসীরাও গৌরবের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সাইরস-প্রবর্তিত নবীন অশ্বের ব্যবহার করিতে লাগিলেন। পারশ্ব দেশের উত্তরভাগস্থ শকাই প্রদেশ = (সংস্কৃত শাকদ্বীপ) হইতে সাইরসের অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল। সেই হেতু সিদ্ধিগণ তাঁহাকে শক বলিতেন এবং তৎকর্তৃক প্রবর্তিত অন্ধকে শকাদ নামে অভিহিত করেন। ঐ শকাদই কালক্রমে সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রচলিত হয়।

হিন্দুজ্যোতিঃশাস্ত্রে ব্যবহৃত শককাল যে, পারশ্ব শককাল, শালিবাহনশকাদ নহে, তাহার সমর্থনার্থ নারায়ণ শাস্ত্রী নিম্নলিখিত যুক্তি দিয়াছেন।

(১) শককাল হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্রে ‘শকভূপকাল’, ‘শকেন্দ্রকাল’, ‘শকনৃপতিকাল’ প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। তাহাতে বুঝা যায়, উহার প্রবর্তক কোন শকরাজ। বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন শকদিগকে যুদ্ধে পরাজয় ও হত্যা করেন। সেই হেতু তাঁহারা ‘শকারি’ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগের দ্বারা প্রবর্তিত অন্ধকে ‘শকনৃপকাল’ ইত্যাদি বলা যাইতে পারে না।

(২) উৎপল ভট্ট লিখিয়াছেন, ৮৮৮ শকের চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী, বৃহস্পতি বারে তিনি ‘বৃহজ্জাতকবিবৃতি’ প্রণয়ন করেন।

“চৈত্রমাসস্ত পঞ্চম্যাং সিতায়াং গুরুবাসরে।

বস্বষ্টবহ্নিমিতে শাকে রুতেয়ং বিবৃতির্ময়া ॥”

৮৮৮ শক = ৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিলেই যথোক্ত বার ও তিথি ঠিক ঠিক পাওয়া যায়। ৮৮৮ শালিবাহনশকাব্দের (= ২৬৬ খ্রীষ্টাব্দের) চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি বৃহস্পতি বারে নহে। সেই হেতু স্বধাকর দ্বিবেদী^{৬৩} উৎপলের শ্লোকের পাঠ নিম্নপ্রকারে পরিবর্তন করিয়াছেন;—

“ফাল্গুনস্ত দ্বিতীয়ামসিতায়াং গুরোর্দিনে।

বস্বষ্টবহ্নিমিতে শাকে রুতেয়ং বিবৃতির্ময়া ॥”

এই পরিবর্তন গ্রাহ্য নহে। উৎপল ভট্টের মূল উক্তি হইতে সিদ্ধ হয় যে, তাহাতে ব্যবহৃত শাক শালিবাহনশাক নহে। উহার আদি ৮৮৮—৩৩৮ বা ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

(৩) স্বকৃত ‘সিদ্ধান্তশিরোমণি’র উপসংহারে স্বপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ভাস্করাচার্য লিখিয়াছেন যে, ১০৩৬ ‘শকনৃপকালে’ তাঁহার জন্ম এবং ৩৬ বৎসর বয়সে তিনি ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ ‘শকনৃপকাল’কে শালিবাহনশককাল ধরিলে ভাস্করাচার্য বিখ্যাত পারসী পর্যটক

৬৩। স্বধাকর দ্বিবেদিকৃত ‘গণকতরঙ্গিণী’, কাশী, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ, ২২ পৃষ্ঠা।

“নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যাশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যো দিবং গতঃ”^{৬৫}

‘আচার্য্য বরাহমিহির ৫০২ শাকে স্বর্গগমন করেন।’ স্মৃতরাং তিনি ৩৪, ৩৭ বা ৪১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। একটা প্রাচীন কিম্বদন্তী আছে যে, তিনি উজ্জয়িনীর সুবিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নব রত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন। ঐ বিক্রমাদিত্য শালিবাহনশকের ১৩৫ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ৫৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে বর্তমান ছিলেন। পূর্বোক্ত বাদিগণ বলেন, তাঁহাদিগের মতবাদ অল্পসারেই ঐ কিম্বদন্তীর সত্যতা রক্ষিত হইতে পারে। অন্যথা উহাকে অমূলক বলিতে হয়।

রামপ্রসাদের মতবাদানুসারে, ১১৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এবং রামদেবের মতে, ৬৫ কি ৬৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আচার্য্য বরাহমিহিরের মৃত্যু হয়।

শাক্যকালবাদে দোষারোপ—বুদ্ধনির্বাণকাল

বরাহমিহির কর্তৃক ব্যবহৃত ‘শককালে’র (বা শাক্যকালের) আদি সম্বন্ধে সকল শাক্যকালবাদিগণ একমত নহেন। আমরা দেখিয়াছি, উহার আরম্ভ কাহারও মতে ভগবান্ বুদ্ধদেবের জন্মদিনে, ৬২৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে (রামপ্রসাদ) ; কাহারও মতে তাঁহার মহানির্বাণের দিনে, ৫৪৩ (গোপাল আয়ার) বা ৫৪৬ (ঘীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। আবার কাহারও মতে তাঁহার ৫০ কি ৫২ বর্ষ বয়সে, ৫৭৪ কি ৫৭৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে উহা প্রবর্তিত হয় (রামদেব)। ঐ সকল বাদের সত্যাসত্য পরীক্ষার জন্ত বুদ্ধদেবের সময় সঠিক জ্ঞাত হওয়া অত্যাৱশ্যক। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদগণ বুদ্ধের নির্বাণকাল সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের বিভিন্ন জনে বিভিন্ন তারিখ পাইয়াছেন। যথা, খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ৪৭৭, ৪৮০, ৪৮৩, ৪৮৬, ৪৮৮, ৪৮৯, ইত্যাদি।

কানিংহামের বিচারে ৪৭৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে বুদ্ধ নির্বাণলাভ করেন। গয়ায় প্রাপ্ত একটা শিলালেখে উহার লিপিকাল নিম্নপ্রকারে নিবদ্ধ হইয়াছে।

“ভগবতি পরিনির্বৃত্তে সংবৎ ১৮১২ কাৰ্ত্তিক বদি ১ বুধি” ইত্যাদি।^{৬৬}

কানিংহাম গণনা করিয়া বলেন যে, ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবারে ঐ শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তাহাতে পাওয়া যায়, বুদ্ধের নির্বাণ ৪৭৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে হইয়াছিল। এইরূপে কানিংহাম মনে করেন যে, ঐ শিলালিপি তৎকর্তৃক অপর উপায়ে নিরূপিত বুদ্ধনির্বাণকালের সমর্থন করে। স্ফল্লা রাও, ৬৭ কানিংহামের গণনার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

৬৫। ‘ঋগ্বেদ’ আমরাজকৃত টীকা সহ, পণ্ডিত শ্রীযুক্তা মিশ্র জ্যোতিষাচার্য্য কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯১৫, ১০২ পৃষ্ঠা।

৬৬। A. Cunningham, *Corpus Inscriptionum Indicarum*, I, PP. 20-3.

৬৭। “*Theosophist*”, V, 1883, PP. 40 ff.

তিনি দেখাইয়াছেন যে, ঐ শিলালিপি সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসে উক্ত বুদ্ধনির্বাণ-কালের সমর্থন করে। ঐ ইতিহাসের মতে বুদ্ধের পরিনির্বাণকাল খৃষ্টাব্দের ৫৪৩ বৎসর পূর্বে।

কোন কোন প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধের জীবনের মুখ্য ঘটনাবলীর বার ও তিথি এবং সে সময়ে তাঁহার বয়স লিপিবদ্ধ আছে। বিশপ বিগনেৎ-রচিত ‘গৌতমের জীবনী’তে উহাদের অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। সে সকলের ভিত্তিতে গণনা করিয়া স্বামী কহুপিল্ল্য নির্ণয় করেন যে, একমাত্র ৪৭৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে নির্বাণ ধরিলেই-জ্যোতিষিক গণনায় উহাদের সামঞ্জস্য হয়। অন্য কোন একে নির্বাণ ধরিলে ঐগুলি মোটেই মিলে না^{৬৮}। বুদ্ধের নির্বাণকাল সম্বন্ধে অন্য ঘটগুলি মত প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রত্যেকটির বিচার করত পিল্ল্য মহাশয় জোর করিয়াই বলিয়াছেন, বুদ্ধের নির্বাণ ৪৭৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে ব্যতীত অপর কোন বৎসরে হইতেই পারে না।

পণ্ডিত স্ত্রবক্ষণ্য পিল্ল্য^{৬৯} এ বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাসে বিবৃত আছে যে, গৌতম বুদ্ধ ৬৮ ঈশান শগের বৈশাখী পূর্ণিমায় শুক্রবারে জন্মগ্রহণ করেন; ২৬ ঈশান শগে, বৈশাখী পূর্ণিমায়, শুক্রবারে, ২২ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন; ১০৩ ঈশান শগে বৈশাখী পূর্ণিমায় বৃধবারে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন; ১০৭ ঈশান শগে, আদি পূর্ণিমায়, শনিবারে, সূর্যোদয়সময়ে, তাঁহার পিতা দেহত্যাগ করেন; ১৪৮ ঈশান শগে, বৈশাখী পূর্ণিমায়, মঙ্গলবারে, তিনি নির্বাণলাভ করেন। এই সকল তিথি বারের কতকগুলি ‘শিলপথিকরম্’ নামক প্রাচীন তামিল গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ ঈশান শগের প্রারম্ভকাল তথায় বিবৃত হয় নাই। ঐ সকল জ্যোতিষিক ঘটনার আধারে গণনা করিয়া স্ত্রবক্ষণ্য পিল্ল্য নির্ণয় করেন যে, ঈশান শগের আদি ৬৪১ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে। সুতরাং ভগবান্ বুদ্ধের জন্ম ৫৭৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে, গৃহত্যাগ ৫৪৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে, বুদ্ধত্বলাভ ৫৩৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে, পিতার মৃত্যু ৫৩৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে এবং নির্বাণলাভ ৪২৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে। তিনি বলেন, একমাত্র ৪২৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে ব্যতীত ৬০০ হইতে ১০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের অন্তর্ভুক্তি অপর কোন একে বুদ্ধের নির্বাণ হইয়াছিল ধরিলে পূর্বোক্ত সমস্ত তিথি ও বারের সমন্বয় পাওয়া যায় না। ৪৮৩ খৃষ্টপূর্বাব্দের ২৭শে বৈশাখ এবং ৪৮৬ খৃষ্টপূর্বাব্দের ৩১শে বৈশাখ মঙ্গলবার পূর্ণিমা ছিল। সুতরাং তাহাতেও নির্বাণ-তিথি ঠিক ঠিক পাওয়া যায় বটে। কিন্তু অপর তিথি বারসমূহ মিলে না।

বুদ্ধের জন্ম এবং নির্বাণকাল সম্বন্ধে এই সকল সিদ্ধান্তের কোনটাই পূর্বোক্ত শাক্যকাল-বাদিগণের অনুমানসমূহের কিস্কিৎমাত্রও অঙ্কুল নহে।

৬৮। *In l. Ant.*, XLIII, 1914, PP. 197—

৬৯। Pundit E. M. Subramania Pillai, “The Date of Buddha Nirvana,” *Indian Review*, 1924, PP. 238-240

সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসের মতে বুদ্ধের নির্বাণকাল ৫৪৪ খৃষ্টপূর্বাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমা। তাহার পরের দিন হইতে বিগণিত নির্বাণাব্দের প্রচলন এক সময়ে ভারতবর্ষ, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল; দেখা যায়, স্বদূর লাউ প্রদেশেও উহার ব্যবহার ছিল। পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এই তারিখ রামপ্রসাদ ও গোপাল আয়ারের মতের কতকটা অনুরূপ বটে। কিন্তু হিন্দু জ্যোতিষে ব্যবহৃত শককালের আদি-যে উহা হইতে পারে না, কিঞ্চিৎ পূঁরে আমরা নিঃসংশয়রূপে তাহা প্রতিপাদন করিব।

শাক্যকালবাদিগণের কেহ কেহ মনে করেন যে, পূর্বোক্ত বরাহবচনের “ষড়্বিকপঞ্চবি” বাক্য ২৫ X ২৬ কিম্বা ২৫৫৬ সংখ্যা খ্যাপন করে। কিন্তু প্রাচীন টীকাকার উৎপল ভট্টের মতে উহা ২৫২৬ সংখ্যাবোধক।

পারস্যশককালবাদে ত্রুটি

পারস্যশককালবাদের সমর্থনে নারায়ণ শাস্ত্রী যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সকল ভ্রমাত্মক। তাঁহার গণনা মতে, উৎপল ভট্ট (৮৮৮ শাক) ৩৩৮ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। তাহা সম্ভব নহে। কেন না, উৎপল আর্ঘ্যভট্ট (‘আর্ঘ্যভট্টীয়’কার) ও ব্রহ্মগুপ্তের (জন্ম ৫২০ শক) নামোল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে বহু বচন অনুবাদ করিয়াছেন^{১০}। তিনি ব্রহ্মগুপ্তকৃত খণ্ডখাণ্ডকের (রচনাকাল ৫৮৭ শক) টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং উৎপল অবশ্যই আর্ঘ্যভট্ট ও ব্রহ্মগুপ্তের অর্ধাব্দের লোক। ইহাদের কেহই শালিবাহন-শকের পূর্বাব্দের নহে (পরে দেখুন)। “চৈত্রমাসস্য পঞ্চম্যাং” ইত্যাদি শ্লোক উৎপলের ‘বৃহজ্জাতকবিবৃতি’তে এবং “ফাল্গুনশ্চ দ্বিতীয়ায়াং” ইত্যাদি শ্লোক তাঁহার ‘বৃহৎসংহিতা-বিবৃতি’তে পাওয়া যায়। তাহা না জানিয়া শাস্ত্রী মহাশয় সুধাকর দ্বিবেদীর প্রতি অগ্রায় দোষারোপ করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোক দ্বিবেদীজীর মনঃকল্পিত নহে। প্রথম শ্লোকোক্ত ‘শাক’কে শালিবাহনশক বলিয়া ধরিলে বার মিলে না সত্য। তাহাতে অনুমান হয়, ঐ শ্লোকের অধুনা প্রচলিত পাঠে কিঞ্চিৎ ভুল আছে। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত বিশেষ পর্যালোচনা করতঃ তৎসম্বন্ধে এরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন^{১১}। শাস্ত্রীর পারস্য-শককালবাদানুসারে :প্রথম শ্লোকোক্ত তিথি ও বার পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত তিথি বার পাওয়া যায় না।

অল্‌বিকনি আচার্য্য ভাস্করের নামোল্লেখ করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। কেন না, তাঁহার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির ঐ স্থলের পাঠ ভ্রষ্ট। বেবর অতি স্পষ্টভাবে এরূপ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। উল্লেখ করিয়া থাকিলেও ঐ ভাস্কর “সিদ্ধান্তশিরোমণিকার” ভাস্কর হইতে ভিন্ন ব্যক্তি হইবেন। তাহাও তিনি লিখিয়াছেন। অপর একজন প্রাচীন ভাস্করের

১০। উৎপলভট্ট-রচিত ‘বৃহৎসংহিতা-বিবৃতি’ দেখ।

১১। ‘ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র’ ২৩৪ পৃষ্ঠা।

অস্তিত্ব আমরা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছি^{৭২}। যাহা হউক, অল্‌বিরুনির উক্তি লইয়া ঐ কল্পনা জল্পনা বস্তুত নির্মূল। কেন না, সাকাউ কর্তৃক সম্পাদিত অল্‌বিরুনির গ্রন্থে ভাস্করের নাম নাই। এই সংস্কর গই এখন প্রামাণ্য বন্নিয়া পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃত হইয়া থাকে। পারস্য-শককালবাদ অল্পসারে “সিদ্ধান্তশিরোমণি”কার ভাস্করাচার্যের (জন্ম ১০৩৬ “শককাল,” গ্রন্থরচনাকাল ১০৭২ শক) জন্ম ৪৮৬ খৃষ্টাব্দে এবং গ্রন্থরচনা ৫২২ খৃষ্টাব্দে স্থির হয়। উহাতে তিনি আচার্য ব্রহ্মগুপ্ত অপেক্ষা প্রাচীন হইয়া পড়েন। তাহা সম্ভব নহে। কারণ, ভাস্কর ব্রহ্মগুপ্তের নামোন্মেষ্ট করিয়াছেন। বস্তুত তিনি স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্রহ্মগুপ্তের “ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত” অল্পসারে স্বকীয় “সিদ্ধান্তশিরোমণি” রচনা করিয়াছেন। (পরে দেখুন)।

দ্বিতীয় পুলকেশীর শিলালেখ সম্বন্ধে শাস্ত্রী ভীষণ ভুল করিয়াছেন। উহার যে পাঠ তিনি প্রকৃত বলিয়া অঙ্গীকার করেন, সেই পাঠ দ্বারাও তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কারণ, তাহাতে পাওয়া যায়, ৩১৩৫ ভারতযুদ্ধাব্দ = ৫৫৬ শকনূপকাল। তাঁহার মতে, ৩১৩৫ ভারতযুদ্ধাব্দ = ৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ। সুতরাং ৫৫৫ শকনূপকাল = ৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। তাহাতে ঐ শককালের আদি ৬৬২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে হয়। সাধারণত ভারতযুদ্ধাব্দ ও কল্যাণের আদি অভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সে হিসাবে ঐ শকাব্দের আদি ৫২৩ খৃষ্টাব্দে হয়। অতএব কোন প্রকারের গণনাতেই ঐ শিলালেখ দ্বারা পারস্যশককালবাদ সমর্থিত হয় না। এই সহজ গণনাটি শাস্ত্রীজী কেন ধরিতে পারিলেন না, তাহাই আশ্চর্য্য মনে হয়। চীন পর্যটক হুয়েন-সাং ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। তখন দ্বিতীয় পুলকেশী প্রবল প্রতাপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পর্যটক তাহা বিবৃত করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, তিনি ৬০৮—৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা ছিলেন। সুতরাং তাঁহার শিলালেখোক্ত ‘শকনূপকাল’কে শালিবাহনশকাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিলেই ঐ সকল ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য হইতে পারে।

বাদদ্বয় খণ্ডন

এইরূপে শাক্যকালবাদ ও পারস্যশককালবাদের দোষ ক্রটি প্রদর্শন করিয়া, আমরা এখন সাক্ষাৎভাবেই উহাদের খণ্ডন করিব। আমরা সিদ্ধ করিব যে, হিন্দুজ্যোতিষে ব্যবহৃত শককালের আদি ৬২৩ হইতে ৫৪৩ (কি ৪৭৭) খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে হইতেই পারে না। প্রথমতঃ বৃদ্ধভাস্করাচার্য্যপ্রমুখ সকল হিন্দু জ্যোতিষিগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, কলিকালের ৩১৭০ বৎসর গতে শককালের আরম্ভ। জ্যোতিষিক কল্যাণের প্রারম্ভ ৩১০২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। ইতিপূর্বে ঐ সকল বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং সিদ্ধ হয়, জ্যোতিষিক শককালের প্রারম্ভ ৭৮ খ্রিষ্টাব্দে। অতএব উহা শালিবাহনশককালই। তাহাতে কোন সন্দেহ

৭২। Bibhutibhusan Datta, “The two Bhaskaras,” *Indian Historical Quarterly* VI., 1930, PP. 727-736.

হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন, ৫৫০ শকে, ৩০ বৎসর বয়সে তিনি ‘ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত’ রচনা করেন। ঐ শকের আদি ৬২৩ হইতে ৫৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে ধরিলে বলিতে হয়, ব্রহ্মগুপ্ত শালিবাহনশকারস্তের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, ‘ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে’ তিনি আর্ঘ্যভট ও তৎপ্রণীত ‘দশগীতিকা’ ও ‘আর্ঘ্যভটশতে’র নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের প্রতি নানা দুষণ দিয়াছেন। তাঁহার নিজের উক্তি অনুসারে ঐ আর্ঘ্যভট ৩৬০০ কল্যাঙ্গে (= ৪২১ শালিবাহনশকাব্দে) বর্তমান ছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মগুপ্ত আর্ঘ্যভটের প্রাগ্‌বর্তী হইতে পারেন না। এ বিষয়ে অপর প্রমাণ ক্রমে প্রদর্শিত হইবে। এইরূপে দেখা যায়, শাক্যকালবাদ ও পারস্যশককালবাদের কোনটাই হিন্দু জ্যোতিষে প্রাপ্ত প্রমাণ প্রয়োগে টিকে না।

আর্ঘ্যভট, লাটদেব ও বরাহমিহির

বরাহমিহির আর্ঘ্যভট ও লাটদেবের নামোল্লেখ করিয়াছেন^{৭৩}। সুতরাং তিনি তাঁহাদিগের সমকালীন বা অর্ধাকালীন, সন্দেহ নাই। পুরাকালে হিন্দুস্থানে আর্ঘ্যভট নামে একাধিক জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তন্মধ্যে দুই জনের রচিত গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায়। ‘মহাসিদ্ধান্ত’-কার আর্ঘ্যভট ৮৭০ শকাব্দের প্রায়কালে জীবিত ছিলেন। ‘আর্ঘ্যভটীয়’কার আর্ঘ্যভট লিখিয়াছেন, তিনি কলির “ষষ্ঠ্যকানাং ষষ্টিঃ” অর্থাৎ ৬০ × ৬০ = ৩৬০০ বর্ষ গতে, সুতরাং ৪২১ শালিবাহনশকাব্দে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মনে করেন, বরাহমিহিরোক্ত আর্ঘ্যভট ইহাদের হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। তিনি ১১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের—তন্মতে বরাহমিহিরের সময়ের পূর্বের লোক। ঐ সময়ে আর্ঘ্যভট নামে জনৈক জ্যোতিষীর সম্ভাবের অপর কোন প্রমাণ যদিও মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইতে পারেন নাই, কিন্তু উহাকে অসম্ভব বলা যাইতে পারে না। ‘আর্ঘ্যভটীয়’কার আর্ঘ্যভট অপেক্ষা প্রাচীন এক আর্ঘ্যভটের সম্ভাবের অনুমান কতিপয় হেতুতে আমরা ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে করিয়াছিলাম^{৭৪}। পরে অল্প হেতু দ্বারা আমাদের ঐ অনুমান আরও দৃঢ় হইয়াছে^{৭৫}। কিন্তু ঐ বৃদ্ধ আর্ঘ্যভট ১১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগেকার লোক কি না বলিতে পারি না। সে বাহা হউক, তথাপিও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমান সমীচীন নহে। কেন না, বরাহমিহির লাটদেবের নাম করিয়াছেন। এক লাটদেব ‘আর্ঘ্যভটীয়’কার আর্ঘ্যভটের (৪২১ শক) শিষ্য। আমরা তাহা প্রমাণ করিয়াছি^{৭৬}। তদ্ব্যতীত লাটদেব নামে অপর কোন প্রাচীন জ্যোতিষীর

৭৩। ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’, ১৫১০ (আর্ঘ্যভট); ১১৩ ও ১৫১৮ (লাটদেব)।

৭৪। Bibhutibhusan Datta, “Two Aryabhatas of Al-Biruni,” *Bull. Cal. Math. Soc.*, XVII, 1926, pp 59-74; বিশেষত ৬৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৭৫। শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, “আচার্য্য আর্ঘ্যভট ও ভূদ্রমণিবাদ্য,” ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ ১৬৭ পৃষ্ঠা।

৭৬। শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, “আচার্য্য আর্ঘ্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ,” ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ১২৯-১৫৮ পৃষ্ঠা; বিশেষত ১৪১-২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সম্ভাবের সম্ভান এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সূতরাং বলিতে হয়, বরাহোক্ত লার্টেন্দেব এবং ‘আর্যভট্টীয়’কারের শিষ্য লার্টেন্দেব অভিন্ন ব্যক্তি। অতএব তদুক্ত আর্যভট্ট ও ‘আর্যভট্টীয়’কার *হওয়াই সম্ভব। ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’র একটা বচন ‘আর্যভট্টীয়’ পাওয়া যায়^{১১}। বরাহমিহিরও স্বীকার করিয়াছেন (“তৈত্তির্যবোক্তঃ”—১৫।২১) যে, তিনি অপরের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে ঐ অসম্মান আরও দৃঢ় হয়।

নারায়ণ শাস্ত্রী বলেন, বরাহমিহিরোক্ত আর্যভট্ট ও ‘আর্যভট্টীয়’কার আর্যভট্ট সত্যই অভিন্ন ব্যক্তি। তবে তিনি মনে করেন যে, আর্যভট্টের উক্তির প্রচলিত “যষ্টাঙ্গানাং যষ্টিঃ” পাঠ ভুল। উহা প্রকৃতপক্ষে ‘যষ্টাঙ্গানাং যড়্ভিঃ’ হইবে। সূতরাং আর্যভট্ট ৬০×৬ বা ৩৬০ কল্যায়ে অর্থাৎ ২৭৪২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বর্তমান ছিলেন। অতএব ১২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বরাহমিহিরের পক্ষে তাহার নামোল্লেখ অসম্ভব হয় না। আমরা অগত্যা প্রকৃষ্টরূপে দেখাইয়াছি যে, প্রচলিত “যষ্টাঙ্গানাং যষ্টিঃ” পাঠই শুদ্ধ^{১২}। সূতরাং শাস্ত্রীর মত ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত। এইরূপে প্রমাণিত হয় যে, বরাহমিহির ৪২১ শালিবাহনশকের সমকালীন বা অর্ধশককালীন লোক।

৪২৭ শালিবাহনশক ও বরাহমিহির

৪২৭ শালিবাহনশাকে কিম্বা তাহার পরেও বরাহমিহির বর্তমান ছিলেন। তাহা সুনিশ্চিতরূপে সিদ্ধ করা যায়। স্বকৃত ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’য় বরাহমিহির চন্দ্র ও সূর্যের এবং বৃহ, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের অবস্থিতি নির্দেশ করিয়াছেন^{১৩}। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-মতে স্বল্প গণনা করিলে দেখা যায়, ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ, রবিবারের মধ্যাহ্নকালিক চন্দ্র সূর্যের সংস্থিতিই তিনি দিয়াছেন। গ্রহসমূহের অবস্থিতি ঐ দিন মধ্যরাত্রির। ঐ মধ্যরাত্রিতেই সোমবার আরম্ভ হইয়াছে। খরেগং তাহা বিশেষ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন^{১৪}। ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’র করণাব্দ ৪২৭ শকের চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ সোমবার^{১৫}। ঐ শককে শালিবাহনশক বলিয়া গ্রহণ করিলে পাওয়া যায়, ঐ তারিখ ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ, সোমবার। এইরূপে দেখা যায়, ৪২৭ শালিবাহনশকের চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ তারিখের ঠিক পূর্ববর্তী মাধ্যাহ্নিক চন্দ্রসূর্যের অবস্থিতি এবং মধ্যরাত্রিক বৃহ শুক্র মঙ্গল গ্রহের স্থিতি বরাহমিহির লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’য় কলিগতাহর্গন গণনার

১১। ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা,’ ১৫।২৩; ‘আর্যভট্টীয়,’ ৪।১৩। ‘আর্যভট্টীয়’ আছে—“অর্দ্ধরাত্রঃ স্ত্রাং” আর ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’য় আছে—“অর্দ্ধরাত্রঃ সঃ”। এই পাঠভেদ নগণ্য।

১২। “আচার্য আর্যভট্ট ও তাহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ” নামক প্রবন্ধ দেখ।

১৩। ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা,’ ৯ম অধ্যায়ে চন্দ্র ও সূর্যের অবস্থিতি এবং ১৬ অধ্যায়ে বৃহ, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের অবস্থিতি বিবৃত হইয়াছে।

১৪। M. P. K. aregat, “On the interpretation of certain passages in the Panch-Siddhantika of Varahamihira,” *Journ. Bom. Br. Roy. Asiatic Soc.*, XIX, 1895-7, PP. 109 ff.

১৫। ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা,’ ১।৮।

বিধি বর্ণিত আছে^{৮২}। সেই বিধি অনুসারে গণনা করিয়া সুধাকর দ্বিবেদী দেখাইয়াছেন যে, কলিঙ্গ প্রারম্ভ হইতে ১,৩১৭,১২৩ দিন গতে চন্দ্রমুখ্যাদির যে অবস্থিতি গণনা দ্বারা পাওয়া যায়, তাহাই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এইরূপেও ৪২৭ শালিবাহনশকের চৈত্রশুদ্ধ-প্রতিপদ, সোমবার পাওয়া যায়।

• ভাস্করাচার্য্যোক্ত ‘শকনূপকাল’

(দ্বিতীয়) ভাস্করাচার্য্যোক্ত ‘শকনূপকাল’ সম্বন্ধে ‘শাক্যকালবাদিগণ’ স্পষ্টত কিছু বলেন নাই। কিন্তু পারস্যশককালবাদী নারায়ণ স্বামী মনে করেন, উহাও পারস্যশককাল, শালিবাহনশককাল নহে। অধ্যাপক শ্রীসত্যকেতু বিভালঙ্কারও স্বীকার করিয়াছেন^{৮৩}। তাঁহাদের মত যে ভাস্কর, ভাস্করাচার্য্য যে প্রকৃতপক্ষে শালিবাহনশকাদেরই ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার কতিপয় প্রমাণ পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে আরও একটা প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতেছে। শ্রীপতিকৃত ‘জাতকপদ্ধতি’র টীকায় কৃষ্ণদৈবজ্ঞ—ইনি ভাস্করের ‘বীজগণিতে’র টীকাকার—খানিখানার^{৮৪} জন্মকাল ও তিথি নিম্নপ্রকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—কল্যাব্দ=৪৬৫৭, বিক্রমসম্বৎ=১৬১৩, শালিবাহনশক=১৪৭৮, ‘ব্রহ্মতুল্য’ অব্দ=৩৭৩ এবং ‘সিদ্ধান্তরহস্য’ অব্দ=৩৬; “অত্র বর্ষে মার্গশীর্ষ শুক্ল ১৪ সোমে ঘটিকা ৫” ইত্যাদি। এ সকলই গতাব্দ। ইহা হইতে জানা যায়, ‘ব্রহ্মতুল্য’ ১১০৫ এবং ‘সিদ্ধান্তরহস্য’ ১৪৪২ শালিবাহন অব্দে রচিত হয়। ভাস্করাচার্য্য-প্রণীত ‘করণকুতুহলে’রই অপর নাম ‘ব্রহ্মতুল্য’। তিনি নিজেই উহাকে ব্রহ্মতুল্য বলিয়াছেন। গণেশ দৈবজ্ঞ-প্রণীত ‘গ্রহলাঘবে’রই অপর নাম ‘সিদ্ধান্তরহস্য’। করণকুতুহলেও আছে, উহার আরম্ভ-কাল ১১০৫ শক। এইরূপে নিশ্চিত হয়, (দ্বিতীয়) ভাস্করাচার্য্য-ব্যবহৃত শককাল সত্যই শালিবাহনশককাল।

গর্গবরাহবচন ভ্রমাত্মক

যে গর্গবরাহবচনমূলে হিন্দু জ্যোতিষের ইতিহাসে, বিশেষত বরাহমিহিরের কাল সম্বন্ধে এত অনর্থের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে, সে বচনের সত্যতা সম্বন্ধে আজকাল অনেকে সন্দেহ করিয়াছেন। চিন্তামণি বিনায়ক বৈথ বলেন,^{৮৫} যুধিষ্টির কাল সম্বন্ধে বরাহমিহিরের বচন সত্য হইতে পারে না। কেন না, কলিকালের আরম্ভ সম্বন্ধে মহাভারতোক্ত মত এবং অপর জ্যোতির্বিদগৃহীত মতের সঙ্গে উহার ঐক্য হয় না। ঐ বচন বুদ্ধগর্গের হইতে

৮২। ‘পঞ্চসিদ্ধান্তিকা’, ১৮।

৮৩। শ্রীসত্যকেতু বিভালঙ্কার প্রণীত ‘মৌর্য্য-সাম্রাজ্য কা ইতিহাস,’ এলাহাবাদ, ১৯৮৫ সম্বৎ, ৪৬ পৃষ্ঠা।

৮৪। সম্রাট আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁর পুত্র প্রসিদ্ধ কবি ও বীর আবদুর রহমানেরই অপর নাম খানিখানা।

৮৫। ‘হিন্দী মহাভারত-মীমাংসা,’ ৯৪-৫ ও ৪৩৩-৮ পৃষ্ঠা।

পারে না। কেন না, তিনি নিশ্চয়ই শকাব্দের প্রকালীন লোক। খুব সম্ভব, তিনি ‘মহা-ভারত’কালেরও প্রাথী। ‘মহাভারতে’ তাঁহার নামোল্লেখ^{৮৬} এবং তৎকৃত ‘সংহিতার’ ইঙ্গিত^{৮৭} আছে। অধিকন্তু অধুনা প্রাপ্ত ‘গর্গসংহিতা’তে ঐ বচন নাই। এই সকল হেতুতে বৈধ মনে করেন, বরাহমিহিরই ভুল করিয়াছেন। তৎপরে শঙ্করবালকৃষ্ণ দীক্ষিতও বলিয়াছেন, ‘গর্গবরাহোক্ত এই কাল কেবল কল্পিত।’^{৮৮} সপ্তর্ষির গতি সম্বন্ধে বৃদ্ধগর্গের মতের উল্লেখ করিতে গিয়া বরাহমিহির ঐ উক্তি করিয়াছেন। ঐ গতি অনুসারে গণনা করিলে যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত ২৭০০ বা তাহার দুই তিন প্রভৃতি গুণ বৎসর অতীত হইয়াছে পাওয়া যায়। গর্গবরাহোক্ত কালের সঙ্গে ইহার সঙ্গতি হয় না। আসল কথা, এই কাল গণনার কোন অর্থ নাই। কারণ, সপ্তর্ষির গতি নাই। মহাভারতপুরাণবচনের সঙ্গে অসঙ্গতি ব্যতীত এই সকল হেতুতেও দীক্ষিত মনে করেন যে, ঐ কাল নিশ্চয়ই কল্পিত। বরাহমিহির-বিবৃত বৃদ্ধগর্গমত এবং উৎপল ভট্ট-দ্বৃত বৃদ্ধগর্গ-বচনের আধারে গণনা করিয়া শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় দেখাইয়াছেন যে, বৃদ্ধগর্গ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন^{৮৯}। সুতরাং শালিবাহনশকাব্দের ব্যবহার তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে।

- ৮৬। “গর্গশ্রোতো মহাতীর্থমাজগমৈককুণ্ডলী ॥১৪॥ তত্র গর্গেণ বৃদ্ধেন তপসা ভাবিতায়না।
কালজ্ঞানগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ ব্যতিক্রমঃ ॥১৫॥ উৎপাতা দারুণাশ্চৈব শুভাশ্চ জনমেজয়।
সরস্বত্যাঃ শুভে তীর্থে বিদিতা বৈ মহায়না ॥১৬॥ তস্য নামা চ ততীর্থং গর্গশ্রোত ইতি স্মৃতং।
তত্র গর্গং মহাভাগমুখ্যঃ স্মরতা নৃপ। উপাসাঞ্চকিরে নিত্যং কালজ্ঞানং প্রতি প্রভো ॥১৭॥”
—শল্যপর্ব, ৩৭ অধ্যায়।

৮৭। মহর্ষি গর্গ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, শিবের প্রসাদে তিনি কলাবিহার ৬৪ অঙ্কে জ্ঞান লাভ করেন।

চতুঃষষ্ট্যঙ্গমদদৎ কলাজ্ঞানং মমাত্মনাম্।

সরস্বত্যাশ্রুতে তুষ্ণো মনোযজ্ঞেন পাণ্ডব ॥”—অনুশাসনপর্ব, ১৮।৩৮

বৈদ্য লিখিয়াছেন, এখানে লক্ষিত গ্রন্থ ‘বৃদ্ধগর্গসংহিতা’ মনে হয়। পুনর ডেকান কালজের পাণ্ডুলিপিসংগ্রহে ‘বৃদ্ধগর্গসংহিতা’র একখানি পাণ্ডুলিপি আছে। উহার প্রথম অধ্যায়ে ৬৪ অঙ্কের উল্লেখ আছে। মহাভারতোক্ত জ্যোতিষিক বহু বচনের ঐ গ্রন্থোক্ত বচনের সহিত মিল আছে। তাহাতে মনে হয়, মহাভারতকার উহার উপযোগ করিয়াছেন। [‘মহাভারত-সীমাংসা,’ ৪৩৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা]

৮৮। ‘ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র,’ ১১৮ পৃষ্ঠা।

৮৯। ‘আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ,’ ৫৬-৮ পৃষ্ঠা।

শককালের প্রবর্তক

প্রচলিত শকাব্দ সাধারণত শালিবাহনশকাব্দ নামে বিশেষ খ্যাত। কিন্তু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা সাতবাহন বা শালিবাহন সত্য সত্যই উহার প্রবর্তক কি না, অনেকে সংশয় করেন। বস্তুত এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। প্রতীচ্য বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ সম্প্রতি নিশ্চয় করিয়াছেন যে, কুশনবংশীয় কণিষ্কই ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ অব্দের প্রবর্তন করেন। পশ্চিম-^{৯০}

ভাষ্যতে শকরাজগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া উহার ব্যবহার করেন। তাহা হইতে উহা ‘শককাল’ নামে সাধারণের মধ্যে পরিচিত হইয়াছে ৯০। প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষিগণ এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। চতুর্বেদাচার্য্য পৃথুদক স্বামী (৭৮৬ শক) লিখিয়াছেন,—

“শকা নাম শ্লেচ্ছা রাজানন্তে যস্মিন্ কালে বিক্রমাদিত্যেন ব্যাপাদিতা স কালোহত্যর্থং প্রসিদ্ধঃ। তং কালং বর্ষসংখ্যাং বর্ষে জ্ঞাত্বা তত্তন্তস্ম্যাং কালান্...” ৯১।

শঙ্করনারায়ণ (৭২১ শক)—

“আসীং কিল তাবত্যতীতে কলিযুগে শকেজ্ঞো নাম নরেন্দ্রঃ সার্বভৌমঃ। তেন কৃত্য সমস্তভূমণ্ডলে স্বনামসম্বন্ধতাত্ত্ব্যং প্রভৃতি কলিবর্ষণামাত্রপ্রসিদ্ধার্থম্। ততো জ্যোতির্জ্ঞান-পারগৈঃ শিষ্যপ্রশিষ্যারূপেণ পরম্পরয়া সা স্মর্য্যতে।” ৯২

ভট্টোৎপল (৮৮৮ শক)—

“শকা নাম শ্লেচ্ছজাতয়ো রাজানন্তে যস্মিন্ কালে বিক্রমাদিত্যদেবেন ব্যাপাদিতাঃ স কালো লোকে শক ইতি প্রসিদ্ধঃ। তস্মাচ্ছকেন্দ্রকালান্ শকনূপবধাদারভ্যাভীষ্টবর্ষং যাবৎ তানি বর্ষানি...শকভূপকালং শকনূপসময়ং।” ৯৩

আমরাজ (১২০১ শকপ্রায়)—

“শাকঃ শককালঃ। শকা নাম শ্লেচ্ছা রাজানন্তে যস্মিন্ কালে বিক্রমাদিত্যেন ব্যাপাদিতাঃ স শকসম্বন্ধী কালঃ শাক ইত্যুচ্যতে।” ৯৪

পরমেশ্বর (১৩৩১ শক)—

“পুরা জননিধিবসনামিমামুর্বাং শকেজ্ঞা ইতি বিখ্যাতাঃ নরেন্দ্রাঃ কিল শশাঙ্কঃ। তদা তন্মামকীর্তনায় তৎকৃতগৌরবৈর্জ্যোতির্জ্ঞানপারগৈরাচার্য্যৈস্তেজসিমাং শাসংস্ য়েহতীতান্ধান্তে শকাধ্বা ইত্যভিহিতাঃ। তৎপ্রভৃতি য়েহতীতান্তেহপি তৎসম্বন্ধিন ইতি তচ্ছিষ্যপ্রশিষ্য-সজ্জনপরম্পরয়া স্মর্য্যতে। তৎ প্রসিদ্ধোদমুক্তং শকাধ্বা ইতি।”

নৃসিংহ (১৫৪৩ শক)—

“শকনূপস্তান্তে। শকাশ্চ তে নরাশ্চ তান্ পাতিতি শকনূপো বিক্রমাদিত্যঃ। যথা মুগপ্রাণহরে সিংহে মুগপতিপ্রয়োগস্তথা শকনূপপ্রয়োগো বিক্রমাদিত্যে। ‘শকনামানো শ্লেচ্ছান্তে ব্যাপাদিতা যস্মিন্ কালে বিক্রমার্কেণ স কালো লোকে শকেন্দ্রকাল ইত্যুচ্যতে’ ইতি ভট্টোৎপলোক্তেঃ। য এব বিক্রমাস্তান্ত এব শালিবাহনাদিরিত্যুচ্যাবচজনপ্রসিদ্ধম্।” ৯৫

মুনীশ্বর (১৫৫৩ শক)—

“শকাখ্যশ্লেচ্ছনরান্ পিবতি মারয়তীতি শকনূপো বিক্রমাদিত্যঃ। তস্তান্তে বিরামে

৯০। *Cambridge History of India*, . Vol. I, Cambridge, 1922, pp. 583, 585.

৯১। খণ্ড-খণ্ডক, ১১৩ (টীকা)

৯২। লঘুভাষ্যরীয়, ১১৪ (টীকা)

৯৩। বৃহৎসংহিতা, ৮২০-১ (টীকা)

৯৪। খণ্ডখণ্ডক, ১১৩-৫ (টীকা)

৯৫। শাসনাবলি (৯১ পৃষ্ঠা)।

শালিবাহনশকাদাবিত্যর্থঃ। ‘যুধিষ্টিরো বিক্রমশালিবাহনো’—ইত্যাদি কলিযুগীয়ষট্ শক-
নৃপসংগ্রহশ্লোকে বিক্রমশকানন্তরং শালিবাহনশকারন্ত উক্তঃ”^{২৩}।

এক শঙ্করনারায়ণ ব্যতীত উপরি উক্ত অপর সকলেই বলিয়াছেন যে, ‘বিক্রমাদিত্য’,
‘বিক্রমার্ক’ বা ‘বিক্রমাদিত্যদেব’ই শককালের প্রবর্তক। তিনি শকনামক স্লেচ্ছজাতীয়
রাজাকে বধ করেন। তাহার স্মৃতিরক্ষার্থ প্রবর্তিত অন্ধের নাম ‘শকাদ’ রাখেন। নৃসিংহ
ও মুনীশ্বর ইহাকে ‘শালিবাহনশক’ও বলিয়াছেন। কিন্তু শালিবাহন যে বিক্রমাদিত্যেরই
অপর নাম, তাহা বলেন নাই। তাঁহাদের লেখা হইতে বরং বিপরীতই বুঝা যায়।
শঙ্করনারায়ণের মতে, শকেন্দ্র জৈনক স্বার্কর্ভৌম রাজার নাম। তিনি “আত্মপ্রসিক্তির
উদ্দেশ্যে” কল্যাণের নাম পরিবর্তন করিয়া স্বসময় হইতে শকাদ নাম রাখেন। অলবিক্রনি
উভয় মতের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,^{২৪} শক একজন রাজার
নাম। কাহারও মতে তিনি শূদ্র, অপরের মতে প্রতীচ্য বিদেশী ছিলেন। তিনি বড়
অত্যাচারী ছিলেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মূলতান ও
লুণীচূর্ণের মধ্যবর্তী করুর নামক স্থানে তাহাকে পরাজিত ও বধ করেন। ঐ অত্যাচারী
রাজা নিহত হইলে লোকের বিশেষ আনন্দ হয়। শকবধের স্মৃতিরক্ষার্থ শকাদ প্রবর্তন করেন।

প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষিগণ বিভিন্ন নামে ঐ অন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃদ্ধভাস্কর
উহাকে ‘শকাদ’ ও ‘শকেন্দ্রনামক মহারাজগণের বধ’ বলিয়াছেন। লল্ল ‘শকক্ষিতীশাদ’,
বরাহমিহির ‘শকেন্দ্রকাল’, ‘শকভূপকাল’ ও ‘শককাল’; ব্রহ্মগুপ্ত ‘শকান্তে অদ’, ‘শকনুপান্তে
অদ’, শ্রীপতি ‘শকান্তে’ এবং ভাস্কর ‘শকনুপান্তে বৎসর’ বা শকাদ। ঐ সকল স্থানে
‘অন্ত’ শব্দ অবধিবাচক। মন্নিভট্ট তাহাই বলিয়াছেন,—“শকান্ত ইত্যজ্ঞান্তশব্দোহবধি-
পর্যায়ঃ।...শকান্তে শকাবধৌ কালে শকবর্ষপ্রারম্ভাৎ পূর্বং”। সুতরাং ‘শকাদ’ শব্দের
ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—শক হইতে প্রচলিত অদ। ‘শককাল’ শক হইতে কাল। ঐ ‘শক’,
‘শকনুপ’, ‘শকভূপ’ বা ‘শকক্ষিতীশ’ কে? নৃসিংহ ও মুনীশ্বর ‘শকনুপ’ শব্দের অর্থ করিয়াছেন,
—‘শকজাতির হত্যাকারী’ অর্থাৎ বিক্রমাদিত্য। ‘শকভূপ’ শব্দের না হয়, সেই প্রকার অর্থ
করা যাইতে পারে—‘শকভূমির ধ্বংসকারী’। ‘শকক্ষিতীশ’=শকের শাসনকর্তা’ অর্থাৎ
শকধ্বংসকারী বিক্রমাদিত্যই শকারি বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুনীশ্বর ‘অন্ত’ শব্দের ভিন্নার্থ
করিয়াছেন। অন্ত=বিরাম। শকারি বিক্রমাদিত্যের অন্তে বা বিরামে প্রচলিত অদ শকাদ।
এই ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত। একটা প্রাচীন লেখে আছে,—“শকনুপতিরাজ্যাভিষেক-
সংবৎসরেষতিক্রান্তেষু পঞ্চম্ শতব্দ” ইহা দেখিয়া সমসাময়িক বৃদ্ধভাস্করের কথাই মনে পড়ে,
‘শকেন্দ্রনামাং মহীভূজাং গতবর্ষসংগ্রহঃ’। ‘শক’ বা ‘শকেন্দ্র’ রাজার রাজ্যাভিষেক হইতেই অদ
প্রচলিত হইয়াছে। নৃসিংহ ও মুনীশ্বরের ব্যাখ্যা ঠিক নহে।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

২৩। ‘মরীচি, (২১ পৃষ্ঠা)

২৪। *Al Beruni India*. Vol. II, P. 6; *Canon Masudicus* of Al Beruni, trans. by.
E. C. Sachau in the notes to the above, p. 339.

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস

১৮৫৮—৬৭

গত তিন বৎসরের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় আমি ১৮৫৮ হইতে ১৮৬৭ সনের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা সাময়িক পত্রগুলির বিবরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই বিবরণ মোটেই পূর্ণাঙ্গ নহে। কারণ, সে-যুগের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাই এখন অপ্রাপ্য। নূতন অল্পসংখ্যক ফলে আমার প্রবন্ধগুলির ক্রটি ক্রমশঃ নজরে পড়িতেছে। বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকখানি নূতন পত্রিকার বিবরণ দেওয়া হইল, এবং পূর্বে যে-সকল পত্রিকার পরিচয় দিয়াছি, তাহাদেরও কোন-কোনটির বিবরণ নূতন করিয়া লিখিত হইল।

ভারতরঞ্জন

১৮৬২ সনের জাহুয়ারি মাসে আজিমগঞ্জে ধনসিদ্ধ যন্ত্রালয় হইতে 'বিশ্বমনোরঞ্জন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র কিছু দিনের জন্ত প্রকাশিত হয়। ওয়েঞ্জার লিখিয়াছেন, এই 'বিশ্বমনোরঞ্জন' ১৮৬৪ সনে 'ভারতরঞ্জন' নামে ধনসিদ্ধ যন্ত্রালয় হইতে বাহির হয়; 'বিশ্বমনোরঞ্জন' ও 'ভারতরঞ্জন'—উভয় পত্রেরই স্বত্বাধিকারী ছিলেন নবকিশোর সেন।*

অমাবস্যা

এই নামের একখানি মাসিক পত্রিকা ১৮৬২ সনের জুন (?) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' ৭ জুলাই ১৮৬২ তারিখে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

বিবিধ সংবাদ।...২২এ আষাঢ় শনিবার।...আমরা অমাবস্তা নামে এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার মূল্য দুই পয়সা মাত্র। অমাবস্তা জগৎকে যেমন আলোকময় করে, ইহা কি সেইরূপ করিবে।

পরিদর্শন

যদুনাথ তর্কভূষণের সম্পাদকত্বে 'ভারত পরিদর্শন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৬৩ সনের ১৫ই জুন প্রকাশিত হয়।† এক বৎসর যাইতে না যাইতেই পত্রিকাখানির প্রচার রহিত হইয়াছিল। ওয়েঞ্জার লিখিয়াছেন, সাপ্তাহিক 'ভারত পরিদর্শন' মাসিক আকারে 'পরিদর্শন' নামে ১৮৬৪ সনের শেষাংশে চিংপুর পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হয়।‡ ১৮৬৫ সনের ১৬ই জাহুয়ারি তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রাপ্ত পুস্তক-পত্রিকার তালিকার মধ্যে 'পরিদর্শন' পত্রিকার এইরূপ উল্লেখ আছে :—

Acknowledgments...Puridurshan, a Monthly Magazine in Bengalee, Calcutta.

* J. Wenger : *Catalogue of Sanskrit and Bengalee Publications printed in Bengal.* 1865. P. 58.

† ১৩৪২ সালের ২য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৯১ পৃষ্ঠায় আমি 'ভারত পরিদর্শক' পত্রের বিবরণ দিয়াছি। পত্রিকার নামটি 'ভারত পরিদর্শক' না হইয়া 'ভারত পরিদর্শন' হইবে।

‡ J. Wenger : *Catalogue.....p.* 58.

শিক্ষা দর্পণ । ও সংবাদসার

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনে ১২৭১ সালের বৈশাখ মাসে ‘শিক্ষা দর্পণ । ও সংবাদসার’ নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। কাগজখানি ফুলস্কেপ আকারের, প্রতি সংখ্যায় আট পৃষ্ঠা থাকিত। ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য দুই আনা এবং বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা ছিল। “এই পত্র হুগলী বুদ্ধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা সেই যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়।” প্রত্যেক সংখ্যায় “সংবাদসার” নাম দিয়া দুই-তিন পাটি সংবাদ থাকিত। প্রথম সংখ্যা ‘শিক্ষা দর্পণ । ও সংবাদসার’ প্রকাশিত ভূমিকার নিম্নোক্ত অংশপাঠে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে :—

শিক্ষাদর্পণ । যে সকল দেশে বিদ্যাচর্চার বাহুলা এবং স্বতরাং বিদ্যালয় এবং শিক্ষক সংখ্যার আধিক্য হইয়াছে, সর্বত্রই শিক্ষা-প্রণালী-প্রদর্শক এবং তৎসম্বন্ধীয় সংবাদ প্রদায়ক সাময়িক পত্রিকা সকল প্রচারিত হইয়া থাকে। যে ব্যাপারটি দেশের অবস্থা বিশেষ ঘটিলে স্বতঃই ঘটে, তাহার কারণান্তর অনুসন্ধান করা এক প্রকার নিম্প্রয়োজন বলিলেই হয়। দেশের সেই অবস্থা-বিশেষই তাহার কারণ।

বাঙ্গালা দেশের এক্ষণে সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে কিনা, নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। কিন্তু আমাদের মনে এই শিক্ষা দর্পণ প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় প্রথম উদ্ভূত হওয়ার, এবং কেবল ও কত ব্যক্তিই বা ইহার গ্রাহক হইবেন, তাহা নিশ্চয় রূপে না জানিয়াও ইহা লিখিতে, ছাপাইতে এবং নানা স্থানে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবার হেতু, দেশের উল্লিখিতরূপ অবস্থার সংঘটন অথবা আমাদের মনের ভ্রম মাত্র, এই দুই বই আর কিছুই হইতে পারে না। ঐ দুইয়ের মধ্যে কোনটী প্রকৃত কারণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখাই আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য।

যাহাদিগের নিকট এই পত্রিকা যাইবে যদি তাহারা সকলে অথবা তাহাদিগের মধ্যে অনেকে ইহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া অগ্রিম দেয় মূল্য প্রেরণ করেন, তবে বৃদ্ধি যৎ, দেশ মধ্যে বাহাতে এমন এক খানি কাগজ চলে, দেশের তাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে;— নচেৎ ইহা প্রস্তুত করিতে ও পাঠাইতে যে কএকটি টাকা লোকমান হইবে, তাহা—আমাদিগেরই আদ্যকল সেলামী!

এই পর্যন্ত লেখা হইয়াছে, এমন সময়ে কোন আত্মীয় ব্যক্তি আসিয়া কি লিখিতেছে যে বলিয়া কাগজ খানি লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন; আমরা, লেখাটা কেমন লাগিল বৃদ্ধিবার জন্ত তাহার মুখের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। বন্ধু মহাশয় কাগজ খানি রাখিয়া দিয়া কহিলেন “বেশ খোলা কথা লেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন ও সকল কথা লেখা হয় নাই—কাগজটী কত দিন অন্তর বাহির হইবে?” বৎসরের প্রথম হইতে বাহির করিবার জন্ত এইবারে যাচা করি; কিন্তু ইহার পর অবধি প্রতি মাসের শেষ দিবসে বাহির করিবার চেষ্টা করিব—অন্ততঃ পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বাহির হইবেই হইবে; মাসিক পত্রিকা সকল যেমন কখনই ছয় মাস সাত মাস বিলম্বে বাহির হয়, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহার সন্ন্যাস দশা হইবে না। “কাগজটী কত বড় হইবে?” সচরাচর চারি পেজী আট পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ হইবে;—প্রথম সংখ্যার পত্রিকা দেখিলেই গ্রাহকেরা ইহার আকার প্রকার বৃদ্ধিতে পারিবেন। “দাম কত হইবে?” অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা অর্থাৎ প্রতি কাগজ দুই আনা মাত্র; তাহার এক আনা ডাক ষ্টাম্প দিতে বাইবে অপর এক আনা ই কাগজের

মূল্য। এত অল্প মূল্যে কাগজ করিয়া কোন রকমে বাজে খরচ করা পোষায় না, এই জন্তই এক বৎসরের দাম আগামী নইব এবং কাগজটি এক বৎসর চালাইতে প্রতিজ্ঞা করিব; যদি এক বৎসর না চালাই, যিনি যে মূল্য দিবেন সমুদায় ফেরত পাঠাইয়া দিব। “বেস্ বলিলে, কিন্তু সংবাদপত্রের সম্পাদককে কে চিনে—ওরা একেলা একশ—লেখে এক জন বলে আমরা—সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের ঘর নাই দ্বার নাই—এমন কি, উহাদের নাম পর্য্যন্তও নাই—তুমি টাকা কেবল দিবে বলিলে কে বিশ্বাস করিবে?” বন্ধু মহাশয়ের এই প্রশ্নের কি উত্তর করিব ভাবিতে ছিলাম, এমন সময়ে আমাদের যন্ত্রাধ্যক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বন্ধু মহাশয় যে বৈষম্য উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া স্বয়ং গ্রাহক বর্গের টাকার জামিন হইতে স্বীকার করিলেন।

যন্ত্রাধ্যক্ষ বলিলেন টাকার জামিন হইব তাহাতে দুঃখ নাই—কিন্তু যেমন করিয়া এই সকল কাজ করিতে হয় তেমন করিয়া করিলে কাগজ খানির দ্বারা বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ হইতে পারিত। লোকে বলে নামে কি এসে যায়, কিন্তু নামে অনেক হয়। এই কাগজটির নাম শিক্ষা দর্পণ না রাখিয়া “হিন্দু দর্পণ” অথবা—তার চেয়েও ভাল—‘ব্রাহ্ম দর্পণ’ রাখুন—আর শিক্ষা প্রণালী ট্রাণালী লিখিব না বলিয়া গবর্ণমেন্টের দোষ লিখিব এই প্রতিজ্ঞা করণ—আর—লোকে টাকার কথা বলিতে হইলে যেমন আস্তে কহে সেই রূপ স্বরে—প্রাচীন সংবাদপত্রের সম্পাদক হই একটীর কিছু মর্যাদা রাখুন—তাহা হইলে আমিই প্রতিজ্ঞা করিতেছি দাম দুই আনা না হইয়া দুই টাকা করিয়া সবস্ক্রিপসন তুলিয়া দিব।

বন্ধু মহাশয় ঈষৎ হাস্ত সহকারে বলিলেন যন্ত্রাধ্যক্ষ মন্দ পরামর্শ দিতেছেন না। সেই পরিশ্রম করিতে হইবে—সেই ঝঞ্জাট পোহাইতে হইবে—তবে লাভটা ছাড় কেন? যেমন করে কাজ করিতে হয় তাহাই কেন কর না? আমরা উত্তর করিলাম, সকল কার্যেই অর্থলাভ আকাজকা করিলে চলে না; কোন কর্ম টাকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হয়, কোন কর্ম বা অল্প দিকে দৃষ্টি করিয়া করিতেই অধিক প্রবৃত্তি জন্মে। ধর্মের ধ্বজা তুলিয়া টাকা রোজকার করায় প্রবৃত্তি নাই—গবর্ণমেন্টকে গালি দিলে গবর্ণমেন্ট কিছুই বলেন না বিলক্ষণ জানা আছে, স্তবরাং “পাইকের বঁড়াই” করিয়া বাহাহুরী দেখাইতে নিতান্ত যুগা হয়—আর যন্ত্রাধ্যক্ষ যে ঘুস দিবার কথা বলিতেছেন, তাহার দিন আর নাই—এক্ষণকার সম্পাদকেরা আর টাকা খাইয়া মনকে ভাল ও ভালকে মন্দ বলেন না। তাঁহারা অনেকেই দেশহিতৈষী গুণে বিভূষিত হইয়া আছেন এবং যথেষ্ট পরিমাণে সংবাদপত্র দেখে নাই হইহি স্বীকার করিয়া থাকেন; স্তবরাং তাঁহারা যে স্প্রশস্ত পথের পথিক হইয়াছেন, যদি আমাদের দিকেও তন্মধ্যে সমভিব্যাহারী পাবেন, তবে সরল হৃদয়ে আনন্দ প্রকাশই করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

বন্ধু মহাশয় কহিলেন, কার্যটি এমন গুরুতর নহে যে পরিশ্রম করিলে সুসিদ্ধ না হয়—তবে আমার ইচ্ছা এই যে, শিক্ষাদর্পণ নাম দিয়াছ বলিয়া যেন কেবল বালকদিগকে কেমন করিয়া ক, খ, আর শতিকা প্রভৃতি শিখাইতে হয় তাবমাত্র লিখিয়াই নিবৃত্ত না হও। পল্লীগ্রামের লোকেরা কোন ভাল বিষয়ের কথা শুনিতে পাবেন না—তাঁহাদের মধ্যে কেবল দলাদলীর আর নিমন্ত্রণের কথাই হইয়া থাকে—অতএব প্রামাণিক সংবাদপত্র সমস্ত হইতে ফলোপধায়ক ও শুশ্রূষাজনক কতকগুলি কতকগুলি করিয়া সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলে তাঁদৃশ লোকদিগের অনেক উপকার দর্শিতে পারে; সংবাদগুলি কি পুরাতন হইবে বটে—কিন্তু নিতান্ত উপবাসশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরুষিতান প্রদান করিলেও পুষ্ট আছে। আর দেখ, যে সকল আইন প্রচলিত আছে এবং মধ্যে প্রস্তাবিত ও প্রচলিত হইয়া

বাইতেছে, তাঁহার মৰ্ম্ম অনেকেই অবগত হয় না, অথচ আইন না জানায় লোকের যে দোষ হয়, আইন কিছু সেই দোষের দণ্ড দিতে ছাড়ে না। অতএব নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমস্তের সারসংগ্রহ করিয়া দিলে পত্রিকার উপকারিতা এবং হস্তান্তর ইহার গৌরবেরও বৃদ্ধি হইতে পারিবে। ফলতঃ শিক্ষা শব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করিয়া লইলে শিক্ষাদর্পণের মধ্যে লিখা বাইতে না পারে এমন কথাই নাই। জন্মণ দেশীয় এক জন হুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন যে, শিক্ষা গ্রহণ করাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের এক মাত্র উদ্দেশ্য, মনুষ্য দেহ ধারণের আর দ্বিতীয় প্রয়োজন নাই।

- যন্ত্রাধ্যক্ষ এই সকল কথাতেও বিশিষ্ট রূপে তুষ্ট হইলেন না, বোধ হয়। কাগজের নামটা তাঁহাকে ভাল লাগে নাই। তিনি কাপি চাহিলেন এবং উল্লিখিত কথোপকথনে সকল কথাই এক প্রকার বলা হইয়াছে দেখিয়া ও অল্প রূপে লিখিবার সময়াভাব প্রযুক্ত ইহাই লিখিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলাম। ইহাই আমাদিগের প্রতিজ্ঞা পত্র।

১২৭৪ সালের পৌষ সংখ্যা (৪র্থ ভাগ, ৯ম সংখ্যা) হইতে পত্রিকাখানির নামকরণ হয় ‘শিক্ষা দর্পণ। ও মাসিক পত্রিকা’। এ-সম্বন্ধে ঐ পৌষ সংখ্যায় নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

বিজ্ঞাপন। বর্তমান মাস হইতে শিক্ষাদর্পণ ও বর্তমান মাসিক পত্রিকা সমিলিত হইল; এবং সেই জন্ত শিক্ষাদর্পণেরও পূর্বনাম পরিবর্তিত করিয়া ইহাকে “শিক্ষাদর্পণ ও মাসিক পত্রিকা” নাম দেওয়া গেল। বর্তমান মাসিক পত্রিকার গ্রাহকগণ, তাঁহাদের নিকট প্রাপ্য মূল্য হ্রাসিত বৃদ্ধোদয় যন্ত্রালয়ে শ্রীযুক্ত কালীনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। পৌষ মাস পর্যন্তই বর্তমান মাসিক পত্রিকার মূল্যই প্রাপ্য রহিল। পর মাস হইতে গ্রাহকগণকে ডাক মাহুল সমেত বার্ষিক ১১০ টাকা দিতে হইবে।

বর্তমান মাসিক পত্রিকার গ্রাহকগণ, বোধ হয় শিক্ষাদর্পণ ও মাসিক পত্রিকার প্রতি অনাস্থা করিবেন না।—শ্রীকেশবচন্দ্র মিত্র।

১৮৬৯ সনের ১৬ই এপ্রিল হইতে ভূদেব বাবু ‘এডুকেশন গেজেট’ পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার দ্বারা ‘শিক্ষাদর্পণ’ের প্রয়োজন মিটিতেছিল; সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি পরের মাস হইতে ‘শিক্ষাদর্পণ’ের প্রচার রহিত করেন।

‘শিক্ষা দর্পণ’ পত্রের ফাইল।—

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় :—১ম ভাগ হইতে ৪র্থ ভাগ, ১০ম সংখ্যা (মাস ১২৭৫ সাল)।

হিন্দু ইণ্টারপ্রীটার

কলিকাতার গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স ১৮৬৪ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাসে *Hindoo Interpreter* নামে একখানি দ্বিভাষিক—ইংরেজী-বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহা পাক্ষিক (“Bi-monthly”) এবং “More a politico ethical magazine” ছিল বলিয়া জে. ওয়েঙ্কার উল্লেখ করিয়াছেন।* এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হস্তগত হইবার পর ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ বাহা লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

We have to acknowledge with thanks the first number of the *Hindoo Interpreter*, a diglot newspaper, started by the enterprising Booksellers, Messrs. Gupta and Brothers. The first number of a periodical

is no criterion to judge it by, but if its conductors will earnestly and perseveringly pursue the high and laudable object they have in view, they will deserve success, though they may not command it. Diglots unfortunately do not find much favor in Bengal...

প্রত্নকল্পনান্দিনী

১৮৬৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কাশী হইতে ‘প্রত্নকল্পনান্দিনী’ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহা “পৌর্ণমাসিকা”—অর্থাৎ প্রতি-পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী।

‘প্রত্নকল্পনান্দিনী’ একখানি ধর্মমূলক মাসিক পত্রিকা। মুখ্যতঃ বৈদিক ধর্মের আলোচনা ও প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহ (এবং কোন কোন সংখ্যায় বঙ্গানুবাদ সহ) মূল বেদ এবং মীমাংসাদি দর্শন ইহাতে প্রকাশিত হইত। বৈদিক ধর্মের আলোচনা বিষয়ক সংস্কৃত প্রবন্ধ ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই থাকিত। সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক আলোচনাও থাকিত, তবে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইত না।

‘প্রত্নকল্পনান্দিনী’ পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নোক্ত শ্লোকমালা শোভা পাইত :—

ব্রহ্মাণ্ডকারুং করণাগুলিপুং কারুণ্যসিন্ধুং সমশক্তিমন্তম্।

বোধাগ্নিবেত্ত্বং মননেন মাণ্ডং বন্দেহমীশং জগদেকবন্ধুম্॥

সংস্টীকসাক্ষবেদদর্শনাদিকাশিনী সাধুবোধবন্ধিনী হনেকশাস্ত্রশালিনী।

রাজতাদসৌ স্চিতিচিৎপ্রফুল্লকারিণী প্রত্নকল্পনান্দিনী চিরংধরাবিহারিণী॥

‘প্রত্ন কল্প নন্দিনী’ পত্রিকার ফাইল।—

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি :—প্রথম তিন-চার বর্ষ (অসম্পূর্ণ)।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১ম-৪০শ সংখ্যা (১৮৬৭-৭০)

নব পত্রিকা

১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে, অর্থাৎ ১৮৬৭ সনের শেষাশেষি—‘নব পত্রিকা’ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন হীরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকাখানি ২৬৮ নং গরাগহাটা ষ্ট্রীটস্থ জ্ঞানদীপক যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া ১২-২০ নং কুমারটুলি ষ্ট্রীট হইতে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হইত। ‘নব পত্রিকা’য় ৬ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখা থাকিত। †

শ্রীমদ্রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* J. Wenger : *Catalogue of Sanskrit and Bengalee Publications printed in Bengal*. 1865. P. 58.

† Appendix (No. III) to the *Calcutta Gazette* for Wednesday June 10, 1868, quarter ending March 31st 1868.

সংযোজন

সোমপ্রকাশ

১৮৫৮ সনের ১৫ই নবেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫) ‘সোমপ্রকাশ’ প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাবূষণ।

১৮৬৫ সনের ২রা জানুয়ারি হইতে দ্বারকানাথ কিছু দিনের জন্ত ‘সোমপ্রকাশ’ের সম্পাদকীয় আসন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ তারিখের ‘সোমপ্রকাশে’ নিম্নোক্ত অংশটি প্রকাশিত হইয়াছে :—

বিজ্ঞাপন।

আমি ক্রমে ক্রমে নানা কার্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছি। তন্নিবন্ধন, সোমপ্রকাশে যথোচিত মনোযোগ দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমি আজি অবধি ইহার সম্পাদকতা ভার অস্ত্র হস্তে সমর্পণ করিলাম। কিন্তু সোমপ্রকাশ আমার প্রতিষ্ঠিত, ইহার প্রতি আমার সবিশেষ যত্ন আছে, অস্ত্র অস্ত্র অবশ্য কর্তব্য কার্যের অবিরোধে যতদূরসাধ্য সাহায্য দান দ্বারা ইহার উন্নতি সাধন চেষ্টায় কখন পরাঙমুখ হইব না।.....

শ্রীদ্বারকানাথ শর্মা।

দ্বারকানাথ যাহার হস্তে ‘সোমপ্রকাশ’-সম্পাদনের ভার অর্পণ করেন, তিনি মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ। ৫ জুন ১৮৬৫ তারিখে “সম্পাদকরূত বিজ্ঞাপন” প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার নীচে “শ্রীমোহনলাল বিদ্যাবাগীশ সোমপ্রকাশ সম্পাদক” নাম পাইতেছি।

১৮৭৮ সনে ভার্গাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট নামক আইন হইলে, “রাজকোপে পড়িয়া সোমপ্রকাশের এক বর্ষ আয়ু ক্ষয় হইয়া” যায়। পরে ১২ এপ্রিল ১৮৮০ (৮ বৈশাখ ১২৮৭) তারিখ হইতে “২৩শ ভাগ ১ম সংখ্যা” সোমপ্রকাশ “নব কলেবর ধারণ করিয়া...কলিকাতা মুজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্লজগ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত” হয়। এই সংখ্যায় “সোমপ্রকাশের পুনর্জন্ম” প্রস্তাব হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে “সোম-প্রকাশ” কি কারণে বন্ধ হয় এবং কেনই বা পুনঃপ্রকাশিত হয়, তাহার বিবরণ পাওয়া যাইবে।

যে কারণে সোমপ্রকাশের মৃত্যু হয়, তদ্বৃ্তান্ত বোধ হয় পাঠকগণ বিস্মৃত হন নাই।

সোমপ্রকাশের লাহোরস্থ সংবাদদাতার পত্র প্রকাশ হওয়াতে গবর্ণমেন্ট আমাদের নিকটে হাজার টাকা ডিপজিট ও মুচলকা চান। আমরা তদানে সমর্থ না হওয়াতে সোমপ্রকাশ প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।.....

যেখানে সোমপ্রকাশের পুনর্জন্ম লাভ হয় তদ্বৃ্তান্ত এই—

সোমপ্রকাশের ছগলীস্থ সংবাদদাতা বাবু ছগীপ্রসন্ন ঘোষ আমাদের অজ্ঞাতসারে বঙ্গদেশের মাননীয় লেপ্টনেন্ট গবর্ণর আশালি ইউন সাহেবের নিকটে মোচলকা ও ডিপজিট বিনা সোমপ্রকাশের পুনঃপ্রচারার্থ আবেদন করেন [২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৮০]।.....

কয়েক দিন অতীত হইলে পর ঐ ছগীপ্রসন্ন আমাদের নিকটে এক খানি পত্র লিখিলেন এবং

সেই সঙ্গে লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের কৃত রেজোলিউশনের একটা নকল পাঠাইয়া দিলেন। তাহা এই—

Dated the 16th March 1880.

.....Ordered that the petitioner be informed that no application such as this can be considered unless submitted by the Editor or publisher of the "Someprakash" and that if the Editor desires to make any representation on the subject of the publication of his Newspaper he can do so verbally to the Lieutenant Governor or to the Secretary to the Government.

.....দুর্গাপ্রসন্নের পত্র পাইয়া আমাদের বিষম চিন্তা ও সঙ্কট উপস্থিত হইল।.....আসন্নীয় বন্ধুবান্ধবেরা সোমপ্রকাশের প্রচারার্থ পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন।.....

গত ২০এ চৈত্র হিন্দুপেট্রিফট সম্পাদক অনরোবল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পালকে সঙ্গে লইয়া মাননীয় লেপ্টনন্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, আমরা পূর্বে যেরূপ স্বাধীনভাবে স্বমত প্রকাশ করিয়া সোমপ্রকাশের কার্য সম্পাদন করিতাম, সেইরূপই করিব। তিনি একখানি লিখিত আবেদন করিতে কহিলেন।

আবেদন করা হইলে, ১০ই এপ্রিল ১৮৮০ তারিখে বাংলা-সরকার দ্বারকানাথকে 'সোমপ্রকাশ' পুনঃপ্রকাশ করিবার অনুমতি-পত্র পাঠাইয়াছিলেন।

সোমপ্রকাশ প্রচারের শেষোক্ত অনুমতি পত্র আমাদের হস্তগত হইলে পর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত হোরেস ককরেল সাহেব আমাদেরকে ডাকাইয়া লইয়া যান এবং এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, সোমপ্রকাশে অসঙ্গত বিষয় প্রকাশ না হয়, এবং আমরা স্বচক্ষে না দেখিয়া কোন বিষয় মুদ্রিত হইতে না দি।.....

অতঃপর ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন সভা ও বাবু লালমোহন ঘোষ মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ একান্ত আবশ্যিক। বাবু লালমোহন ঘোষ উক্ত সভার প্রেরিত হইয়া সোমপ্রকাশের নিমিত্ত বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডে গিয়া পার্লামেন্টে মহাসভায় সোমপ্রকাশের মৃত্যুনিবন্ধন তুল্ম আন্দোলন করিয়াছেন।.....

ভ্রম-সংশোধন

“কালীপ্রসন্ন সিংহ”

১৩৪৪২য় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত “কালীপ্রসন্ন সিংহ” প্রবন্ধে একটি ভুল আছে। “কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনা”-বিভাগে (পৃ. ১০৩) যে পুস্তকখানিকে ‘কল্কর্তার হাট্‌হুদ’ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম, সেখানি প্রকৃতপক্ষে ১৮৬৫ সনে প্রকাশিত ‘সমাজ’ কুচিত্র। মাতৃভূমির প্রতি বঙ্গীয় যুবকগণের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত এক নিশাচর প্রণীত। ইহা ‘হতোম’কে উৎসর্গীকৃত। এই পুস্তকের দুইটি খণ্ড বিলাতে আছে।

পুস্তকখানি পাঠ করিলে কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনা বলিয়াই ধারণা হয়। এ বিষয়ে আমরা আরও বিস্তৃত অনুসন্ধান করিতেছি।

শ্রীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান

সূচনা

অনেকের ধারণা, প্রাণিবিজ্ঞান একটা অতি আধুনিক শাস্ত্র ও প্রধানতঃ যুরোপীয়গণই ইহার উদ্ভোক্তা। প্রাণিজগতের সম্যক ও ধারাবাহিক পর্যালোচনা মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়াছে, ইহাই অনেকের মত। কিন্তু ইহা ভুল। আমাদের দেশের মনীষিগণ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে হইতেই জীবগণের রীতি-নীতি, স্বভাব, গঠন, জননক্রিয়া, বুদ্ধিবৃত্তি, সন্তান পালন প্রভৃতি বিষয় লক্ষ্য করিয়া, নানা সংস্কৃত গ্রন্থে, নানা কথাচ্ছলে তৎসম্বন্ধে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, জীবদিগের বিভিন্ন-রূপ শ্রেণীবিভাগও তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন; জীবগণের সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে ভুলেন নাই। তাহার পর বীজ-বিজ্ঞান ও ভ্রূণশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহারা একটা নির্ভুল ধারণা রাখিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যেরূপ ধারাবাহিক ভাবে শত সহস্র বৎসর পূর্বে তাঁহারা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে সত্য সত্যই অবাক হইয়া যাইতে হয়। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ, ভাগবত, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, কাব্য প্রভৃতি বহু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থে আমরা বহু প্রাণিবিষয়ক শ্লোক পাইয়া থাকি। কথা ও উপমাচ্ছলে শ্লোকগুলির অবতারণা করা হইলেও উহা হইতে আমরা বহু মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান পাই। এই বিক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি সম্বলন করিয়া একত্রিত করিলে উহাই একটি সৃষ্টিস্থিত প্রাণিবিজ্ঞান গ্রন্থে পরিণত হইতে পারে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, আমাদের দেশে পূর্বে শুধু প্রাণিবিজ্ঞান বলিয়া কোন পুস্তক ছিল কি না? কে বলিতে পারে যে, ছিল না? পূর্বেকার কয়খানি পুস্তকই বা আমরা পাইয়া থাকি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশবশতঃ অনেক প্রাচীন পুস্তকই গ্রন্থকীটের উপদ্রবে নষ্ট হইয়া যায়। তাহা ছাড়া বৈদেশিক আক্রমণ ও যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতিতে কত পুরাতন হিন্দু ও বৌদ্ধ পুস্তকাগার যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহা ছাড়া প্রয়োজনের সময় নিছক ধর্ম ও দর্শনমূলক গ্রন্থাদি ছাড়া অত্যাধিকারিক পুস্তকগুলির রক্ষাকল্পে ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ তত সচেতন হন নাই। ফলে দর্শন ও ধর্মপুস্তকগুলির তায় বিজ্ঞানের পুস্তকগুলি, বিশদ্যয়ের মধ্যে প্রায়ই রক্ষা পায় নাই। কয়েকখানি চিকিৎসাবিজ্ঞান ছাড়া প্রায় সমুদয় ইতিহাস, অর্থনীতি ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পুস্তক রক্ষা পায় নাই। যে দুই একখানি আমরা এখন পাইয়া থাকি, তাহাদের “বিষয়ের” সমধিক উৎকর্ষ হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, বহুকাল হইতেই ঐ বিষয়গুলি এদেশে আলোচিত হইয়া আসিতেছিল এবং এ সম্বন্ধে বহুবিধ পুস্তক সে যুগে প্রচলিত ছিল। কিরূপ প্রচেষ্টা দ্বারা চরক ও সুশ্রুত আদি পুস্তকগুলি রক্ষিত হইয়াছে, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। সে যুগে বৃদ্ধ চিকিৎসকগণ মৃত্যুকালে “অমুক

বুকের তলদেশে তাম্রপেটিকায় আয়ুর্বেদপুস্তকাদি প্রোথিত আছে” বলিয়া তাঁহাদের সন্ততিদিগকে নির্দেশ দিয়া যাইতেন। রাজ্যবিপ্লবের পর সন্ততিগণ সেই নির্দেশ বা উইল অনুযায়ী পিতা বা পিতামহের মৃত্যুর বহু বৎসর পর সেই সকল পুস্তক উদ্ধার করিতে সমর্থ হইত। এইরূপ প্রচেষ্টায় কেবলমাত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় ধর্ম, দর্শন ও চিকিৎসা-পুস্তকগুলিই রক্ষিত হইয়াছিল। বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি ধর্ম ও দর্শনপুস্তকাদির তুলনায় সে যুগে অল্প প্রয়োজন বিধায় এই ভাবে রক্ষিত হয় নাই।

অনেক তথ্য বা জ্ঞান আবার এদেশে শ্রুতি বা স্মৃতি দ্বারা শিষ্যপরম্পরায় রক্ষিত হইত। কদাচিৎ উহা লিপিবদ্ধ হইত। অধুনাপ্রাপ্ত যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থে কথাচ্ছলে প্রাণিবিষয়ক তথ্যের উল্লেখ দেখা যায়, কে বলিতে পারে যে, তাহা কোনও একখানি স্থলিখিত তৎকালীন প্রাণিবিজ্ঞানপুস্তক হইতে গৃহীত হয় নাই? বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, ঐ সকল শ্লোক কোনও একখানি অধুনালুপ্ত প্রাণিবিজ্ঞানের পুস্তক হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। প্রমাণস্বরূপ আমরা অনেক সময় একই প্রাণিবিষয়ক শ্লোক বিভিন্ন পুস্তকগুলির মধ্যে সমভাবেই পাইয়া থাকি। এমন কি, কোনও কোনও শ্লোকে উহাদের ভাষা ও শব্দের মধ্যেও কোন পার্থক্য দেখা যায় না। প্রমাণস্বরূপ মাত্র কয়েকটি তুলনামূলক শ্লোক বিভিন্ন পুরাণ হইতে নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পরশর উবাচ

তির্য্যাক্শ্রোতাস্ত যঃ প্রোক্তস্তৈর্য্যগ্‌যোতঃ স উচ্যতে ।

উর্দ্ধশ্রোতাস্ততঃ ষষ্ঠো দেবসর্গস্ত স স্মৃতঃ ॥

ততোহর্কাক্শ্রোতসঃ সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মাহুষঃ ॥—বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাংশ, ৫অঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

তির্য্যাক্শ্রোতাস্ত যঃ প্রোক্তস্তৈর্য্যগ্‌যোতঃ স পঞ্চমঃ ।

ততোহর্দ্ধশ্রোতসাং ষষ্ঠো দেবসর্গস্ত স স্মৃতঃ ॥

ততোহর্কাক্শ্রোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মাহুষঃ ॥—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৪৯ অধ্যায় ।

উপরিউক্ত শ্লোক দুইটিতে যে সকল জীব চারিটি পায়ের উপর ভর দিয়া চলে ও তজ্জনিত তির্য্যক্‌গতিতে আহাৰাদি গ্রহণ করে, তাহাদের তির্য্যক্‌ জীব বলা হইয়াছে ও যে সকল জীব সোজা হইয়া চলে ও তাহার ফলে আহাৰাদি উপর হইতে নিয়ে গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অর্ধাক্‌ জীব বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, শব্দ দুইটি শ্রেণীবাচক ও বৈজ্ঞানিক শব্দ। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রথম শ্লোকটি বিষ্ণুপুরাণকার পরাশরের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন ও দ্বিতীয় শ্লোকটি মার্কণ্ডেয় তাঁহার মার্কণ্ডেয় পুরাণে নিজের নামে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, গ্রন্থকারদ্বয় পৃথক পৃথক ভাবে তৎকালীন কোনও একখানি পুস্তকবিশেষ হইতে শ্লোক দুইটি

নিজ নিজ গ্রন্থে তুলিয়া লইয়াছেন মাত্র। আর দুইটা অনুরূপ শ্লোক উক্ত পুস্তক দুইখানি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

পরশর উবাচ

গৌরজঃ পুরুষা মেঘা অশ্বা অশ্বতরাঃ থরাঃ ।

এতান্ গ্রাম্যান্ পশূন্ প্রাহরারণ্যাংশ্চ নিবোধ মে ॥

স্থাপদো দ্বিথুরো হস্তী বানরঃ পক্ষিপঞ্চমঃ ।

ঔদকাঃ পশবঃ যষ্ঠাঃ সপ্তমাস্ত সরীসৃপাঃ ॥—বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাংশ, ৫ অঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

গৌরজো মহিষো মেঘঃ অশ্বাশ্বতরগর্দভাঃ ।

এতান্ গ্রাম্যান্ পশূনাহরারণ্যাংশ্চ নিবোধ মে ॥

স্থাপদং দ্বিথুরং হস্তী বানরাঃ পক্ষিপঞ্চমাঃ ।

ঔদকাঃ পশবঃ যষ্ঠাঃ সপ্তমাস্ত সরীসৃপাঃ ॥—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৪২ অধ্যায় ।

উপরিউক্ত শ্লোক কয়টা ছাড়া বিভিন্ন সংস্কৃত পুস্তকাদি হইতে এই বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ আরও চারিটা শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে শ্লোক কয়টা লিখিত। উহা পাঠে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বেরকার হিন্দুদিগের সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়। শ্লোক কয়টিতে জলজ জীব হইতে স্থলজ জীবের উৎপত্তি ও পরে স্থলজ জীব হইতে পর পর শ্বেদজ, অণুজ, জরায়ুজ ও সর্বশেষে বানর ও মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। একটা জীব হইতে অপর একটা জীবের উৎপত্তি হইতে কত লক্ষ বৎসর সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহারও একটা হিসাব দেওয়া আছে। শ্লোক কয়টির রচনা বিভিন্নরূপ হইলেও বক্তব্য বিষয় একই। সময় নির্দেশ ছাড়া প্রতিপাত্ত বিষয়ে শ্লোক-রচয়িতাগণ সম্পূর্ণরূপেই একমত। শ্লোক কয়টিতে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে কথাচ্ছলে বিজ্ঞানের অবতারণা করা হইয়াছে।

চতুরশীতিলক্ষানি চতুর্ভেদাশ্চ জন্তবঃ । অণুজাঃ শ্বেদজাশ্চ উদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ ॥

একবিংশতিলক্ষানি হণ্ডজাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ । শ্বেদজাশ্চ তথৈবোক্তা উদ্ভিজ্জাস্তং-
প্রমাণতঃ ॥

জরায়ুজাশ্চ তাবন্তো মনুষ্যাশ্চ জন্তবঃ । সর্কষামেব জন্তুনাং মানুষস্তং স্থূলভম্ ॥

—গরুড়পুরাণ, ২য় অধ্যায় ।

জলজা নবলক্ষানি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ । ক্রময়ো রুদ্রসংখ্যাকা পক্ষিণাং দশলক্ষকম্ ॥

ত্রিংশলক্ষানি পশবশ্চতুল্লক্ষানি মানুষাঃ । সর্কষোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোহভ্যাগম্ ॥

—নিবন্ধতত্ত্ববিষ্ণুপুরাণ ।

স্বাবরাস্ত্রিংশলক্ষাশ্চ জলজা নবলক্ষকাঃ । কুমিজা দশলক্ষাশ্চ রুদ্রলক্ষাশ্চ পক্ষিণঃ ॥

পশুবো বিংশলক্ষাশ্চ চতুলক্ষাশ্চ মানবাঃ । এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্মপজায়তে ॥

—কৰ্মবিপাক ।

স্বাবরং বিংশতেলক্ষং জলজং নবলক্ষকম্ । কুর্মাশ্চ নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ ॥

ত্রিংশলক্ষং পশূনাঞ্চ চতুলক্ষঞ্চ বানরাঃ । ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কৰ্মাণি সাধয়েৎ ॥

—বিষ্ণুপুরাণ ।

এইরূপে পুরাণ ও তৎকালীন বিভিন্ন সংস্কৃত পুস্তকাদি পাঠে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় আখ্যানভাগেই উক্তরূপ একার্থক শ্লোক পাওয়া যায়। এমন কি, তাহাদের ভাষার মধ্যেও প্রায় কোন পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু ঐ পুস্তকগুলির দর্শনসম্বন্ধীয় আখ্যানভাগে ভাষা, অর্থ ও ভাবের প্রচুর প্রভেদ লক্ষিত হয়। দর্শনভাগে তাঁহারা ভিন্নমত হইলেও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় শ্লোকে তাঁহারা এক মতই প্রকাশ করেন; শব্দগুলিও ব্যবহার করেন এক রকমের। তাহার পর ঐ শ্লোকগুলির লিখনভঙ্গি হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐ শ্লোকগুলি অধুনালুপ্ত তৎকালীন কোনও বিজ্ঞানপুস্তকে প্রচলিত মতবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কতক বা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে; কতকগুলি বা হুবহু নকল করিয়া লওয়া হইয়াছে। উপরের “পরিকীর্তিতা” শব্দটী প্রাণি-ধানযোগ্য। তাহার পর ধারাবাহিক ও স্থলিখিত বিজ্ঞানশাস্ত্রমাতেই কতকগুলি পরিভাষা-মূলক বা Technical বৈজ্ঞানিক শব্দ থাকে। আমাদের তথাকথিত প্রাণিবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় শ্লোক বা পুস্তকগুলিতেও ঐরূপ বহু শব্দ ব্যবহৃত হইত। জরায়ুজ, অণ্ডজ, রসজ, স্বেদজ, পোতজ, উদ্ভিজ্জ, স্থলজ, জলজ, উর্দ্ধক, অর্দ্ধক, অর্ধাক, গন্ধবেদী, ওদক, সরীসৃপ, একতোদত, উভয়তোদত, একশফ, দ্বিশফ, পঞ্চনথ, রূপবেদী, শফ, নথ, স্পর্শবেদী, শব্দবেদী, কৰ্মবেদী, অনস্থিকা, অপাদা, কোশস্থ, চৰ্মপক্ষ, নৃপুরুক, খড়্গী, শৃঙ্গী, জজ্বাল প্রভৃতি শ্রেণীবাচক শব্দগুলি যে প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষামূলক বা Technical শব্দ, তাহাতে কোন ভুল নাই। ঋগ্বেদ হইতে পুরাণ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের গ্রন্থগুলির মধ্যে উক্ত শব্দগুলির সম অর্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার ইহার সত্যতা প্রমাণ করে। প্রমাণস্বরূপ নিম্নে মাত্র কয়েকটি শ্লোক প্রদত্ত হইল।

“যে কে চোভয়তোদতঃ”—ঋগ্বেদ, পুরুষসূক্ত ।

“রূপভেদবিদস্তত্র ততঃ চোভয়তোদতঃ”—শ্রীমদ্ভাগবত ।

“পশবশ্চ মুগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ”—মনুসংহিতা ।

“ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেদ্যহরুহুহ্মৈশ্চকতোদতঃ” ॥ মনুসংহিতা, ৫ অঃ ।

উক্ত শ্লোক কয়টি যথাক্রমে ঋগ্বেদ, ভাগবত ও মনুসংহিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। নতিনখানি গ্রন্থই বিভিন্ন গ্রন্থকার দ্বারা বিভিন্ন যুগে লিখিত বা সংকলিত হইয়াছে। কিন্তু

তিনখানি গ্রন্থেই আমরা এই “উভয়তোদত” ও “একতোদত” শব্দ দুইটা একই অর্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাই। হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞানে ‘একতোদত’ অর্থে যে সকল জীবের একবার করিয়া দাঁত উঠে, তাহাদের বুঝায় ও ‘উভয়তোদত’ অর্থে যে সকল জীবের দুইবার দাঁত উঠে অর্থাৎ দুধ-দাঁত পড়িয়া গিয়া তেলা-দাঁত উঠে, তাহাদিগকে বুঝায়। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। এখন এই শব্দ দুইটির বিভিন্ন গ্রন্থে একই অর্থে উক্তরূপ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, এই দুইটা শব্দ পরি-ভাষামূলক বৈজ্ঞানিক শব্দরূপেই তৎকালে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। এইরূপ বহু বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রাচুর্য্য হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, প্রাণিবিজ্ঞান বলিয়া একখানি পৃথক্ বিজ্ঞানশাস্ত্র হয় ত আমাদের দেশে পুরাকালে প্রচলিত ছিল। ইহা ছাড়া শাস্ত্রকারগণ নিজ শাস্ত্রে প্রাণিসম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির উল্লেখ করিবার সময় প্রায়ই “ইতি কথিতঃ” বলিয়া তাঁহাদের বক্তব্য শেষ করেন। ইহার কারণ, বোধ হয় পুরাকালে অপর কোনও গ্রন্থকার বা তাঁহার গ্রন্থের নাম নিজগ্রন্থে উল্লেখ করার প্রথা ছিল না। কিংবা হস্তলিখিত পুথিগুলি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে ও কবিতাগুলির সামঞ্জস্য রক্ষার জগুই এই রীতির প্রচলন ছিল। প্রমাণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটা পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পংক্তি কয়টা দাল্ভ্য কতৃক লিখিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি কক, কারওব ও ককজীব সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন। সেই বিবরণ যে, কোন একখানি অল্পজ্ঞানামা (Unnamed) পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা প্রকারান্তরে তিনি বলিয়াই দিয়াছেন। উপরিউক্ত পক্ষী ও হরিণ জীব সম্বন্ধে বিবরণসম্বলিত নিম্নে উদ্ধৃত পংক্তি কয়টা অল্পধাবন করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। তবে কোন পুস্তক হইতে পঙ্ক্তি কয়টা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। পুস্তকখানি এখনও পাওয়া যায় নাই।

“কুলেচরমাহ.....ককঃ শরদি শৃঙ্গত্যাগী।

তল্লক্ষণং উচ্যতে—বিকটবহুবিষাণঃ শম্বরাকারদেহঃ, সলিলতটচরিত্বাৎ
সঞ্চরেভ্যো বিচিত্রঃ। ত্যজতি শরদি শৃঙ্গং রৌতি”—ইত্যসৌ ককঃ স্ত্রাৎ।

কারওবঃ শুক্লহংসভেদোহল্লঃ অন্ত্রে করহরমাহুঃ।

উক্তকঃ—‘কারওবঃ কাকবক্ত্রে। দীর্ঘাঙিষ্ণঃ কৃষ্ণবর্ণভাক্’ ইতি।

প্রসহানাহ.....ককঃ দীর্ঘচকুর্ঘ্রহাপ্রাণঃ।

উক্তকঃ—ককঃ স্ত্রাৎ ককমল্লাখ্যো বাণপত্নাহ পক্ষকঃ।

লোহপৃষ্ঠো দীর্ঘপাদঃ পক্ষাধঃ পাণ্ডুবর্ণভাক্ ॥” ইতি।

দর্শনপুস্তকাদিতেই আমরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু প্রাণিবিষয়ক শ্লোক পাইয়া থাকি। ধরা যাউক, কোনও একজন দর্শনিক দর্শনসম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিলেন। সহজেই বুঝা যায় যে, একজন দার্শনিকের পক্ষে ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া বিশেষ করিয়া প্রাণিজগতের তথ্যসমৃদ্ধ স্বকীয় জীবনে সংগ্রহ করিয়া উঠা সম্ভব নয়। অথচ তাঁহার

সেই দর্শনশাস্ত্রে নানা কথা ও উপমাচ্ছলে তাঁহাকে শুধু প্রাণিবিষয়ক কেন, উদ্ভিদশাস্ত্র সম্বন্ধেও অনেক বিষয় উল্লেখ করিতে দেখা গেল। এখন আমরা যদি বলি যে, পূর্বে প্রাণি-বিজ্ঞান বলিয়া একাধিক শাস্ত্রগ্রন্থ ছিল এবং উহা হইতেই নানা সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ নানা প্রাণিবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে বোধ হয়, বিশেষ অত্যাশ্চর্য্য হয় না।

বস্তুতঃ প্রাণিবিজ্ঞান বলিয়া একটা পৃথক্ বিজ্ঞা যে পুরাকালে এদেশে বিद्यমান ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা নিম্নলিখিত উক্তিটীতে পাইয়া থাকি। শুধু প্রাণিবিজ্ঞান কেন, অত্যন্ত বহুবিধ অধুনালুপ্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের উল্লেখ ইহার মধ্যে আমরা পাইয়া থাকি। উহাতে নারদ, শনৎকুমারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কি কি শাস্ত্র বা বিজ্ঞা অধ্যয়ন করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে বলিতেছেন। অধীত বিষয়গুলির মধ্যে আমরা ঋগ্বেদঃ, যজুর্বেদঃ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, পিত্র্য বা পিতৃসম্বন্ধীয়, রাশি বা অঙ্কশাস্ত্র, দৈব বা আবহাওয়া, নিধি বা ধনবিজ্ঞা, বাক্যোক্ত্য বা তর্কশাস্ত্র, একায়ন বা নীতিশাস্ত্র, দেববিজ্ঞা বা ভূমিকম্পাদি উৎপাতসম্বন্ধীয় বিজ্ঞা, ভূতবিদ্যা বা প্রাণিবিজ্ঞান, ক্ষত্রবিজ্ঞা বা যুদ্ধশাস্ত্র, নক্ষত্রবিজ্ঞা, সর্পবিদ্যা, দেবজন বা সৃষ্টিবিজ্ঞার বা শাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই।

“ঋগ্বেদঃ ভগবোহধ্যোমি যজুর্বেদঃ সামবেদমাত্মকং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং, পিত্র্যঃ রাশিঃ দৈবং নিধিঃ বাক্যোক্ত্যমেকায়নং, দেববিজ্ঞাং ব্রহ্মবিজ্ঞাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিজ্ঞাং নক্ষত্রবিজ্ঞাং সর্পদেবজনবিজ্ঞাম্ এতদভগবোহধ্যোমি ॥”—হান্দোগ্য, ৭অ, ১ খণ্ড, ২।

ভূত অর্থে মনুষ্যোত্তর প্রাণীদিগকেই বুঝায়। দর্শনশাস্ত্রে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক নামে মনুষ্যদিগের তিন প্রকার দুঃখের কথা বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে আধিভৌতিক দুঃখ অর্থাৎ যে দুঃখ হিংস্রজন্তু আদি দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। ধর্মশাস্ত্রে ভূতবলি অর্থে পশু পক্ষী প্রভৃতিকে প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রী বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং ভূত অর্থে যে প্রাণিবর্গই বুঝাইয়া থাকে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। সর্বভূতে দয়া অর্থে সর্বপ্রাণীতে দয়া বুঝায়। এই জন্ত “ভূতবিদ্যা” অর্থে আমরা প্রাণিবিদ্যাই বুঝিয়াছি। এই ভূতবিদ্যা ছাড়া ‘ভূততন্ত্র’ বলিয়া অপর একটা বিজ্ঞার উল্লেখ আমরা কোনও কোনও শাস্ত্রগ্রন্থে পাই বটে, কিন্তু আমার মতে উহা একটা পৃথক্ শাস্ত্র। ভূতবিদ্যা বলিতে প্রাণিবিদ্যা ও ভূততন্ত্র বলিতে মানসিক রোগের চিকিৎসামূলক কোনও গ্রন্থ বুঝাইত বলিয়াই মনে হয়। উপরের অংশে ভূতবিদ্যা বা প্রাণিবিজ্ঞান ব্যতীত সর্পবিজ্ঞারূপ প্রাণিবিজ্ঞানের একটা বিভাগবিশেষেরও উল্লেখ দেখা যায়। তৎকালে সর্পের সংখ্যা-ধিক্যবশতঃ সর্পভীতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বোধ হয় বিশেষ করিয়া এই সর্পবিদ্যার প্রচলন হইয়াছিল। তাই আয়ুর্বেদাদি পাঠে কুমি কীটাদিরূপে সর্পাদি সম্বন্ধেও অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। ইহা ছাড়া প্রাণিবিষয়ক বহু বিজ্ঞান-শাস্ত্র যেরূপে ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ কয়েকখানি গ্রন্থের নামোক্ত আধুনিক সংস্কৃত

সাহিত্যাদিতে আমরা পাইয়া থাকি। প্রমাণস্বরূপ শালিহোত্র গ্রন্থের কথা বলা যাইতে পারে। শালিহোত্রই ইহার রচয়িতা ছিলেন। পঞ্চতন্ত্র উপাখ্যানে আমরা ইহার উল্লেখ পাই মাত্র। কতিপয় অশ্ব ও বানর গুড়িয়া গেলে, কোনও রাজা এই শালিহোত্রের সন্ধান লন। পঞ্চতন্ত্রে ইহার বর্ণনা আছে। কিন্তু এই শালিহোত্র এখন একখানি অধুনালুপ্ত গ্রন্থ। ইহার কোনও খোজ এখনও পাওয়া যায় নাই। ইহা ছাড়া 'আগদ তন্ত্র' নামক এক প্রকার শাস্ত্রের উল্লেখ আমরা আয়ুর্বেদাদি গ্রন্থে পাই। কীটবিজ্ঞা এই আগদ তন্ত্রের অন্তর্গত। কিন্তু এই তন্ত্রের একখানি পুস্তকও আমরা পাই নাই। তবে পালকপীয়-প্রণীত গজায়ুর্বেদ এবং জয়দত্ত ও নকুল-প্রণীত অশ্ব-গবায়ুর্বেদ প্রভৃতি কয়েকখানি চিকিৎসামূলক প্রাণিবিজ্ঞান এখনও পাওয়া যায়। সে যুগে অশ্ব, গজ ও গবাদির রক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার জন্ত হিন্দুগণ এই সকল শাস্ত্রগ্রন্থ বিশেষ ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই কারণেই ইহাদের কয়েকখানি এখনও আমরা পাইয়া থাকি। এই চিকিৎসামূলক প্রাণিবিজ্ঞান ছাড়া কয়েকখানি সাধারণ প্রাণিবিজ্ঞানও আমরা পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে শৈনিকশাস্ত্রম্ (Hucking birds) ও যুগপক্ষিশাস্ত্রম্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমখানি স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে উদ্ধার করেন, দ্বিতীয়খানি স্বর্গীয় ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ বিহার হইতে প্রাপ্ত হন। দুইখানিই প্রাচীন হস্ত-লিখিত গ্রন্থ। পুস্তক দুইখানি যে সঙ্কলিত গ্রন্থ, তাহা উহার প্রতিপাণ্ড বিষয় হইতেই বুঝা যায়। ইহা ছাড়া আর একখানি স্থলিখিত প্রাণিবিজ্ঞান পুস্তকও পাওয়া যায়; উহার নাম তত্ত্বার্থাধিগম। উমাশ্বাতি নামক একজন জৈন কবি উহার রচয়িতা। ইহা ছাড়া দাল্ভ্য ও লাদায়নের প্রাণিসম্বন্ধীয় বিবরণও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই সকল গ্রন্থ হইতে আমরা সবিশেষ বুঝিতে পারি যে, পুরাকালে হিন্দুস্থানে প্রাণি-বিজ্ঞানের বিশেষ প্রচলন ছিল। চেষ্টা করিলে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এইরূপ আরও অনেক গ্রন্থ উদ্ধার করা যাইতে পারে। আমি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া নিম্নলিখিত কয়খানি প্রাচীন প্রাণিবিজ্ঞানের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, উহাদের একখানিও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। হয় ত সব কয়খানিই লুপ্ত হইয়া থাকিবে। নিম্নে উহাদের নামের একটা তালিকা দিয়া বর্তমান প্রস্তাব শেষ করিলাম। পুস্তকগুলি সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিব।

- ক। সরীসৃপবিষয়ক।—১। লতাবিস্ফোটক। ২। উজ্জয়িনী গ্রন্থ। ৩। ভূসরীসৃপ-রাজভাষা। ৪। নাগার্জুনতন্ত্র। ৫। মণিলতা গ্রন্থ। খ। পক্ষিবিষয়ক—১। খেচরীমালা। ২। বিহঙ্গমতন্ত্র। ৩। হিমাঙ্গিমালাতন্ত্র। ৪। ভূমালা গ্রন্থ। ৫। ভীষ্মরী গ্রন্থ। গ। স্তম্ভপায়িবিষয়ক।—১। পুষ্পমালা গ্রন্থ। ২। শকুন্ত লেখ। ৩। নিষাদতন্ত্র। ৪। নিষাদমহাভাষ্য। ৫। জীবধর্ম। ৬। সংগোপন গ্রন্থ। ৭। শাখামৃগ গ্রন্থ। ঘ। প্রাপ্ত গ্রন্থাদি—১। যুগপক্ষিশাস্ত্রম্। ২। তত্ত্বার্থাধিগম। ৩। শৈনিকশাস্ত্রম্। ৪। গজায়ুর্বেদ। ৫। অশ্বায়ুর্বেদ। ৬। দাল্ভ্যবিবরণ। ৭। লাদায়নবিবরণ।

এইবার কি ভাবে আমাদের নষ্ট প্রাণিবিজ্ঞান উদ্ধার লাভ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমরা জানি, পূর্বকালে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ চীন ও তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া, তিব্বতের বৌদ্ধ মঠ প্রভৃতিতে রক্ষিত ছিল। বিদেশীয়দিগের আক্রমণের সময় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ নেপালে নীত হইয়াছিল। তাহাদের অনেকগুলি নেপাল দরবার-পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। ঐ সকল দেশে শীতের প্রাধান্য হেতু গ্রন্থকীটের উপদ্রব নাই। পুস্তকগুলিও নষ্ট হয় নাই। বিশেষ অত্নসন্ধান করিলে ঐ দুইটি দেশ হইতে হিন্দুর অধুনালুপ্ত প্রাণিবিজ্ঞানের উদ্ধার হইতে পারে। কিন্তু উহা যদি নাও সম্ভব হয়, তাহা হইলেও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। নানা সংস্কৃত গ্রন্থ, কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রসমুদয়ে বিক্ষিপ্ত প্রাণিসম্বন্ধীয় তথ্যসকল একত্র সংগ্রহ করিলে উহাই একটা ধারাবাহিক প্রাণিবিজ্ঞানশাস্ত্রে পরিণত হইতে পারিবে। লুপ্ত প্রাণিবিজ্ঞান উদ্ধার লাভ করিবে সত্য, কিন্তু ঐ তথ্যসমুদয় এত সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত আছে যে, সাধারণের পক্ষে উহার প্রকৃত অর্থ সব সময় বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না। কোন কোন শ্লোক আবার রূপকচ্ছলে লিখিত। সেই জন্ত তাহার অর্থ নির্ণয় করা কঠিন। দার্শনিক শ্লোকগুলির যথার্থ ব্যাখ্যা পণ্ডিতগণ প্রদান করিয়াছেন সত্য। কিন্তু বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির তাঁহারা প্রায়ই ভুল অর্থ করিয়া গিয়াছেন। তাহার কারণ, গত পাঁচ ছয় শতাব্দী যাবৎ চর্চার অভাবে তাঁহারা বিজ্ঞান একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অনেকে জোর করিয়া বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির আবার দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। উহাদের যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। এই শ্লোকগুলির বেশীর ভাগ দর্শনসম্বন্ধীয় পুস্তকের মধ্যে কথাক্সলে লিখিত হওয়ায় তাঁহারা ঐরূপ ভুল করিয়াছেন। এই রূপকাত্মক শ্লোকগুলির বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যথার্থ অর্থ নির্ণয় দ্বারাই এখন হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার সম্ভব হইতে পারে।

বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত প্রাণিসম্বন্ধীয় বিক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই আমি আমাদের দেশের নষ্ট প্রাণিবিজ্ঞান উদ্ধার করিতে মনস্থ করিয়াছি। কারণ, আমার বিশ্বাস, লুপ্ত প্রাণিবিজ্ঞান হইতেই ঐ শ্লোকগুলি গৃহীত হইয়াছিল। কিরূপ প্রণালীতে উহা সম্ভব হইবে, তাহার একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিয়া বর্তমান প্রস্তাব আমি শেষ করিব।

ধরাঘাটক, কোন একজন লোক ছোট ছোট কাঠের টুকরা দিয়া তৈয়ারী একটি খেলনার বাড়ী টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। কয় দিন পরে বাটী ফিরিয়া সে দেখিতে পাইল যে, সেই খেলনার বাড়ীখানি কে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে ও উহার টুকরাগুলি চারি দিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি টুকরাগুলি কোনটী উঠান, কোনটী ছাদ, কোনটী রাস্তা, কোনটী বা রোয়াক হইতে উঠাইয়া আনিয়া পুনরায় গৃহখানি তৈয়ারী করিতে শুরু করিয়া দিল। কিন্তু টুকরাগুলি সম্ভবমত স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত করার পর দেখা গেল যে, একটী খাম, রোয়াকের কিছু অংশ ও একটী জানালা পাওয়া

যাইতেছে না। কিন্তু লোকটা হতাশ হইল না। সে জানালার ফাঁকের উপযুক্ত একটা জানালা গৃহের অপর একটা প্রাপ্ত জানালার অঙ্কুর করিয়া নির্মাণ করিয়া লইল। তাহার পর রোয়াকের অপ্রাপ্ত অংশ ও খামটাও ঐরূপ ভাবে তৈয়ারী করিয়া, গৃহখানি পূর্বের আয় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

এইরূপ ভাবে নষ্ট প্রাণিবিজ্ঞান আমরাও উদ্ধার করিতে পারি। কিরূপে উহা সম্ভব হইতে পারে, সে সম্বন্ধে মাত্র একটা দৃষ্টান্ত দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। একশফ ও দ্বিশফ বলিয়া দুইটা বৈজ্ঞানিক শব্দ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির মধ্য হইতে আমি উদ্ধার করিলাম। একথুরবিশিষ্ট প্রাণীদিগের বৈজ্ঞানিক নাম “একশফ” ও দ্বিথুর-বিশিষ্ট প্রাণীদিগের বৈজ্ঞানিক নাম “দ্বিশফ”। কিন্তু হস্তী প্রভৃতি পঞ্চথুরবিশিষ্ট জীবও আমরা দেখিতে পাই। হস্তীর আয় পাঁচ-খুরো জীবের সন্ধান হিন্দুগণ জানিতেন না, ইহা বলা হাস্যকর। সহজেই বুঝা যায় যে, যাহারা দ্বিশফ ও একশফ শব্দ বিভিন্ন গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা পঞ্চশফ শব্দটাও ব্যবহার করিয়াছিলেন। তবে তাহা আমরা এখন পাইতেছি না। এ স্থলে আমরা এই একশফ ও দ্বিশফ শব্দের অঙ্কুরণে পঞ্চশফ শব্দটাও বর্তমান ছিল বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারি। এইরূপে অধুনা প্রাপ্ত কয়েকখানি প্রাণিবিজ্ঞান-গ্রন্থ ও পূর্বোক্ত উপায়ে বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত প্রাণিবিষয়ক বিক্ষিপ্ত * শ্লোকগুলির যথার্থ অর্থ নির্ণয় করিয়া যে, একখানি ধারাবাহিক ও সম্পূর্ণ হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ রচিত হইতে পারে, তাহা আমি পরে দেখাইব।

শ্রেণীবিভাগ

শ্রেণীবিভাগ প্রাণিবিজ্ঞানমাত্রেরই প্রথম অধ্যায়। যুরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ জীবদিগের দৈহিক গঠন ও তাহার ক্রমোন্নতির বা development-এর বিষয় লক্ষ্য করিয়া জীবদিগের শ্রেণীবিভাগ করেন। বাহ্য ও অভ্যন্তরিক গঠন অনুসারেই তাঁহারা জগতের যাবতীয় প্রাণিগণকে বিভিন্ন শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যেমন আমিবা প্রভৃতি এককোষ জীবগণকে এককোষ ও বহুকোষ উর্দ্ধতন জীবগণকে বহুকোষ জীব বলিয়াছেন। বহুকোষ জীবগণের মধ্যে যাহাদের অস্থি আছে, তাহাদিগকে অস্থিক বা দণ্ডী জীব ও যাহাদের অস্থি নাই, তাহাদিগকে নিরস্থিক জীব বলা হইয়াছে। এই অস্থিক বা

* তৎকালীন বিজ্ঞ সমাজে রূপক শ্লোক লেখা একটা বাহাদুরীর বিষয় ছিল। যে সকল শ্লোকে সহজ অর্থ দেওয়া হইত, তাহাও আবার অতি সংক্ষেপে লিখিত হইত। গুরুর আশ্রমে শিষ্যগণ এই সংক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির সহজ অর্থ বুঝিয়া লইয়া মাত্র স্মরণশক্তির সাহায্যের জন্ত পঠিত শাস্ত্রগুলির সারস্বরূপ এই সংক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি লিখিয়া লইয়া তাহারা গৃহে ফিরিত। এইরূপ সংক্ষিপ্ত লিখনপদ্ধতির প্রচলন থাকায় এই মুদ্রায়ন্ত্রের যুগেও আমরা সংক্ষিপ্ত পুরাণ শ্লোকই পাইয়া থাকি। এই সংক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির যথার্থ অর্থ বুঝাইবার জন্ত পরে পণ্ডিতগণ পরস্পরবিরোধী বহু টীকা লিখিতে বাধ্য হন। মধ্য যুগে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত পীঠগুলির লোপই ইহার কারণ।

দণ্ডী জীবগণও আবার তাহাদের দেহের গঠন অনুসারে চক্রতুণ্ডি, শ্বাসপটী, মংস্ত্র, উদ্ভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তম্ভপায়ী, এই সাতটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত। অপর দিকে নিরস্থিক জীবগণকেও আবার এই একই নিয়ম অনুসারে পর্ব্বদী, চিপটি জীব, বর্জুল কুমি প্রভৃতি “দেশ” ভাগ করা হয়। পূর্ব্বকথিত দণ্ডিদেহের গ্রায় এই সকল জীবদেশও বহু বিভাগে বিভক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ পর্ব্বদীদেশের কথা বলা যাইতে পারে। এই পর্ব্বদীদেশ বা phylum, খোলকী, লৌতেয়, সন্দংশমুগী, দ্বিযুগ্মপদী ও ষট্পদী, এই পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত। এই দৈহিক বিভাগ ছাড়া অত্র কোনও উপায়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাণীদিগের শ্রেণীবিভাগ করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু হিন্দু মনীষিগণের প্রাণীদিগের এই দৈহিক বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা প্রাণীদিগের মানসিক ও জননবিভাগরূপ আরও দুইটি শ্রেণীবিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। চারি প্রকার শ্রেণীবিভাগ সে যুগে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। উহাদিগকে যথাক্রমে মানসিক, জনন, দৈহিক ও স্বভাববিভাগ বলা হইত। শেষোক্ত বিভাগটি প্রাণীদিগের ভৌগোলিক অবস্থিতি ও তজ্জনিত স্বভাবের উপর নির্ভর করে। এই চতুর্বিধ শ্রেণীবিভাগই হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও, তাঁহারা প্রথম দুইটি বিভাগের উপর বেশী প্রাধান্য দিতেন। দার্শনিক মতগুলির গ্রায় এই কয় প্রকার বিভাগই বহুকাল হইতে শিষ্যপরম্পরায় (parallel school of thought) একই সঙ্গে পাশাপাশি চলিয়া আসিতেছে। একটীর পর অপর একটীর উদ্ভব হইয়াছে কিনা, বলা বড় কঠিন। কারণ, প্রমাণপুস্তকগুলির সব কয়খানিই প্রাচীন পুস্তক। ঐ সকল গ্রন্থ সমসাময়িক মনীষিগণ দ্বারা প্রণীত হইয়াছিল। এইবার প্রাণীদিগের এই চতুর্বিধ শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা যাউক।

মানসিক বিভাগ

প্রাণীদিগের আহার বিহার, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া এই মানসিক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাদের মতে প্রাণীদিগের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমিক আবির্ভাব ও তাহার অনুশীলন প্রাণীদিগের দৈহিক উন্নতির একমাত্র কারণ। সৃষ্টিক্রম বুঝাইবার সময় আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। হিন্দুমতে এই বুদ্ধিবৃত্তিই প্রাণীদিগের মধ্যে নূতন অভ্যাসের সৃষ্টি করিত। আর সেই অভ্যাসজনিত কর্ম্ম তাহাদের দেহে নিত্য নূতন পরিবর্তন আনয়ন করে। তাহাদের মতে এই বুদ্ধিবৃত্তি কতকটা স্বাভাবিক ভাবে ও কতকটা স্বকীয় চেষ্টায় বংশানুক্রমে প্রাণিগণ লাভ করিয়াছে। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া আর্য্য মনীষিগণ কেবল মাত্র মানসিক গঠনের উপর ভিত্তি করিয়াও প্রাণীদিগের একপ্রকার বিজ্ঞান-সম্মত শ্রেণীবিভাগ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত আদি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টি এই ভাগবত হইতেই লওয়া হইয়াছে। ভাগবতকার বৈষ্ণব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য শ্লোক কয়টির অবতারণা করিলেও উহাতে এই মানসিক বিভাগ সম্বন্ধে আমরা একটা বিশেষ ধারণা পাই। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, বৃক্ষাদিও

যে জীব, তাহাদেরও যে প্রাণ আছে, তাহা তাঁহারা জানিতেন। তাই মুক্তকণ্ঠে তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, পশু ও বৃক্ষাদির মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই; উভয়ের মধ্যেই প্রাণ আছে, • উভয়ই জীব। ইহা ছাড়া এই শ্লোক হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, প্রথমে স্থাবর জীবের সৃষ্টি হয়, তাহার পর আবির্ভাব হয় জঙ্গম জীবের। পরিশেষে এই জঙ্গম জীবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সৃষ্টি হয়।

পশুবৃক্ষাদিভেদেন জীব এব স্বতঃ স্থিতঃ ।

সংসৃতৌ ব্যত্যয়ন্তেযাং মুক্তৌ তত্তৎস্বরূপতঃ ॥

তত্র স্থাবরমুক্তেভ্যো বরা জঙ্গমমুক্তকঃ ।

তেভ্যো মানুষমুক্তশ্চ বিপ্রমুক্তান্ততোহধিকাঃ ॥—ভাগবত ।

জীব বলিতে পশাদির সহিত বৃক্ষাদিকেও বুঝায়। মনুও তাঁহার সংহিতায় এই একই কথা বলিয়া গিয়াছেন।* ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাণসত্তা দৈহিক উন্নতি লাভের পূর্বেও জীবগণ অর্জন করিতে পারে। সুগঠিত মস্তিষ্ক ব্যতিরেকেও প্রাণীদিগের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির আবির্ভাব হইতে পারে, ইহাই ছিল হিন্দুদের বিশ্বাস। তাঁহাদের মতে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমাবির্ভাবের ফলেই মস্তিষ্ক ও স্নায়ুপিণ্ডাদির আবির্ভাব বা ক্রমোন্নতি হইয়াছে। তাই উদ্ভিদ-গণ ও বিশেষ করিয়া কীটভূক বা হিংস্র উদ্ভিদাদি এবং নিম্নশ্রেণীর নিরস্থিক জীবদিগের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাই। বুদ্ধিবৃত্তির এইরূপ পরিচয়কে অনেকে Reflex action বা প্রতিঘাতপ্রসূত বলিয়া অভিহিত করেন। আমি বলিব, এই Reflex actionই প্রথম অবস্থার বুদ্ধিবৃত্তি। একই বুদ্ধিবৃত্তিকেই আমরা তাহাদের ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে এই Reflex action বা প্রতিঘাতী, instinctive বা আত্মিক, ও intelligence বা বুদ্ধি বলিয়া থাকি। স্নায়ুপিণ্ড বা মস্তিষ্ক এই সব বৃত্তিগুলির আধার মাত্র। হিন্দু মতে এই বৃত্তিগুলির ক্রমাবির্ভাবের ফলেই তাহাদের অতি প্রয়োজনীয় আবাসস্বরূপ এই মস্তিষ্ক ও স্নায়ুপিণ্ডের সৃষ্টি হয়। তাই প্রাণিগণ যতই বুদ্ধিমান ও উন্নত হয়, তাহাদের মস্তিষ্কের পরিমাণও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। ১ সংখ্যক চিত্রটী দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে। চিত্রটীতে বিভিন্ন জীবের মস্তিষ্কের পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে দেখান হইয়াছে। “হিন্দু সৃষ্টিক্রম” শীর্ষক আলোচনায় এ সম্বন্ধে বিশদ ভাবে বলিব। তাঁহাদের এই জ্ঞানের জন্মই, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিয়াছেন যে, বৃক্ষগণও জীব। সেই জন্মই আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা পশু ও

* উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্বের্ণ বীজকাণ্ডপ্ররোহিণঃ ।

ওষধ্যঃ ফলপাকান্তান্নহপুস্পফলোপগাঃ ॥

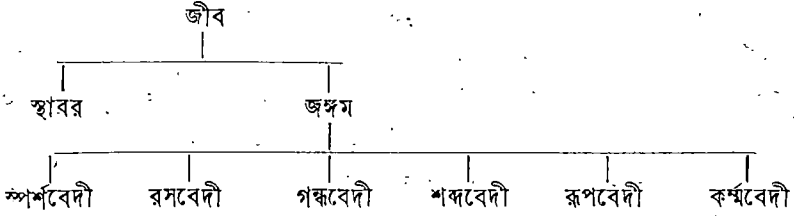
তমসা বহুপেণ বেষ্টিতা কৰ্ম্মহেতুনা ।

অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে স্তম্ভদুঃখসমম্বিতাঃ ॥—মনুসংহিতা ।

বৃহৎকাণ্ডবিশিষ্ট, পুষ্পশোভিত, ফলবন্ত, ওষধি প্রভৃতি যাবতীয় স্থাবর জীব, যাহারা কৰ্ম্মহেতু তমসাবৃত হইয়া রহিয়াছে, যাহাদের প্রজ্ঞা বাহির হইতে বুঝা যায় না, কিন্তু যাহারা ভিতরে ভিতরে স্তম্ভদুঃখ অনুভব করে, যাহাদের অন্তরে প্রাণ আছে, তাহাদের সৰ্ব্বকে উদ্ভিদ জীব বলা হয়।

বৃক্ষাদিকে সমভাবেই জীব নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই জীবজগৎকে তাঁহারা আবার স্বাবর ও জঙ্গম, এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। উদ্ভিদজগৎকে স্বাবর ও জীব-জগৎকে জঙ্গম নামে তাঁহারা অভিহিত করেন। স্বাবর অর্থে যাহারা স্থির থাকে, ইচ্ছামত চলাফিরা করে না, তাহাদের বুঝায়। জঙ্গম অর্থে যাহারা ইচ্ছামত চলাফিরা করে বা করিতে পারে, তাহাদের বুঝায়।

ইহা ছাড়া সৃষ্টিক্রম সঙ্ক্ষেপে হিন্দুদিগের বিরূপ নির্ভুল জ্ঞান ছিল, এই শ্লোকটি হইতে তাহার একটা সঠিক ধারণা আমরা পাই। যাহা হউক, স্বাবর জীব উদ্ভিদবিজ্ঞানের অন্তর্গত। হিন্দুগণ জঙ্গম জীব সঙ্ক্ষেপে (প্রাণিজগৎ) কি বলিয়াছেন, আমরা এখন তাহার আলোচনা করিব। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি হইতে আমরা দেখিতে পাই, মানসিক পর্যায়ে যাবতীয় প্রাণিগণ যথাক্রমে স্পর্শবেদী, রসবেদী, গন্ধবেদী, শব্দবেদী, রূপবেদী ও কর্মবেদি-রূপ ছয়টি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। শ্লোক কয়টি মূল ভাগবত হইতে লইয়াছি।



জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাঃ ততঃ প্রাণভূতঃ শুভে ।

ততঃ সচিভাঃ প্রবরাঃ ততঃ চন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥

অত্রাপি স্পর্শবেদিভাঃ প্রবরাঃ রসবেদিনঃ ।

তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ ॥

রূপভেদবিদস্তত্র ততঃ চোভয়তোদতঃ ।

তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাঃ চতুষ্পাদাঃ ততো দ্বিপাং ॥

ততো বর্ণাশ্চ চত্বারঃ তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ ।—ভাগবত ।

শ্লোকটিতে প্রথমে প্রস্তরাদি অজীব, তাহার পর উদ্ভিদাদি প্রাণবন্ত জীবদিগের কথা বলা হইয়াছে। এই প্রাণবন্ত জীবগণের মধ্যে যাহারা চিত্তবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়, তাহারা ই ভাগবতের মতে সচিত্ত জীব। সচিত্ত জীব বলিতে ভাগবতকার জঙ্গম জীবকেই (Animal) বুঝাইয়াছেন। সচিত্ত জীবদিগের চিত্তাদি ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যেই প্রকাশ পায়। সেই জন্ত জীবদিগের মধ্যে এই ইন্দ্রিয়াদির ক্রমাবির্ভাব ও ক্রমোন্নতি, জীবদিগের বিভিন্নরূপ চিত্তবৃত্তি অনুযায়ী সাধিত হইয়াছে বলিয়া আর্য্যগণ বিশ্বাস করিতেন। তাহাদের মতে এই চিত্তবৃত্তিসমূহের (আবির্ভাবের পর) প্রয়োজন অনুসারে প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি হয়। এই ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তিই আর্য্যগণের মতে প্রাণীদিগের বিভিন্নরূপ ক্রমবিকাশের মূল ভিত্তি। আর্য্যগণের মতে স্পর্শ, রস, গন্ধ, শব্দ ও রূপ,

এই পাঁচটি চিত্তবৃত্তি আছে। পর পর (যথাক্রমে) জীবদিগের মনে ইহাদের বিকাশ হয়। ফলে পর পর স্পর্শেন্দ্রিয়, রসেন্দ্রিয় প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ও এই সকল বৃত্তিসমূহের আধারস্বরূপ জীবদেহে স্থান পাইয়াছে। এই সব ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা চালিত অভ্যাস বা কার্যাদি দ্বারা জীবগণ নূতন নূতন দেহাকৃতি লাভ করে। এই ভাবে নূতন নূতন যোনি (Species) বা জীববিশেষের সৃষ্টি হয়। ফলে জীবদিগের এই মানসিক বিভাগ যে, জীবদিগের ক্রমবিকাশের উপর ভিত্তি করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে। এইবার এই মানসিক বিভাগ সম্বন্ধে বলা যাউক। উক্ত শ্লোকে প্রকারান্তরে মানসিক পর্যায়ে কোন্ জীবটি কোন্ জীবের পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাও বলা হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, প্রথমে স্পর্শবেদী জীব, তাহার পর রসবেদী জীব, তাহার পর শব্দবেদী জীব ও তৎপরে রূপবেদী জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে স্পর্শবেদী জীব সম্বন্ধেই বলিব।

স্পর্শবেদী

পূর্বোক্ত শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, যে সকল জীব কেবলমাত্র স্পর্শ দ্বারা আহাৰাদি সংগ্রহ, চলা ফেরার কার্য ও জননক্রিয়া সমাধান করে, তাহাদিগকে আর্ধ্যগণ স্পর্শবেদী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আহাৰ সংগ্রহ (food procuring), চলা ফেরা (locomotion) ও জননক্রিয়া (propagation of generation), এই তিনটি ধর্ম দ্বারা জীব বাঁচিয়া থাকে। স্পর্শশক্তি দ্বারা এই কার্যত্রয় যাহাদের সাধিত হয়, তাহাদিগকেই স্পর্শবেদী বলা হইয়াছে। তাহাদের মতে কীট পতঙ্গ আদি ষট্পদী জীব (Insecta) ব্যতীত যাবতীয় নিরস্থিক জীব স্পর্শবেদী প্রাণী। এই জীবগণ তাহাদের দেহস্থিত গুঁয়া (cilia), গুঁড় (tentacle) বা অনুরূপ অঙ্গাদিদ্বারা আহাৰাদি স্পর্শ করে। এরূপ স্পর্শ দ্বারা দ্রব্যকণাকে আহাৰাদিরূপে বুঝিতে পারিয়া, উহা তৎক্ষণাৎ তাহারা উদরস্থ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ স্পর্শশক্তি দ্বারা ই পরস্পরকে চিনিয়া লইয়া মিলিত হয়। আমিবা, সিলেট্রেটা, স্পঞ্জিলা, ষ্টার ফিস্ (তারামাছ), জেঁঁাক, কৈঁচ, কেন্দ্র, গলদা, শামুক, ঝিলুক প্রভৃতি নিরস্থিক জীব এই স্পর্শবেদী জীবের অন্তর্গত। কেবলমাত্র কীটপতঙ্গ (Insecta) ব্যতীত যাবতীয় নিরস্থিক জীব হিন্দুমতে এই স্পর্শবেদী জীবের মধ্যে পড়ে। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও চক্ষু আছে, কিন্তু উহা বিশেষ সুগঠিত বা কার্যকারী নয়। কারণ, পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ঐ জীবগুলির চক্ষু নষ্ট করিয়া দিলেও কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ না করিয়া তাহারা জীবন ধারণ করে ইহারা জীবনধারণের জন্ত কেবল মাত্র স্পর্শশক্তির (Touch sensation) উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

বিভিন্নরূপ পরীক্ষা দ্বারা ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি। আলোক নিষ্ক্ষেপ ও যন্ত্রশব্দের দ্বারা এই জীবদিগের গতির কোনও হ্রাস বা বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়

নাই। তবে বন্ধুকের ত্রায় কঠোর শব্দ বা জোরাল টর্কের আলো দ্বারা ইহাদের গতির বৃদ্ধি হইতে দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অন্যান্য কারণ আছে। ভীষণ শব্দে বায়ুর স্তর পরিবর্তিত হয় ও সেই বায়ুর চাপ জীবদেহে পতিত হওয়ায় জীববিশেষের স্বাভাবিক গতি স্বভাবতই বৃদ্ধিত হয়। সেইরূপ জোরাল আলো জীবদেহে নিক্ষিপ্ত হইলে উত্তাপ সঞ্চারিত হয় এবং উত্তাপ ও শব্দে জীবগণের গতি বৃদ্ধিত হয়। উত্তাপ ও শব্দজনিত বায়ুসঞ্চালনও এই জীবগণ স্পর্শশক্তি দ্বারা অনুভব করে। তবে ইহা পরোক্ষ ভাবে ঘটয়া থাকে। এইখানে স্পর্শশক্তি বুঝাইতে আমরা ইংরাজী touch, heat, cold ও pain (স্পর্শ, উষ্ণতা, শৈত্য ও কষ্টবোধ) এই চতুর্বিধ Sensation বা বোধ বুঝিব। আমি সাধারণতঃ একটি কাচের বাস্তুর মধ্যে কঁচ, জোঁক, কেন্দ্র, শুয়াপোকা প্রভৃতি জীব লইয়া স্বল্পশক্তি টর্কের আলো ও ছোট ঘণ্টা দ্বারা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষাস্তে প্ররোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। সংকল্পিত স্পর্শবিদ্ যন্ত্রটি চিত্রে দেখুন। কোন সময়েই মৃদু আলোক বা স্বল্প শব্দ দ্বারা তাহাদের গতির পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু হৃদয় কেশ দ্বারা সামান্যরূপ স্পর্শে তাহারা দ্রুত ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়াছে। এইরূপ পরীক্ষা ব্যতিরেকে তাহাদের গতি লক্ষ্য করিলেও উক্ত সত্য সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হই। তাহাদের অনেকেই সম্মুখস্থ শুয়া ও বোধিকা (feeler) প্রভৃতি অঙ্গাদি দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিতে করিতে অগ্রসর হয়। জলমধ্যেও তাহারা এইরূপে অগ্রসর হয়। খাণ্ডকণাও তাহারা প্রথমে স্পর্শ করিয়া খাদ্যরূপে বুঝিতে পারিলে তবে গ্রহণ করে। স্ত্রী-সন্নিধানও তাহারা এই স্পর্শ দ্বারা জানিতে পারে। ইহাদিগকে পুরাপুরি স্পর্শবেদী জীবই বল। যাইতে পারে। কোন কোন নিরস্থিক জীবকে কোনও বিশেষ রসের সংস্পর্শে আসিয়া বা আলোকসম্পাতের মধ্যে পড়িয়া দৈহিক হ্রাস বা বৃদ্ধিরূপ চাকল্য প্রকাশ করিতে দেখা যায়। আমিবা আদি এককোষ জীব ও কঁচুয়া, শামুক, ঝিঝু, জোঁক আদি বহুকোষ জীবগণকে বিশেষ বিশেষ রসের মধ্যে ডুবাইয়া বা আলোকসম্পাতের মধ্যে ফেলিয়া অনেকে উক্তরূপ ফল পাইয়াছেন। এজন্ত অনেকে মনে করেন যে, তাহাদের দর্শন বা রসের অনুভূতি আছে। কিন্তু উহা ভুল। আমরা জানি, বহু ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র বীজকোষ দ্বারা জীবমাত্রেরই দেহ গঠিত হইয়া থাকে। নিরস্থিক জীবদিগের দেহে এই বীজকোষগুলি অস্থিক প্রাণীদিগের ত্রায় ঘনসন্নিবিষ্ট নয়। কোষগুলির গাত্রাচ্ছাদনও থাকে কিছু পাতলা। কোষগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট না হওয়ায় ও সেই কোষগুলির গাত্রাচ্ছাদন পাতলা থাকায় উক্তরূপ রসসংযোগ বা আলোকপাত দ্বারা উহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ একপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া সাধিত হয়। আর তজ্জন্তই জীবদিগের ব্যবহারের মধ্যে এই তারতম্য লক্ষিত হয়। এইরূপ বোধকে আমরা স্পর্শবোধই বলিব। তবে ইহা পরোক্ষভাবে ঘটয়া থাকে। এইবার অনেকে বলিবেন যে, তাহাই যদি হয়, তবে কোনও কোনও নিরস্থিক জীবের মধ্যে চক্ষু পরিলক্ষিত হয় কেন? পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই চক্ষু কখনই সৃষ্টিত হয় না। এই সম্বন্ধে শমুক, চিঙড়ি ও তারামাছ আদি জীব লইয়া অধ্যাপক হেস সাহেব অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহার

মতে নিরস্থিক জীবদিগের মধ্যে কোনরূপ বর্ণবোধ নাই। তাহা ছাড়া চিঙড়ি আদি জীব প্রায়ই আলো পছন্দ করে না। তবে যদি লোহিত (লাল কাচের মধ্য দিয়া) আলো উপর হইতে (Vertically) সরল ভাবে তাহাদের উপর ফেলা যায়, তবে অন্ধকার অপেক্ষা উহার লোহিত আলোই বেশী পছন্দ করে। কিন্তু এই লোহিত আলোক পার্শ্ব হইতে (Horizontally) ফেলিলে উহা তাহারা পছন্দ করে না।* এই পরীক্ষাও হেস সাহেব করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, হিন্দু মতে চিত্তবৃত্তির আধারস্বরূপে ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি হয়। চিঙড়ি জীবের এই ব্যবহার ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহাদের মধ্যে দর্শনরূপ এই বিশেষ চিত্তবৃত্তির আবির্ভাব আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু উহার পরিশেষ হয় নাই। সেই জন্ত উহার আধারস্বরূপ চক্ষু দুইটিরও গঠন সম্পূর্ণ হয় নাই। সেকারণ উহাদের চক্ষু দুইটি বিশেষ কার্য্যকরও নয়। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ঋত আলো তাহারা উপভোগ করিতে পারে না। কিন্তু ঋত আলোর অংশবিশেষ লোহিত আলোক তাহাদের উপভোগ্য।† অথচ লোহিত আলোর সংস্পর্শে আসা তাহাদের সাধারণ ভাবে ঘটয়া উঠে না। এইরূপে বুঝা যায় যে, পূর্বাযতন চক্ষু গঠনের একটা ধাপমাত্র। আমরা চিঙড়ি প্রভৃতির চক্ষুর মধ্যে দেখিতে পাই। চিঙড়ির চক্ষুর গঠন সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইলে ইহার স্বাভাবিক ব্যবহারের তারতম্য ঘটিত এবং তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালীও ভিন্নরূপ হইত। আর এইরূপ হইলে চিঙড়ি অপর একটা জীবে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। তবে চিঙড়ির পূর্বপুরুষদের মধ্যে কাহারও কাহারও এই সৌভাগ্য হইয়াছিল। ফলে তাহারা উর্দ্ধতর কোন জীবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। চক্ষুহীন নিরুপ্ত জীব হইতে চক্ষুস্থান উন্নত জীবের সৃষ্টির মধ্যবর্তী সময়ে যে সকল মাঝামাঝি জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল, এই চিঙড়ি আদি জীব ছিল তাহাদের একটা। সেই জন্তই এই চিঙড়ির চক্ষু অগঠিত হয় নাই। দৃষ্টিবোধের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে ধীরে ধীরে চক্ষুরও গঠন সাধিত হয়। চক্ষুহীন জীব হইতে চক্ষুস্থান জীব সৃষ্ট হয়। গঠন শেষ হইবার পর ইহার কার্য্যকারিতা ধরা পড়ে, অর্দ্ধগঠিত অবস্থায় কোন ইন্দ্রিয়াদি কার্য্যকারী হয় না। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ইন্দ্রিয়াদির বিকাশই ক্রম-বিকাশের মূল ভিত্তি। প্রথম অবস্থায় সকল জীবই ছিল স্পর্শবেদী, তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী ছিল একই রকমের। পরে এই স্পর্শবেদী জীব হইতে রসনেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির ক্রমাবির্ভাবের ফলে অন্যান্য জীবের সৃষ্টি হয়। যাহা হউক, এই স্পর্শবোধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, এই দুই প্রকারে সাধিত হয়। শব্দ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি জীবের সারা

* Bell, J.C. 1906, The reactions of the crayfish. Harvard, Psych. Studies, Vol. 2, P. 615.

1910. Neue Untersuchungen über den Lichtsinn. bei wirbellosen Tieren. Ibid, Bd. 136, S. 282.

† লাল, নীল, হলদে, সবুজ প্রভৃতি সাতটা বিভিন্নরূপ আলোক দ্বারা ঋত আলোক গঠিত।

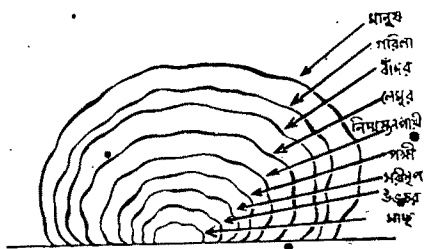
দেহব্যাপী স্পর্শকোষ বিস্তৃত থাকে। প্রত্যক্ষ ভাবে স্পর্শজ্ঞানের জন্য অগ্রাণু জীবদের ন্যায় ইহাদের সকলের বোধিকা বা Feeler নাই। খাদ্যকণা ভাসিতে ভাসিতে ইহাদের গাত্র স্পর্শ করিলে, তবে ইহারা খাদ্যকে খাদ্যরূপে জানিয়া লয়। মাকড়সারও এই স্পর্শবোধ অনেক সময় পরোক্ষ ভাবে সাধিত হয়। তাহারা জাল বুনিয়া, সেই জালের উপর অবস্থান করে। সেই জালে সামান্যমাত্র কম্পনও তাহাদের স্পর্শবোধ জাগ্রত করে। জালে শিকার পড়িমাত্র তাহাতে কম্পন আরম্ভ হয়। মাকড়সারও জানিতে পারে যে, তাহার জালে শিকার পড়িয়াছে। Negal সাহেবের মতে* মাকড়সার গন্ধবোধ একেবারেই নাই। ইহাদের চক্ষু আছে বটে, তবে বর্ণবোধ নাই। তাহারা সকলেই বর্ণবোধহীন বা colour blind, ফলে এই কম্পনের উপরই তাহারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। স্পর্শদ্বারাই তাহারা এই কম্পন অনুভব করে। তাই মাকড়সারও সারা দেহে এই স্পর্শকোষ বিস্তৃত আছে। শুধু মাকড়সা কেন, কীটপতঙ্গ (Insecta) ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পর্ববদী জীব সম্বন্ধেও এইরূপ বলা চলে। গলদা, কঁকড়া আদি জীবের দেহ শক্ত খোলা দিয়া ঢাকা থাকে বটে, কিন্তু সেই জন্য তাহাদের দেহে, বোধিকাদ্বয়ে ও গুহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক প্রকার সূক্ষ্ম কেশ দেখা যায়। চিড়্‌ডিম্বাচ্ছের চিত্রটি দেখুন। এই সূক্ষ্ম কেশসকল স্পর্শকোষ দ্বারাই গঠিত। স্পর্শদ্বারাই ইহারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। কুমি আদি জীবের দেহে বোধিকা বা অনুরূপ কোন অঙ্গাদি নাই। ইহাদের অনেকেই পরগাছারূপে অন্য জীবের দেহাভ্যন্তরে বাস করে। কিন্তু ইহাদের দেহেও অসংখ্য স্পর্শকোষ বিদ্যমান আছে। চিপটি কুমিজাতীয় Planaria জীবের মাথার কাছ বরাবর দুইটা বিশেষ ক্ষুদ্র অপাঙ্গ আছে। বার্ডেন সাহেব বলেন, উহারা স্পর্শবোধক। এই অপাঙ্গদ্বয়ের স্পর্শবোধ এত বেশী যে, শ্রোতের অনতিদূরে কোনও খাদ্যাদি থাকিলে, সেই খাদ্যকণাস্পৃষ্ট জলকণার স্পর্শ হইতেই তাহা তাহারা জানিয়া লয়। তারা মাছ অপর একটা নিরস্থিক জীব। ইহাদের স্পর্শজ্ঞানও ঠিক এই Planaria জীবের ন্যায়। পাদপার্শ্বস্থ Poda দ্বারাই সম্ভবত তাহাদের এত বেশী স্পর্শজ্ঞান জন্মে। তারামাচ্ছের ছবি দেখুন। একটা চিমটা দ্বারা এক খণ্ড মাংস তাহাদের “পোডার” সম্মুখে ধরিলে তাহাদিগকে সেই মাংসের দিকে আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। কিন্তু খাদ্য দূরে ধরিলে তাহারা বুঝিতে পারে না। সেই জন্য রসজ্ঞান অপেক্ষা স্পর্শজ্ঞান তাহাদের মধ্যে বেশী বলিয়া মনে হয়। তবে Podar কোষগুলির মধ্যে কোনও প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্যও এইরূপ হইতে পারে। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়াছি। এই রাসায়নিক বোধকে আমরা

* Mc. Cook, H. C., 1889—1893. American spiders and their spinning work. 3 Vols.

Pritchett, A. H. 1904, Hearing and Smell in spiders. Am. Nat. Vol. 38, P. 859.

1894. Zur. Physiologie und Psychologie der Actinien, Ibid. Bd. 59, S. 415.

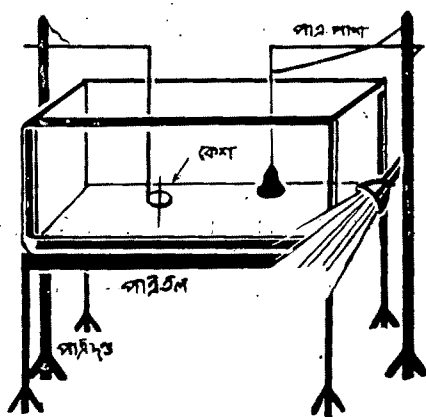
1892 Der Geschmackssinn der Actinien. Zool. Anz 2 B d. 15, S. 334.



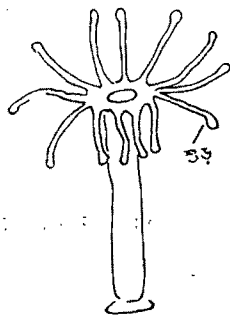
১। জীবভেদে মস্তিষ্কের পরিমাণভেদ



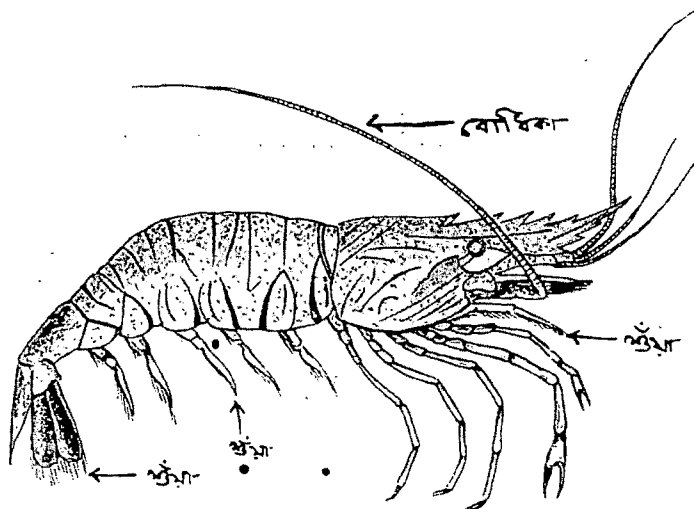
৪। তারা মাছ



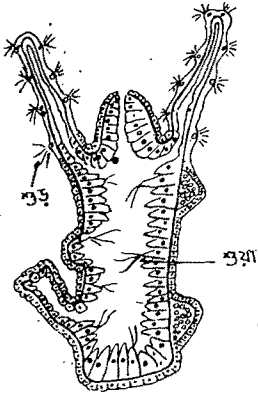
২। স্পর্শবিদ্যবোজ



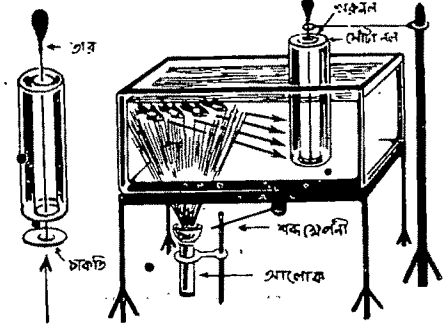
৫ (ক)। হাইড্রা, বহির্দৃশ্য



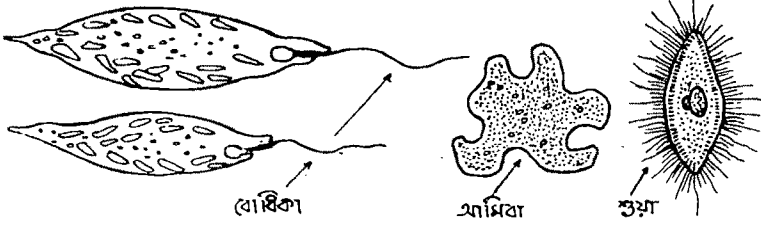
৩। চিঙড়ি মাছ



৫ (খ)। হাইড্রা, ভিতরের দৃশ্য



১১। রসবিদ্যন্ত্র



৬। এককোষ জীব, পারামিচিয়াম

৭। আমিবা।

৮। এককোষ জীব, সিলিয়েটা



৯। কৈ মাছ সমস্ত দেহ দ্বারা রস আশ্বাসন করিতেছে



১০। মাগুরজাতীয় মাছ—সমস্ত দেহ দ্বারা রস আশ্বাসন করিতেছে

স্পর্শবোধই বলিব। হাইড্রা আদি জীবের স্পর্শবোধ * এত বেশী যে, এক খণ্ড মাংস তাহাদের শুঁড়গুলিতে ছোঁয়াইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়, কিন্তু মাংসের পরিবর্তে কাষ্ঠাদি ব্যবহার করিলে উক্তরূপ ফল পাওয়া যায় না। তবে ঐ ক্ষেত্রেও তাহাদের স্পর্শবোধ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার (Chemical) দ্বারা সাধিত হয় বলিয়াই মনে হয়। হাইড্রা আদি জীবের দেহাভ্যন্তরের কোষগুলির সমাবেশ হইতেও তাহাদের স্পর্শবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ৫ (ক, খ) সংখ্যক চিত্রে দেখা যাইবে যে, এই জীবটির স্পর্শবোধক (Tentacle) শুঁড় আছে। ইহার খাদ্যনলীর দুই পার্শ্বের কোষগুলির আবার গুয়া থাকে। এই গুয়া দ্বারা খাদ্যকণাগুলিকে খাদ্যরূপে বুঝিতে পারিয়া তবে তাহারা গ্রহণ করে। পুরাপুরি এককোষ জীবদিগের দেহেও এই স্পর্শবোধের জ্ঞান একাধিক শুঁড় দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন Paramacium জীব। ক্রমক্রমে তাহাদের দেহের চারি ধারে একটী পুরু আবরণের সৃষ্টি হওয়ায় কেবলমাত্র স্পর্শবোধের জ্ঞানই তাহাদের এই গুয়া বা flagella আবির্ভাব হয়। ৬ সংখ্যক চিত্র দেখুন।

তবে প্রথম এককোষ জীব আমিবার শুঁড় নাই। ৭ সংখ্যক চিত্র দেখুন। তাই তাহারা সমস্ত দেহ দিয়াই স্পর্শবোধ করে। স্পর্শবোধ দ্বারাই তাহারা অখাদ্য পরিত্যাগ করে ও খাদ্য বাছিয়া লয়। পরীক্ষাদ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, Insecta ব্যতীত সমস্ত নিরস্থিক জীবই স্পর্শবেদী জীব। ইহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে রস, দৃষ্টি প্রভৃতি অগ্ন্যবিসয়ক বোধ যে একেবারে নাই, তাহা নয়। বিশেষ করিয়া কোনও কোনও উচ্চতম নিরস্থিক সম্বন্ধে ত এ কথা একেবারেই বলা চলে না। তবে স্পর্শজ্ঞান অপেক্ষা অগ্ন্যবিসয়ক বোধ তাহাদের যে অনেক কম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রস ও দৃষ্টি প্রভৃতির অভাবে তাহারা বাচিতে পারে, কিন্তু স্পর্শবোধের অভাব হইলে তাহাদের পক্ষে এক মুহূর্তও বাচা অসম্ভব। কারণ, ইহারা সকলেই স্পর্শবেদী জীব।

স্পর্শবেদী জীবের উপবিভাগ থাকাও অসম্ভব নয়। পূর্বেই বলিয়াছি, স্পর্শবোধ বলিতে শীতবোধ বা cold sensation, উষ্ণবোধ বা heat sensation, কষ্ট বোধ বা pain sensation বুঝায়। তাহার পর কঠিন বা মৃদু স্পর্শ (pressure) প্রভৃতিরও তারতম্য আছে। বহুপ্রকারের স্পর্শবেদী জীব যে নাই, তাহা কে বলিতে পারে? কোন কোন নিরস্থিক জীব হয় ত উষ্ণকোষের আধিক্য আছে। ইহাদের উষ্ণবেদী বলা যাইতে পারে। কোন কোন জীবের দেহে হয় ত স্পর্শকোষের (touch spot) আধিক্য দেখা যাইবে। তবে এ সম্বন্ধে বিশেষ অন্বেষণ এখনও হয় নাই। আমি যত দূর পরীক্ষা করিয়াছি, তাহাতে জোঁকের মধ্যে শৈত্য-বোধ, কঁচোর মধ্যে উষ্ণবোধ ও কেমন জীবের

* 1894. zur. Physiologie und Psychologie der Actinien. Ibid. Bd. 59. S. 415.

1892. Der Geschmacksinn der Actinien. zool. Anz. Bd. 15. S. 334.

মধ্যে স্পর্শবোধ বেশী দেখিয়াছি। ইহাদের ব্যবহার ও তদনুযায়ী দেহাকৃতি হয়। তাহাদের এই বিভিন্নরূপ বোধাদিক্যের উপর নির্ভর করে। তবে উহা এখনও অনুসন্ধান-সাপেক্ষ।

রসবেদী

স্পর্শবেদী জীবগণের পরই হিন্দু মনীষিগণ মৎস্যাদিকে মানসিক পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান দিয়া থাকেন। মৎস্যকে তাঁহারা রসবেদী জীব নামে অভিহিত করেন। ইহাদের গাত্র কঠিন আঁশ দ্বারা আবৃত থাকায় ইহাদের স্পর্শবোধ হয় না। তাহার পর জলের মধ্যে তাপের কোনও হ্রাস বৃদ্ধি নাই। সেই জন্য শীত উষ্ণ প্রভৃতি বোধের তাহাদের প্রয়োজনও নাই। গভীর জলে বাস করায় ইহাদের দৃষ্টিশক্তিরও বিশেষ পরিচালনা সম্ভব হয় না। আমরা জানি, বেগুনি, নীল, সবুজ, পীত, কমলা প্রভৃতি সাতটা বর্ণদ্বারা স্বেত আলোক গঠিত। জলমধ্যে লোহিত আলোক ১০০ মিটারের নিম্নে একেবারেই দৃষ্ট হয় না। সেইরূপ ৫০০ মিটারের নীচে জলমধ্যে সমস্ত সবুজ আলোক বিনষ্ট হইয়া যায়। একমাত্র বেগুনি রঙই ১০০০ মিটার নিম্ন পর্যন্ত দৃষ্ট হয়। ডুবুরিরা মাত্র ৩০ মিটার জলের মধ্যে নামিলে লোহিত বর্ণকে আর লোহিত বলিয়া বুঝিতে পারে না; তখন লাল তাহাদের কাছে কাল বলিয়া প্রতীত হয়। কেবলমাত্র চক্ষুদ্বারা জলমধ্যে জীবন নির্বাহ করা অসম্ভব। তাহার উপর ইহাদের চক্ষুও সবিশেষ সুগঠিত ও কার্যকর নয়। ইহাদের কর্ণযন্ত্র আছে বটে। কিন্তু মাছ তাহাদের কর্ণদ্বারা সমতা (balance) ও দেহভার রক্ষা করে মাত্র। আমরা জানি যে, এই কর্ণ দ্বারা জীবগণ শ্রবণ ও ভার রক্ষা, এই দুই প্রকারে উপকৃত হয়। কর্ণযন্ত্র অপসারিত করিলে আমরা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারি না। কর্ণের অংশবিশেষ, অর্দ্ধচন্দ্রাকার নলীভ্রমে একপ্রকার জলীয় পদার্থ থাকে। এই জলীয় পদার্থের উত্থান ও পতন হইতে জীবগণ তাহাদের দেহের সমতা বা ভার রক্ষা করে। কর্ণের শ্রবণাংশ বা কোচেলা ইহাদের নাই। তাই মৎস্যের কর্ণযন্ত্রও ভার রক্ষার (balance) সহায়ক হয় মাত্র। Kreidl এবং আরও অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে মাছ একেবারেই শুনিতে পায় না। * বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা তাঁহারা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

আর্য্য মনীষিগণের মতে মুখবিবরের চারি পার্শ্বস্থ পাতলা চামড়া দ্বারা ইহার জল স্পর্শ করে; স্পর্শ বলিতে এখানে রসগ্রহণ বুঝিব। কারণ, রসকোষ দ্বারাই তাহারা উক্তরূপে জল স্পর্শ করিয়া থাকে। ঐ রসকোষ ইহাদের সমস্ত মুখবিবর, মস্তক ও দেহে ছড়াইয়া আছে। এইরূপ স্পর্শদ্বারা তাহারা জলমধ্যস্থিত খাদ্যাখাদ্য ও তাহার অবস্থান নিরূপিত করে। জলমধ্যস্থ খাদ্যাখাদ্য জলের স্বরূপ বদলাইয়া দিয়া থাকে।

* 1895. Veber die Schallperception der Fische. Pflügers Arch, Bd. 61, S. 450.

1896. Ein weiterer Versuch über die angebliche Hörenlinie der Fische. Ibid, Bd. 63, S. 581.

মুখের ভিতরকার পাতলা চামড়া দ্বারা মৎস্য জলের গুণাগুণ (composition of water) বিচার করে। শত্রুসন্নিধানবশতঃ জলের চাক্ষুশ্য (wave length and wave circle) তাহারা এই ভাবে মুখবিবরে উপলব্ধি করিয়া সাবধান হয়। অনেক ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র জীব ও জলজ উদ্ভিদ মৎস্যগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে। জলের মধ্যে এই সকল উদ্ভিদ বা জীববিশেষ অবস্থান করিলে জলের আশ্বাদ বদলাইয়া যায়। এই জন্য দূর হইতেই জলের আশ্বাদন দ্বারা মৎস্য জীব তাহাদের খাদ্যাদির সঠিক অবস্থান জানিয়া লয়। তাহা ছাড়া জলের এই গুণাগুণ ও চাক্ষুশ্য তাহাদের গতিও নির্দ্ধারিত করে। মৎস্য জীবের জলে বুজকুড়ি কাটার উদ্দেশ্য শুধু শ্বাসক্রিয়া নয়, উক্তরূপ রস উপলব্ধিও মৎস্যগণ এই ভাবে করিয়া থাকে। মৎস্য জীবের উভয় পার্শ্বে দুইটি পার্শ্বরেখা দেখা যায়। উহাদিগকে বাহির হইতে দুইটি সাদা রেখার মতন (lateral line) মনে হয়। বোধ হয়, এই পার্শ্বরেখা দুইটিও কতক পরিমাণে রসবোধ কার্যে মৎস্যের সহায়ক হয়। তাহার পর স্ত্রীমৎস্যের সন্নিধানও এই রসবোধ দ্বারা পুংমৎস্যেরা বুঝিতে পারে। ঋতুকালে স্ত্রী-মৎস্যদিগের দেহ হইতে একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ (scretion) নির্গত হয়। এই রাসায়নিক পদার্থ পুংমৎস্যের দেহ স্পর্শ করা মাত্র তাহারা বীজ ছাড়িতে থাকে। এই ভাবে পরস্পরের সন্নিধান পরস্পরে অবগত হইয়া তাহারা পৃথক পৃথক ভাবে বীজ ছাড়ে। পরে ভাসিতে ভাসিতে অদূরস্থ স্ত্রীবীজের সহিত পুংবীজ মিলিত হইলে মৎস্যশিশুর উৎপত্তি হয়। মৎস্য জীব তাহাদের আহার সংগ্রহ, চলাফেরা, জননক্রিয়া প্রভৃতি কার্যে একান্ত ভাবে যে এই রসবোধের উপর নির্ভর করে, তাহাদের দেহে রসকোষের আধিক্যই তৎসম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অত্যাশ্র জীবে রসকোষ (Taste cell) মাত্র জিহ্বার মধ্যে অবস্থিত থাকে। কিন্তু মৎস্য জীবের শুধু মুখবিবরে নয়, সমস্ত গাত্রে এই রসকোষ প্রভূত সংখ্যায় ছড়াইয়া রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে হুবিখ্যাত প্রাণিবিষয়ক গ্রন্থ Parker and Haswell, II vol এর ১০৫ পৃষ্ঠায় বিশেষ উল্লেখ আছে। নিম্নের পাদটীকায় উহার কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।*

মৎস্য জীবের এই রসকোষের আধিক্য দেখিয়া তাহারা যে রসবেদী জীব, এ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হই। কি ভাবে সমস্ত দেহ দিয়া তাহারা রস গ্রহণ করে, তাহা আমরা ২ ও ১০ সংখ্যক চিত্রদ্বয় হইতে বুঝিতে পারিব। নিম্নোক্তরূপ কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারাও আমি উক্তরূপ সত্যে উপনীত হইয়াছি। এই পরীক্ষা একপ্রকার যন্ত্রদ্বারা সমাধা হইয়া থাকে। ষষ্ঠটি মৎস্কর্ষক কল্লিত ও নিশ্চিত হইয়াছে। ১১ সংখ্যক রসবিদ্যস্ত দেখুন।

একটি চৌবাচ্চাকার কাচের পাত্র জলপূর্ণ করিয়া কয়েকটি লোহিত মৎস্য তাহাতে ছাড়িয়া দিলাম। তাহার পর পাত্রটির এক পার্শ্ব বা তলদেশে আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করিলাম। কিন্তু

* The sense of taste has for its special taste buds, similar in general character to the end buds in the skin and composed of narrow rod-shaped cells. In fishes these are widely distributed in the mouth, branchial cavities and on the outer surface of the head and in some fishes over almost the whole surface of the body.

মৎস্যগুলিকে উপর হইতে নিয়ে নামিতে দেখা গেল না। জলের উপরকার ভাসমান খাদ্যকণা ছাড়িয়া কেহই নীচে নামিল না। ইহার পর খাদ্যকণাগুলি উঠাইয়া লওয়া হইল, তত্রাচ কেহ আলোকরশ্মি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া স্থান পরিত্যাগ করিল না। জলের এক পার্শ্বে মুছ আলোড়ন দ্বারা বা পাত্রের তলদেশে মুছ আঘাত করিয়াও তাহাদের মধ্যে কোন চাকল্যের আবির্ভাব হইল না। পরে মৎস্যশিশুগুলির চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়া, সেই জলে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তাহার পর কাচের একটা মোটা নল সেই পাত্রের ভিতরকার জলমধ্যে কতকটা দূরে নামাইয়া দিলাম। তৎপরে অপেক্ষাকৃত একটা সরু নলের তলদেশে একটা টানের গোল চাকতি দিয়া আবৃত করিয়া, ঐ নলটি পূর্বোক্ত স্থল নলের ভিতর দিয়া জলের তলদেশে নামাইয়া দেওয়া হইল। আর চাকতির সহিত একটা সরু শক্ত তার এমন ভাবে আটকাইয়া রাখা হইল যে, ইচ্ছামত উহা উপর হইতে টানিয়া বা ঠেলিয়া ঐ সরু নলটির তলার মুখ বন্ধ করা বা খোলা যাইতে পারে। ইহার পর জলের উপর কিছু খাদ্যকণা দিয়া দেখা গেল যে, মাছ কয়টা উপরে আসিয়া আহাৰ্য্যের চারি ধারে আপনা হইতেই একে একে মিলিত হইতেছে। তাহার পর সেই নলটির মধ্যে distilled water ভর্তি করিয়া, উহা সেই মোটা নলের মধ্য দিয়া জলের নীচে নামাইয়া দিয়া, উপর হইতে উত্তরূপে তারটা ঠেলিয়া দিয়া, উভয়বিধ জলের মিশ্রণ ঘটান হইল। কিন্তু উহাতে মৎস্যগণ উপর হইতে নিয়ে আকৃষ্ট হইল না। পরে এইরূপ পরীক্ষা চিনির জলের (sugar water) সাহায্যে করা হইলে দেখা গেল, মৎস্যগণ তৎক্ষণাৎ উপর হইতে নিয়ে নামিয়া আসিতেছে। চক্ষুহীন ও চক্ষুহীন (হ্রতচক্ষু) উভয়বিধ মৎস্য দিয়াই উল্লিখিত পরীক্ষা মৎকর্তৃক সাধিত হইয়াছে এবং উহাদ্বারা আমি একপ্রকারই ফল পাইয়াছি। osmotic pressure ও জলের আলোড়ন প্রভৃতি যাহাতে জলতলে উত্তরূপ মিশ্রণের বাধা ঘটাইতে না পারে, সেই জগুই চাকতি ও স্থূল নলটি ব্যবহার করিয়াছি। চিত্র হইতে উহা বুঝা যাইবে।

মৎস্য যে রসবেদী জীব, সে সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ। কিন্তু কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক বলেন যে, মৎস্যের জীবন যাপনের জগু দৃষ্টিশক্তিও তাহাদের বিশেষ সহায়ক হয়। তাঁহারা নাকি এ বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এই পরীক্ষা অল্পাধিক কাচের চৌবাচ্চার মধ্যে করিয়াছেন। অগাধ জলরাশির মধ্যে তাহাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখেন নাই। জলমধ্যে মাত্র ৩০ মিটার নিয়ে দৃষ্টিশক্তির কি রকম ব্যতিক্রম হয়, সে সম্বন্ধে পূর্বে বলিয়াছি। ৩০ মিটার জলের নিয়ে যে লাল রঙের লাল বলিয়া বুঝা যায় না, লাল রঙ কাল হইয়া যায়, তাহা সকলেই জানেন। জলের গভীরতা অল্পাধিক অন্যান্য বর্ণও অল্পরূপভাবে লুপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়াছি। তাহা ছাড়া বায়ুর ন্যায় জলেরও বিভিন্ন স্তর আছে। স্তরের বিভিন্নরূপ ঘনত্ব হেতু আলোর সরল গতি সব সময় অব্যাহত থাকে না। মরুভূমিতে মরীচিকা প্রভৃতির ন্যায় জলমধ্যেও দৃষ্টিবিক্রম (refraction) ঘটা অসম্ভব নয়। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে চক্ষু

মৎস্যের কোনওরূপ সাহায্যে ত আসেই না, বরং উহা তাহাদের বিশেষ বিপদের কারণ হইয়া উঠে। ধূসর কাচের (opaque glass) মধ্য দিয়া যেমন কেবলমাত্র প্রতিহত আলো (diffused light) ও অস্পষ্ট রূপ বা ছায়াদি দেখা যায়, মৎস্যের চক্ষু দিয়াও তেমনি মাত্র আলোর ঘনত্ব বুঝা যায়, কোনও বস্তুবিশেষ পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয় না। তবে অনেক বৈজ্ঞানিকই মৎস্যের দৃষ্টিহীনতা সম্বন্ধে সন্দিহান। হয় ত উহাদের দৃষ্টিশক্তি আছে; কিন্তু তাহা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কোনও স্থির বস্তুকে তাহারা বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারে না—অবশ্য যতক্ষণ না ঐ বস্তুবিশেষ নড়িয়া উঠে। তাহার পর মাত্র দুই এক ফুটের মধ্যে বস্তুবিশেষ থাকিলে তবে তাহারা উহা দেখিতে পায়—তাহাও আবার ছায়াধারে দেখে। তাহার উপর বস্তুবিশেষের পরিস্থিতি, আকার ও উহার দূরত্ব বুঝা মৎস্যের পক্ষে অসম্ভব। মানুষও কেবলমাত্র চক্ষুদ্বারা বস্তুবিশেষের দূরত্ব বুঝিতে পারে না। স্পর্শবোধ ও দৃষ্টিবোধ, এই উভয়বিধ বোধের সমন্বয় দ্বারাই দ্রব্যাদির দূরত্ব মানুষের বোধগম্য হয়। স্পর্শবোধের অভাবে বঙ্গদেশের লোকেরা পার্কত্যা প্রদেশে গিয়া পর্বতাদির দূরত্ব সম্বন্ধে প্রায়ই ভুল মত প্রকাশ করে। কিন্তু ঐরূপ ভুল পার্কত্যা প্রদেশবাসীরা করে না। কারণ, যাওয়া আসার ফলে তাহাদের দূরত্বসম্বন্ধীয় স্পর্শবোধ জন্মিয়াছে। মানুষেরই যখন এই ভুল হয়, তখন মৎস্য ত দূরের কথা। তবে স্পর্শবোধ যেমন মানুষের দৃষ্টিশক্তির সহায়ক হয়, রসবোধ কি মৎস্যাদির সেইরূপ দৃষ্টিশক্তির সহায়ক হয়? কিন্তু আমার মনে হয়, চক্ষু না থাকিলেও মৎস্য বাচিয়া থাকিতে পারে। জীবন যাপনের জন্ত তাহাদের রসবোধই যথেষ্ট। তাহাই যদি হয়, তবে তাহাদের চক্ষু থাকার প্রয়োজন কি? অনেকে মনে করেন, শুধু দেখিবার জন্ত চক্ষু ব্যবহৃত হয়; কিন্তু উহা ভুল। আরও অনেক বিষয়ে উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। মৎস্যের কথাই ধরা যাউক। মৎস্য চক্ষু দ্বারা শুধু আলোক গ্রহণ করে না, আলোক শোষণও করিয়া থাকে। বিষয়টা একটু বুঝাইয়া বলা দরকার। আমরা জানি, পারিপার্শ্বিক বর্ণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জীবগণের দেহে বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন মকুবাসী জীবগণ ধূসর বর্ণের হয়, আর মেরুবাসী জীবগণ হয় বরফের তায়ই সাদা। কারণ, ইহাতে তাহাদের আত্মরক্ষার সুবিধা হয়। পারিপার্শ্বিক বর্ণের সহিত মিশিয়া থাকায় শত্রুগণ তাহাদের খুঁজিয়া পায় না। আমার মতে চক্ষু দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়। মাছের চক্ষুর উপর লাল আলো ফেলিলে দেখা যায় যে, মাছের দেহটাও লাল হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে “The Animal Mind” নামক পুস্তকের ১৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত ছত্র কয়টি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। * পরীক্ষার

* These fishes become strikingly bluish on blue ground, greenish on green ground and so forth, adapting themselves to blue, green, yellow, orange, pink and brown and less successfully to red. The colour-changes are brought about by certain pigment controlling mechanism in the skin which are connected with the sympathetic nervous system. But the colour stimulus acts through its effect on the eyes: the changes do not occur if the eyes are covered.....if one eye is on the black ground and the other on the white ground, the skin becomes grey.

দ্বারা এই সব নিরূপিত হইয়াছে। এই পরীক্ষা বৈজ্ঞানিক Mast সাহেব স্বচাকুরূপেই করিয়াছেন। লাল, নীল ও সবুজ আবর্তনের মধ্যে পড়িয়া তিনি মৎস্যদিগকে যথাক্রমে লাল, নীল ও সবুজ হইতে দেখিয়াছেন। মৎস্যদিগের চক্ষু আবৃত করিয়া দিবার পর কিন্তু তাহাদের দেহের বর্ণপরিবর্তন আর হয় নাই। তাহার পর ইহাদের একটা চক্ষুর উপর কালো ও অপর চক্ষুর উপর সাদা আলো ফেলিয়া তিনি দেখিয়াছেন যে, মৎস্যগণ ধূসর বর্ণের হইয়া গিয়াছে। ..

কিন্তু মৎস্যের এই রূপ পরিবর্তনের জন্ত কেহ যেন মনে না করেন যে, মৎস্য একটা রঙ হইতে অপর একটা রঙ বাছিয়া লইবার ক্ষমতা রাখে। এরূপ ক্ষমতা মৎস্যের নাই। বৈজ্ঞানিক Watson সাহেবও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাহার বিশেষ মত নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল। “Animal Mind” এর ১৬৩ পৃষ্ঠায় তাহার মত সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ লিখিত আছে। নিম্নের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। * Watson সাহেবের এই মত হইতেও আমরা বলিতে পারি যে, দৃষ্টিশক্তি মৎস্যে বেশী কিছু কাজে আসে না। চক্ষু না থাকিলেও তাহারা অনায়াসে বাছিয়া থাকিতে পারে। এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির উপর মৎস্য বিশেষ নির্ভর করে না। তাহারা জীবনধারণার্থ রসবোধের উপরই সমধিক নির্ভর করে। এখন দেখিতে হইবে, মৎস্য ছাড়া আর কোনও জীব এই রসবেদী শ্রেণীর মধ্যে পড়ে কি না? আমার মনে হয়, নিম্নতম উভচর জীবগণকে রসবেদী জীবদিগের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। তবে ভেঁকাদি উচ্চতম উভচর জীবগণকে শব্দবেদী জীবদিগের মধ্যেই ফেলা উচিত। ভেঁক, বেঙাচি অবস্থায় রসবেদী জীব হইলেও ভেঁক অবস্থায় শব্দবেদী জীব। রসবেদী জীব হইতে শব্দবেদী জীবের সৃষ্টি হইবার সময় যে সকল মাঝামাঝি জীব সৃষ্ট হইয়াছিল, ভেঁকাদি জীব ছিল তাহাদের একটা। তাই শৈশবে থাকে তাহারা রসবেদী, আর প্রাপ্তবয়সে হইয়া পড়ে শব্দবেদী। আমার মনে হয়, পৃথিবীর প্রথম উভচর জীব রসবেদীই ছিল। তাহাদের জীবন যাপনের প্রণালী ছিল—আজকালকার ফুসফুস মাছের (lungs fish) ন্যায়। বেশীর ভাগ সময় তাহারা জলেই থাকিত, যেমন ফুসফুস মাছেরা থাকে। যাহা হউক, মানসিক পর্যায়ে “রসবেদী” বলিতে প্রাণীদিগের একটা প্রাথমিক বিভাগ বুঝায়। এখন দেখিতে হইবে, মানসিক পর্যায়ে প্রাথমিক বিভাগের কোন উপবিভাগ ছিল কি না। সহজ বুদ্ধিতে আমরা দেখিতে পাই যে, সমুদয় রসবেদী জীব নিম্নলিখিত ভাবে দুইটা বিশিষ্ট উপবিভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজীতে

* Ordinarily we mean when we say that an animal is sensitive to difference in wave length that such stimuli play a rôle in the adjustment of the animal to food, sexual objects, shelter, escape from the enemies etc. i. e. that such stimuli initiate actively in arcs which end “in the striped muscles.” Because the changes of colour are produced not by such arcs, but by the sympathetic nervous system, Weston thinks colour vision not produced.

ইহাদিগকে যথাক্রমে fresh water fish এবং salt water fish বলা হইয়া থাকে। হিন্দুগণও এই সম্বন্ধে ভাবিয়াছিলেন। নিম্নের শ্লোকটীতে ইহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

নাদেয়া মধুরা মংস্যা গুরবো মাক্তাপহাঃ।

সামুদ্রা গুরবঃ স্নিগ্ধা মধুরা নাতিপিত্তলাঃ ॥—আয়ুর্বেদ সংগ্রহ।

বিভিন্নরূপ জলের বিভিন্নরূপ প্রকৃতি হইয়া থাকে। জলের প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে রসেরও তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। রসের তারতম্য অনুসারে ব্যবহারেরও তারতম্য ঘটে। জীবের ব্যবহার অনুযায়ী আবার তাহাদের দেহেরও পরিবর্তন হয়। তাই আমরা নদী পুষ্করিণীর মিষ্ট ও সমুদ্রের নোনা, এই উভয়বিধ জলের অধিবাসিরূপে দুই জাতীয় মংস্যের মধ্যে আকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাই। বস্তুতঃ জল মিষ্ট ও নোনা, দুই প্রকারেরই হয়। এই ভাবে উপবিভাগ স্থিতি বিজ্ঞানসম্মত হইবে কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়। এই বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিতে আমি অপারগ। তবে শ্লোকটী হইতে আমরা মংস্যের ভৌগোলিক বিস্তার ও উপবিভাগ সম্বন্ধে একটা আভাস পাই। মংস্যের বিস্তার (migration) জলের লবণাংশের পরিমাণের উপরই যে বিশেষ নির্ভর করে, তাহা সকল বৈজ্ঞানিকই স্বীকার করেন। এই জন্ত এইরূপ উপবিভাগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা যায়।

গন্ধবেদী

রসবেদী জীবগণের পর মানসিক পর্যায়ে গন্ধবেদী জীবগণ তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ভ্রমর, মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি কীট পতঙ্গকে আর্ধ্য মনীষিগণ গন্ধবেদী পর্যায়ভুক্ত করেন। কীটাদি জীব, মংস্যাদি জীব অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব, তথাপি মানসিক পর্যায়ে আর্ধ্যগণ তাহাদের রসবেদী অর্থাৎ মংস্যাদির উপরে স্থান দিলেন কেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। আমরা জানি যে, কোনও একটি অধুনাপ্রাপ্ত নিকৃষ্ট জীব হইতে কোনও একটি উৎকৃষ্ট জীবের জন্ম হয় নাই। তথাকথিত নিকৃষ্ট জীবগণ উৎকৃষ্ট জীবগণের দূর বা নিকটতম ভাই মাত্র। উভয়ের ক্রমবিকাশ একই কোন জীব হইতে, ভিন্ন ভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার বা আবর্তনের মধ্যে পড়ায় বিভিন্নরূপে হইয়াছে। উভয়েরই পূর্বপুরুষ একই কোন জীব ছিল। বংশপরম্পরায় ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া তাহারা দুইটি ভ্রাতৃবংশের স্থিতি করিয়াছে মাত্র। একটি গন্ধবেদী ও অপরটি রসবেদী জীব। তাহা ছাড়া ইহাদের মানসিক গঠন মংস্যাদি জীব হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। ইহাদের সমাজ-গঠনরীতি অতি অদ্ভুত। ইহাদের রাজা, রাণী, সৈন্য, সেনাপতি, মজুর, ঘরবাড়ী, দুর্গ, প্রাসাদ, ভাণ্ডার, পালিত পশু, সবই আছে। ইহারা যুদ্ধবিগ্রহ করে, বন্দিশালায় বন্দী রাখে, শান্তি স্থাপনা করে, আহতদের শুশ্রূষা করে—পিপীলিকা, উই, মোমাছি প্রভৃতির জীবনপদ্ধতি লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝা যাইবে। ভূতাত্ত্বিকগণ জানেন যে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম Insecta বা গন্ধবেদী ব্যতীত সমুদয় নিরস্ত্রিক জীবের স্থিতি হয় অর্থাৎ কেবলমাত্র স্পর্শবেদী জীবের স্থিতি হয়। তাহার পর স্পর্শবেদী জীবভুক্ত কোন জীব হইতে (অনেকের মতে স্পর্শবেদিভুক্ত পক্ষীবেদী জীবের

অন্তর্গত কোন ক্রমলুপ্ত জীব হইতে) একটা ধারায় গন্ধবেদী জীব ও অপর একটা ধারায় রসবেদী জীবের সৃষ্টি হয়। তাহার পর রসবেদী জীব হইতে আবার প্রথম উভচর জীবের বিকাশ হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রথম উভচরগণও ছিল মৎস্যাদির ন্যায়ই রসবেদী। প্রথম উভচর সৃষ্টির অনেক পরে স্পর্শবেদী জীবের অন্তর্গত কোনও একটা ক্রমলুপ্ত পর্ববদী জীব হইতে প্রথম ধারায় গন্ধবেদী জীবের সৃষ্টি হয়। গন্ধবেদী জীবের পর পৃথিবীতে প্রথম (স্পর্শবেদীর দ্বিতীয় ধারা হইতে) শব্দবেদী জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। ভেকাদি উন্নত ধরণের উভচর জীবগণ ছিল পৃথিবীর এই প্রথম শব্দবেদী জীব। পূর্বকথিত রসবেদী নিম্ন উভচর জীব হইতেই শব্দবেদী (ভেকাদি) উচ্চ উভচর জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। উচ্চ উভচর জীব হইতে পরে পৃথিবীতে আবার সরীসৃপাদি অগ্রাগ্র শব্দবেদী জীবের আবির্ভাব হয়। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পৃথিবীতে ষট্পদী (Insecta) ব্যতীত সমুদয় নিরস্থিক জীবের সৃষ্টি হয় সর্বপ্রথম। ইহারা সকলেই ছিল স্পর্শবেদী জীব। স্পর্শবেদী জীবের সৃষ্টি সম্পূর্ণ হইলে তবে মৎস্যাদি ও প্রথম উভচর জীবের সৃষ্টি হয়। এই উভয়বিধ জীব ছিল রসবেদী জীব। রসবেদী জীবের সৃষ্টির অনেক পরে সৃষ্ট হয় ষট্পদী জীব (Insecta)। ইহাদিগকেই আমরা গন্ধবেদী বলি। তবে স্পর্শবেদী হইতে বিভিন্ন ধারায় ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। গন্ধবেদী জীবের সৃষ্টির পর রসবেদী হইতে (স্পর্শবেদীর দ্বিতীয় ধারা) সৃষ্ট হয় ভেকাদি উচ্চ উভচর ও সরীসৃপাদি জীব। এই দুইটি জীবকে আমরা শব্দবেদী জীব বলি। নিম্নলিখিত ভূতত্ত্ববিষয়ক তালিকা দেখুন।

জুরাসিক ...	পক্ষী জীব	গন্ধবেদী
ট্রিয়াসিক ...	ডাইনোসিরাম	গন্ধবেদী
পার্মিয়ান ...	সরীসৃপ ও উভচর ভেকাদি	গন্ধবেদী
কারবেনিফিরাস ...	ষট্পদী জীব (কীট পতঙ্গাদি)	গন্ধবেদী
ডিভোনিয়ান ...	নিম্নোভচর (সালেমেণ্ডার)	রসবেদী
স্থলেরিয়ান ...	ফুসফুস মাছ	রসবেদী
ওডোভিসান ...	মৎস্যজীব	রসবেদী
ক্যামব্রিয়ান ...	ষাবতীয় নিরস্থিক জীব— ষট্পদী ব্যতীত	স্পর্শবেদী
আরকিয়ান ...		স্পর্শবেদী

উক্ত তালিকাটিতে মানসিক পর্যায়ে কোন্ কোন্ জীব পর পর কি ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা দেখান হইয়াছে। স্পর্শবেদীর পর রসবেদী, রসবেদীর পর গন্ধবেদী, গন্ধবেদীর পর শব্দবেদী ও শব্দবেদীর পর যে রূপবেদী জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, উক্ত তালিকাটি তাহা সপ্রমাণ করে। ভূতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা মাটি খুঁড়িয়া এই প্রমাণ বাহির করিয়াছেন। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আর্ধ্যগণ রসবেদী জীবের পর গন্ধবেদী জীবের স্থান দিয়া কোনও অত্যাশ করেন নাই।

যটুপদী জীবকে (Insecta) আর্ধ্যগণ গন্ধবেদী জীব কেন বলিয়াছেন, এইবার সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব। যে সকল জীব কেবলমাত্র ভ্রাণশক্তির সাহায্যে আহাৰাদি সংগ্রহ ও চলাফিরার কার্য করে, তাহাদিগকে ইহারা গন্ধবেদী জীব বলিয়াছেন। অনেক অপরূপ ও স্থলর পুষ্পাদি বস্ত্রাবৃত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পতঙ্গগণ সেই পুষ্পের দিকে আকৃষ্ট হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, রূপ অপেক্ষা গন্ধই তাহাদিগকে আকৃষ্ট করে। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা আর্ধ্য মনীষিগণের সিদ্ধান্ত মংকত্বক নিভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডারোইন সাহেবের যৌন মতটী (sexual selection) খণ্ডন কবিবার জগ্গ উক্তরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। Lull সাহেবের Organic Evolution ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক পুস্তক। উক্ত পরীক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথাই এই পুস্তকে বিশেষ ভাবে লিখিত আছে।

তাহার পর পুংপতঙ্গ সাধারণতঃ রূপবান্ হয়। কোনও কোনও স্ত্রীপতঙ্গ মোটেই রূপবান্ হয় না। ডারোইন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পূর্বে মনে করিতেন যে, পুংপতঙ্গের রূপই স্ত্রীপতঙ্গদিগকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এ ক্ষেত্রেও রূপ অপেক্ষা গন্ধই স্ত্রীপতঙ্গগণকে পুংপতঙ্গের দিকে আকৃষ্ট করে। পুংপতঙ্গের রঙিন পক্ষের ছেদ ও দেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কেবলমাত্র গন্ধ দ্বারা তাহারা পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইয়া মিলিত হইতেছে। লাল সাহেবের উপরিউক্ত পুস্তক পাঠে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও যে এই পক্ষচ্ছেদ প্রভৃতি পরীক্ষা দ্বারা উক্ত সত্যে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি। আমি নিজেও এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা সমান ফল পাইয়াছি। ইহাতে বুঝা যায় যে, গন্ধ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই স্ত্রী ও পুংপতঙ্গ পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, পতঙ্গ বা কীটাদি জীবের শুয়া বা Antennae-র মধ্যে গন্ধকোষ বর্তমান আছে। কোন কোন পতঙ্গ পচা মাংসাদিতে ভিষ রক্ষা করে। কারণ, এই পচা মাংস হইতে তাপ সংগ্রহ দ্বারা তাহাদের ভিষগুলি স্ফুটিত হয়। কিন্তু এই বিশেষ পতঙ্গটির Antennae (বোধিকা) ছেদন করিয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহারা সেই পচা মাংসাদি খুঁজিয়া বাহির করিতে ত পারেই নাই; এমন কি, স্ত্রীপুরুষের সংযোগও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।* McIndoo সাহেবের মতে

* 1818. Sur les Sensations des insectes Recueil Zool. Suisse, T. 4, No 2.

শুধু Antennaeতে নয়, তাহাদের দেহের সর্বত্রই এই গন্ধকোষ বর্তমান আছে। তাহার ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া উহাদের পক্ষমূলে ও পদমধ্যে এই গন্ধকোষগুলি বর্তমান আছে।* McIndoo সাহেব গুরুরে পোকা, পিপড়া, মোমাছি ও ভীমকল দ্বারা পরীক্ষান্তে উক্তরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। আমরা জানি, পিপীলিকা মোমাছি আদি সামাজিক জীব। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এই সকল Insecta বা ষট্‌পদী জীবের অত্যন্ত সামাজিক জীবন কেবলমাত্র গন্ধবোধের উপরই নির্ভর করে। পিপীলিকা আদি জীবগণ তাহাদের বাসভবন ও সঙ্গিগণকে গন্ধ দ্বারাই খুঁজিয়া বাহির করে। প্রায় দেখা যায়, পিপীলিকাগণ গমনাগমনের জন্য একই পথ ব্যবহার করে। গন্ধদ্বারাই তাহারা তাহাদের পথ চিনিয়া রাখে। এক মাইলেরও অধিক দূর হইতে পুংপতঙ্গগণ গন্ধদ্বারা স্ত্রীপতঙ্গগণকে খুঁজিয়া বাহির করে। তাহা ছাড়া খাদ্যাদির অবস্থানও তাহারা এইরূপে বহু দূর হইতেই নিরূপিত করে—পরীক্ষা দ্বারা ইহা জানা গিয়াছে। এ বিষয়ে Animal Mind নামক পুস্তকের ৯১-১০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সমুদয় কীট জীব (land insect) ও পতঙ্গাদি (flying insect) জীব, তাহাদের স্ত্রী-পুরুষের মিলন, খাদ্য আহরণ, বাসভূমি নিরূপণ, আত্মরক্ষা, সন্তান পালন প্রভৃতি কার্যের জন্য কেবলমাত্র গন্ধের উপরই নির্ভর করে। বিছা বাহির হইলেই তেলাপোকা জীবকে আত্মরক্ষার্থ আমরা ইতস্ততঃ উড়িতে দেখি। বিছার আবির্ভাব যে গন্ধ দ্বারাই তেলাপোকারা জানিতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, কীট পতঙ্গাদি বা Insecta জীবমাত্রই হিন্দুতে গন্ধবেদী জীবের অন্তর্গত। শব্দকণা যেমন বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া বহু দূরে নীত হয়, গন্ধকণাও তেমনি বায়ু দ্বারা বহু দূর পর্যন্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে। বেতার যন্ত্র যেমন বহু দূরের শব্দকণাগুলি যন্ত্রদ্বারা ধরিয়া লয়, Insecta জীবের দেহমধ্যস্থ গন্ধকোষগুলিও তেমনি গন্ধকণাগুলি ধরিয়া লয়। তাহাদের গন্ধকোষগুলির মধ্যে নিহিত রাসায়নিক পদার্থ হয় ত তাহাদের এই কার্যে সহায়ক হয়। বায়ুর গতির বিপরীত দিক্ হইতেও মক্ষিকাকে আমি ফুলের দিকে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়াছি। মক্ষিকাদিগকে উপবাস করাইয়া রাখিলে হয় ত এই গন্ধকোষের শক্তির হ্রাস হয়। বন্দী অবস্থাপন্ন মক্ষিকাদিগকে উপবাস করাইয়া রাখিয়া আমি তাহাদের ভ্রাণশক্তির হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটিতে দেখিয়াছি। যাহা হউক, এই গন্ধবেদী জীবের কোন উপবিভাগ ছিল কি না, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। গন্ধবেদী জীবের উপবিভাগ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ এখনও সংগ্রহ করিয়া উঠা যায় নাই। তবে গন্ধ বহুপ্রকারের হইয়া

* McIndoo, N.E., 1914. The olfactory sense of the honey bee. Jour. Exper. Zool., vol. 16, p. 265.

1914. The olfactory sense of the hymenoptera. Proc. Nat. Acad. Sci., Philadelphia, April, 1914.

1914. The olfactory sense of insects. Smithsonian. Misc. Col., Vol. 63, p. 1.

থাকে। এক একপ্রকার গন্ধ দ্বারা এক একপ্রকার গন্ধবেদী জীব যে চালিত হয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। Greber সাহেব এই সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন।* এক একজাতীয় যটপদী (insecta) এক একপ্রকার গন্ধ পছন্দ করে। বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভিন্ন প্রকার গন্ধদ্রব্য রক্ষা করিয়া আমিও এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছি। তাহাতে আমার মনে হয়, এক একজাতীয় যটপদী জীব এক একপ্রকার গন্ধ দ্বারা চালিত হয়। গন্ধের বিভিন্নতার জন্য একজাতীয় যটপদীর সহিত আর একজাতীয় যটপদীর যৌন মিলন সম্ভব হয় না। গন্ধের বিভিন্নতারূপ প্রাচীরের জন্যই একই স্থানের মধ্যে বহুজাতীয় যটপদী স্ব স্ব জাতিগত স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। এই জন্য নির্দিষ্টচার যৌন মিলন দ্বারা তাহারা একজাতিতে পরিণত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে সন্ধর জাতির উদ্ভবও এই জন্য হয় নাই। এই গন্ধরূপ প্রাচীরের জন্যই (পরিমিত স্থানের মধ্যে বাস করা সম্ভবও) তাহাদের মধ্যে নির্দিষ্টচার যৌন মিলন সম্ভব হয় না। তাই আজ পৃথিবীর মধ্যে আমরা সর্বশুদ্ধ ৩৫০০,০০০ জাতীয় যটপদী জীব দেখিতে পাই। উত্তর আমেরিকার কথাই ধরা যাউক। উত্তর আমেরিকায় সর্বশুদ্ধ মাত্র এক হাজারজাতীয় পক্ষী আছে, কিন্তু ঐ দেশে একমাত্র মক্ষিকার জাতিই দশ হাজারের উপর। বিভিন্নজাতীয় যটপদীর বিভিন্নরূপ গন্ধই বোধ হয় ইহার কারণ। গন্ধরূপ স্বাতন্ত্র্য হইতেই তাহাদের মধ্যে এতগুলি জাতির সৃষ্টি হইয়াছে কি? গন্ধের সূক্ষ্মতা একমাত্র গন্ধবেদীরাই ধরিতে পারে। ইহার শব্দ করে বটে, কিন্তু সেই শব্দ তাহাদের মুখবিবর হইতে আসে না—পাখার সজ্জবের দ্বারা তাহারা শব্দ করে। তবে সেই শব্দ তাহাদের নিজেদের কোনও কাজে আসে না। কারণ, শব্দজ্ঞান তাহাদের একেবারেই নাই। Forel সাহেব তাহা প্রমাণ করিয়াছেন † তাহাদের কৃত এই শব্দ, শব্দবেদী সরীসৃপাদির পক্ষে (টিকটিকি আদি) তাহাদিগকে শিকাররূপে পাইবার সুযোগ দেয় মাত্র। দর্শনশক্তি যে তাহাদের কোনও কাজেই আসে না, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। একমাত্র গন্ধই তাহাদের সম্বল। কারণ, তাহারা গন্ধবেদী।

শব্দবেদী

আর্য্যমতে মানসিক পর্যায়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করে—এই শব্দবেদী জীবগণ। ভেঁকাদি উচ্চ উভচর জীব ও সর্পাদি সরীসৃপ জীবগণ হিন্দু শাস্ত্রকারগণের মতে শব্দবেদী জীব। প্রথমে সরীসৃপ জীবের কথাই বলা যাউক। মৎস্যাদির ন্যায় ইহাদের গাত্র আঁশদ্বারা আচ্ছাদিত। স্তবরাং স্পর্শবোধ ইহাদের অল্পই জন্মে। সেই জন্য সর্পাদি জীব তাহাদের খাত্তাদির উপর দিয়া চলিয়া গেলিও খাত্তকে খাত্ত বলিয়া বুঝিতে পারে না। তাহার পর ইহাদের দৈহিক উচ্চতা কম। গর্ত, আবর্জ্জনাস্তূপ ও গভীর জঙ্গলে বাস করায় ইহাদের

* 1889. Über die Empfindlichkeit einiger. Meerthiere gegen Riech—stoffe. Biol. Cent., Bd. 8, S. 743.

† 1818. Sur les Sensation des insect. Recneil Zool, Suisse, T. 4, no. 2.

দৃষ্টিপথ অনেক সময় অবরুদ্ধ থাকে। সেই জন্ত সাধারণতঃ শব্দদ্বারা ইহারা শিকারের অবস্থিতি-স্থান নিরূপিত করে। ইহারা শব্দ শুনিবামাত্র বুঝিতে পারে যে, তাহাদের খাদ্য বা শিকার কোথায় ও কিরূপ অবস্থায় আছে। সেই শব্দদ্বারা গতি অনুধাবন করিয়া তাহারা শিকারের অনুসরণ করে। আমি স্বচক্ষে অনেক সর্পকে সোজা পথ অনুসরণ করিয়া, পরে হঠাৎ পিছন ফিরিয়া ভেতর ধরিতে দেখিয়াছি। অভ্যাসবশতঃ সর্পীস্থ পজাতির শব্দ অনুধাবনশক্তি, ব্রাণ ও দৃষ্টিশক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়া থাকে। সাপ, কুস্তীর, গোহাড়গিল, টিকটিকি প্রভৃতির ভঙ্গিগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, তাহারা সব সময় মন্তক কিছু উচ্চ করিয়া শব্দ অনুধাবনের জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। চলিতে চলিতে থামিয়া গিয়া, ঐরূপ ভাবে তাহারা শব্দ অনুধাবন করে ও তাহার পর আবার চলিতে শুরু করে। মাথাটি কিছু বামে বা দক্ষিণে কাত করিয়া তাহারা শব্দ শুনিবার চেষ্টা করে। বাগিচা ও জঙ্গলে গোহা প্রভৃতি সর্পীস্থ জীবের এইরূপ আচরণ আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। অনেকে জানেন, সাপ বাঁশী শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসে। সংস্কৃত অভিধানে দেখা যায় যে, সর্পের একটি নাম “চক্ষুঃশ্রবাঃ”। চক্ষু দিয়াও যেন ইহারা শুনিতে পায়। ইহাদের চক্ষুঃশ্রবা বলা হইয়াছে কেন? আমাদের চক্ষুপত্র বায়ু বা বিপুল শব্দাভিঘাতে প্রায়ই মুদ্রিত হইয়া পড়ে। সর্পাদি জীবের চক্ষুপত্র নাই। শব্দজনিত বায়ুর আলোড়ন কি ইহাদের চক্ষুর পর্দার উপর সরাসরি আঘাত করে? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে সেই আঘাতজনিত শব্দবোধ কি অসম্ভব? আমার মনে হয়, আর্ধ্য মনীষিগণ সর্পের এই সব বিষয় পর্যালোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন। শব্দজনিত জলের আলোড়নও হয় ত কুস্তীরাদির পত্রহীন চক্ষুর উপর এইরূপ কার্যকারী হয়। তাহার পর নৌকাপথে আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, অনেক কুস্তীর নদীসৈকতে শুইয়া আছে ও অদূরে বসিয়া পক্ষিগণ তান ধরিয়াছে। কুস্তীরগণ চূপ করিয়া তাহা শুনিতেছে। পক্ষিগণও উড়িয়া গেল, কুস্তীরসকলও সেই স্থান ত্যাগ করিল। গভীর জলের অন্ধকার-মধ্যে শব্দই কুস্তীরদিগের শিকার ধরিবার সহায়ক হয়। স্ত্রীপুরুষের সন্নিধানও এই শব্দ দ্বারাই তাহারা জানিতে পারে। স্ত্রী ও পুরুষ সর্পগণ শব্দ দ্বারাই পরস্পর পরস্পরের সন্নিধান অবগত হয়। ঋতুকালে (Breeding time) তাই তাহারা প্রচুর শব্দ করে। আমেরিকা দেশের Rattle Snake এর লেজে বুনবুনির শব্দ এক রকম শব্দযন্ত্র আছে। টিকটিকিরাও বোধ হয়, এই একই কারণে লেজ দ্বারা শব্দ করিয়া থাকে। কাচের জারের মধ্যে জীবন্ত সাপ রাখিয়া আমি দেখিয়াছি যে, জারের বাহিরে ভেতর রাখিলেও তাহারা বিচলিত হয় না। কিন্তু সূক্ষ্ম জাল দ্বারা আবৃত বাস্কের মধ্যে রাখিয়া সামান্য মাত্র শব্দদ্বারা সেই সাপকে আমি আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছি। একটা কাচের বাস্কে টিকটিকি রাখিয়া, উহাদিগকে যথাক্রমে রঙিন আলোক ও বিভিন্ন গন্ধদ্বারা আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে উহারা বিচলিত হয় নাই। কিন্তু সামান্যমাত্র শব্দেই তাহারা ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়াছে। তাহার পর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোন বস্তু স্থিরভাবে থাকিলে, সেই বস্তুবিশেষের

- স্বরূপ তাহাদের উপলব্ধি হয় না। বস্তুর দূরত্বও তাহারা নিরূপিত করিতে পারে না।
- বস্তুর দূরত্ব ও স্বরূপ তাহারা শব্দ দ্বারা নিরূপণ করে। তাহার পর চক্ষুর দ্বারা সমতল ভূমির দ্রব্যাদিই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, তাহারা সমতল ভূমিতে খুব কমই বাস করে। অপরিসর গর্ভ, আবর্জ্ঞানাস্তূপ ও জলই তাহাদের বাসভূমি। ফলে এই অনতিউচ্চ জীবদিগের দৃষ্টিশক্তি কাজে খুব কমই আসে। স্থলজ সরীসৃপের কথা বলা হইল। এইবার জলজ সরীসৃপের কথা বলিব। কুস্তীর অধ্যুষিত কোন জলাশয়ে কেহ যদি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে সে কুস্তীর দ্বারা ধৃত হয় না। কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়াইয়া শব্দ করিলে তৎক্ষণাৎ সে ধৃত হয়। জলের উপর মাথা তুলিয়া শিকারের অবস্থিতি তাহারা কোনও কোনও সময়ে দেখিয়া লয় বটে, কিন্তু কেবলমাত্র দৃষ্টির দ্বারা বস্তুবিশেষের স্বরূপ বা দূরত্ব তাহারাও নিরূপণ করিতে পারে না। ফলে অনেক সময় তাহারা আন্দাজের উপর নির্ভর করে ও প্রায়ই শিকার ধরিতে অকৃতকার্য হয়। কিন্তু তাহাদের শব্দবোধ তাহা-দিগকে শিকারাদি সম্বন্ধে অব্যর্থসম্বাদী করিয়া তুলে। শব্দ করিবামাত্র কাহারও আর নিস্তার থাকে না। মৎস্যাদি বা অন্যান্য জলজ জীব ধরিবার সময় তাহারা কেবলমাত্র শব্দের উপরই নির্ভর করে। ভারতবর্ষের বহু তীর্থস্থানে পুষ্করিণীতে কুর্ম জীব বাস করে। খাবার লইয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলে তাহারা তীরের নিকট আসে। পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে তাহাদের এইরূপ ব্যবহার অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বাহিরের শব্দ জলের মধ্যে প্রবেশ করে কি না ও করিলে কত দূর পর্যন্ত করে, তাহা ভবিষ্যৎ বিষয়। কেহ কেহ বলেন, শব্দের বেগে জলে কম্পন উপস্থিত হয় ও সেই কম্পনদ্বারা কুর্ম জীবের শব্দবোধ হয়। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে মৎস্যগণ অনুরূপ কম্পন দ্বারা আকৃষ্ট হয় না কেন? তাহারা রসবেদী বলিয়া কি? পুরীর জগন্নাথধামে ইন্দ্রহাস্য নামক স্রবৎ পুষ্করিণীতে বহু বৃহদাকার মৎস্য ও কুর্ম আছে। তবে “আয় আয়” করিয়া ডাকিলে কেবলমাত্র কুর্মগণই তীরে আসে। বাহিরের শব্দ জলমধ্যে কতক দূর পর্যন্ত যে শুনা যায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জলমধ্যেও এক স্থানের শব্দ অপর এক স্থান হইতে শুনা যায়। জলমধ্যে মাত্র সরীসৃপ জীবই এই শব্দ অনুধাবন করিতে পারে। কারণ, আসলে তাহারা ডাঙ্গার জীব, মাত্র অভ্যাসবশতই তাহারা জলে বাস করে। তাহার পর জলের মধ্যে দৃষ্টিশক্তি কিরূপে ব্যাহত হয়, তাহা আমি রসবেদী জীবের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় বলিয়াছি। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, সরীসৃপ জাতির দৃষ্টি ও ভ্রাণশক্তি অপেক্ষা শব্দবোধ অনেক বেশী, অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম শব্দও তাহারা ধরিতে পারে। অপর জীবদিগের অবোধা শব্দ তাহাদের অতি সহজে বোধগম্য হয়। শব্দবোধ অর্থে আমরা একটি শব্দ হইতে অপর একটি শব্দের বিভিন্নতা বুঝিবার ক্ষমতাবিশেষও বুঝিব। এই শব্দবোধ তাহাদের দৃষ্টি ও ভ্রাণশক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। আমি একটি টিকটিকির চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়া দেখিয়াছি যে, সে অনায়াসে বাচিয়া আছে ও এক দেওয়াল হইতে অগ্নি দেওয়ালে গিয়া শিকার ধরিতেছে। সর্পাদি সরীসৃপ

ভেকের শব্দে আকৃষ্ট হয়; কিন্তু অল্প কোন জীবকৃত শব্দে তাহারা আকৃষ্ট হয় না। মাল্লুষের পদশব্দে তাহারা পলাইয়া যায়, কিন্তু গবাদির পদশব্দে তাহারা বিচলিত হয় না। অবশ্য তাহাদের এই আচরণ স্বভাবপ্রসূত বা instinctive, বুদ্ধিপ্রসূত নয়। এই সব কারণে সরীসৃপ জীবকে শব্দবেদী জীব বলিলে কোনও অত্যাশ্চর্য্য হয় না।

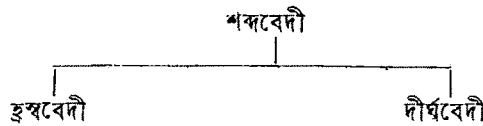
ইহাদের চক্ষুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও কিছু বলা উচিত। মৎস্য ও ভেকাদির ন্যায় ইহাদের চক্ষুও আলোক শোষণের কার্য্য করে। আমাদের মতে মৎস্য ও ভেকাদির ন্যায় চক্ষুর সাহায্যেই ইহাদের গাত্রবর্ণের বিকাশ হইয়াছে। এই জন্য যে সকল টিকটিকি পুরুষাল্লক্রমে গৃহাদির দেওয়ালে বাস করে, তাহাদের গাত্রবর্ণ সাদা হয়। মেটে ঘরের টিকটিকিরা হয় মেটে রংবিশিষ্ট। বহু পুরুষ অতিবাহিত হওয়ায় ইহাদের গাত্রবর্ণ স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কুকলাস জীব এখনও গাত্রবর্ণ পরিবর্তন করে। শ্যামল বৃক্ষাদির অধিবাসী টিকটিকি জীব ভিন্নবর্ণের হইয়া থাকে। সর্পাদির গাত্রবর্ণও তাহাদের আবাসস্থল অনুযায়ী হইয়া থাকে। ক্রমবিকাশ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বলিব। যে বর্ণপরিবর্তন মৎস্য ও উভচরে এক পুরুষে সাধিত হয়, সরীসৃপ জীবে তাহা সম্পন্ন হইতে বহু পুরুষের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ভেকাদি উচ্চোভচর জীবগণও যে শব্দবেদী জীব, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ইহাদেরই শব্দবোধ জন্মে। ইহাদের কর্ণযন্ত্র বিশেষ সুগঠিত। তাহার পর শব্দ করিবার ক্ষমতাও ইহাদের আছে। আমার মনে হয়, শব্দদ্বারাই ইহারা স্ত্রীসন্নিধান লাভ করে। কারণ, জননক্রিয়ার জন্য ইহাদের পরস্পর পরস্পরের সন্নিহিতে আসিবার প্রয়োজন হয়। তাহার পর জলমধ্যে যে দৃষ্টি ব্যাহত হয়, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। স্থলেও দৃষ্টিবোধ তাহাদের বিশেষ কাজে আসে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সরীসৃপ জীবের ত্রায়ী ইহারা দৃষ্টিদ্বারা দ্রব্যবিশেষের স্বরূপ ও দূরত্বাদি নিরূপণ করিতে অক্ষম হয়। দ্রব্যাদি স্থির থাকিলে উহার স্বরূপ তাহাদের বোধগম্য হয় না। মৎস্যের ত্রায় ভেকাদিরও গাত্রবর্ণ পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের বর্ণাল্লযায়ী বদলাইয়া থাকে। এবং মৎস্যের ত্রায় ইহাদের চক্ষু নষ্ট করিয়া দিলে উক্তরূপ বর্ণপরিবর্তন ইহাদেরও দেহে ঘটে না। রানা হেক্সাভ্যাক্টাইলা নামক ভেক লইয়া আমি এই পরীক্ষা করিয়াছি। পুকুরের জলজ উদ্ভিদ যেখানে বেশী থাকে, সেইখানেই ইহারা থাকিতে ভালবাসে। গাছের রঙের সহিত নিজেদের দেহের রং সমান বলিয়া ইহাদের অবস্থিতি শত্রুরা জানিতে পারে না। ইহাদের গাত্রবর্ণ ঠিক সবুজ পাতার ন্যায়। জলশূন্য স্থান বা পরিষ্কার জলে উহাদের রাখিলে অল্প সময়ের মধ্যেই উহাদের গাত্রবর্ণ নীসার মত হয়। ইহাদিগকে চক্ষুহীন করিয়া সবুজ রঙের জলজ বৃক্ষাদির মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াও দেখিয়াছি, ইহাদের গাত্রবর্ণ নীসার ন্যায়ই রহিয়া গিয়াছে। রূপদর্শন অপেক্ষা রূপ পরিবর্তনের জন্যই ইহাদের চক্ষুর প্রয়োজন বেশী। এই জন্যই বোধ হয়, ইহাদের চক্ষু সুগঠিত দেখা যায়।

শিকার ধরিবার জন্য ভেকের শব্দবোধ কতটা কাজে লাগে, তাহা বলা বড় শক্ত।

আত্মরক্ষার্থে যে এই শব্দবোধ ক্রিয়াক্রমে পরিমাণে তাহাদের সহায়ক হয়, তাহাও বলা কঠিন। কারণ, ভেকভুক্ জীবগণ নিঃশব্দেই সমাগত হয়। আত্মরক্ষার এই ক্ষমতার জন্যই বোধ হয়, হাজার হাজার ভেকশিশু জন্মিলেও মাত্র কয়েকটি করিয়া ভেক পুষ্করিণী আদিতে আমরা জীবিত দেখিতে পাই। মৃত্যুর হার বেশী বলিয়া জন্মের হারও ইহাদের বেশী। বংশরক্ষাকল্পেই তাহাদের শব্দবোধের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই জন্য ঋতুকালে ভেককে ডাকিতে দেখা যায়। এই ভাবে তাহাদের সত্যকার জীবন-মরণ সমস্যা এই শব্দবোধের উপরই নির্ভর করে। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে আবার কি জল, কি স্থল, উভয় ক্ষেত্রেই ভেক তাহাদের স্বস্থানস্থান শব্দবোধশক্তিদ্বারা আত্মরক্ষা ও আহার সংগ্রহাদি করিয়া থাকে। Yerke সাহেবের মতে ভেক বহুবিধ শব্দই শুনিতে পায় ও সেই অনুপাতে আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত হয়। এ বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষাও তিনি করিয়াছিলেন।* তাঁহার মতে অতি স্বস্থানস্থান শব্দ, যাহা অপরাপর জীবের বোধের অগম্য, তাহা ভেকাদি ও সরীসৃপ জীবগণ ধরিয় লইতে পারে। অভ্যাস দ্বারাই তাহারা এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। দৈহিক অনুচ্চতা এবং অপরিসর ও অন্ধকারময় বাসস্থানের জন্য বাধ্য হইয়াই তাহাদিগকে এই অভ্যাস লাভ করিতে হইয়াছে।

শব্দবেদী জীবগণের মধ্যে কোন উপবিভাগ ছিল কি না, সেই সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করিব। উপবিভাগ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ এখনও পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। তবে শব্দবেদী জীবদিগকে শব্দগ্রহণের ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে উপবিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—হ্রস্ববেদী ও দীর্ঘবেদী। শব্দের আলোড়ন বা প্রবাহের তারতম্য অনুযায়ী এই দুই প্রকার বিভিন্নরূপ বোধের সৃষ্টি হয়। যে সকল শব্দ মনুষ্যগণও অতি স্বস্থতা হেতু অনুধাবন করিতে পারে না, টিকটিকি আদি জীব সেই সকল শব্দ অনুধাবন করিতে পারে। স্ততরাং ইহাদিগকে হ্রস্ববেদী বলা যাইতে পারে। কুস্তীরাদি জীব জলমধ্যে বাস করায় হ্রস্ববেদী জীব। জলমধ্যে শব্দ স্বস্থভাবেই অনুভূত হয়। কুম্ভাদিও ইহাদের মধ্যে পড়ে। অপর দিকে সর্পাদি জীব দীর্ঘবেদী। ইহাদের অনুধাবনের জন্য সূদীর্ঘ স্বরের প্রয়োজন হয়।



! রূপবেদী

কাকাদি পক্ষিগণকে আর্থ্য মনীষিগণ মানসিক পর্যায়ে পঞ্চম স্থান প্রদান করিয়াছেন। পক্ষিকুলকে তাঁহারা রূপবেদী জীব বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহাদের মতে পক্ষিকুলের

* 1903. The instincts, etc., III. Auditory Reactions of frog. Ibid., Vol. I, p. 627.

স্ফূট (Cartilaged) ও দীর্ঘ চক্ষুর স্পর্শ দ্বারা আহাৰাদি সঞ্চয়ী বোধ হয় না। তাহার পর চক্ষুর অল্পপাতে জিহ্বা অনেক সময় ক্ষুদ্র হওয়ায় জিহ্বা দ্বারা তাহারা খাণ্ডাদি স্পর্শ করিতে অপারগ হয়। কোনটী খাণ্ড ও কোনটী বা খাণ্ড নয়, তাহা উহার চক্ষু দ্বারা দৃষ্টি সহযোগে বুঝিতে পারে, এ বিষয়ে তাহারা জিহ্বার সাহায্য লয় না। খাণ্ডাখাণ্ডের বিচার তাহারা খাণ্ডের বর্ণ দেখিয়া নিরূপিত করে। উন্মুক্ত প্রান্তরে একটী দূষিত জলপূর্ণ কলস ও একটী মিষ্ট জলপূর্ণ কলস রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, বায়সগণ কলসোপরি বসিয়া, নিম্নে কয়েকবার দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করে ও তাহার পর সেই মিষ্ট জল পান করে। কোন অবস্থাতেই তাহারা দূষিত জল পান করে না। আমি নিজে এই পরীক্ষা করিয়াছি। তাহার পর অরণ্যের মধ্যে বর্ণ ও আকার দেখিয়া ইহারা বিযাক্ত ও স্মৃষ্টি ফল চিনিয়া লয়। অনেক মিষ্ট ফল বিযাক্ত ফলের অনুরূপ হয়, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি দ্বারা ইহারা ঐ ফলের স্বরূপ বুঝিয়া লইতে পারে। যে ভুল মালুম্বে করিয়া থাকে, তীব্র বর্ণবোধ হেতু ইহারা সে ভুল কদাপি করে না। চিল প্রভৃতি পক্ষিগণ এক মাইল উর্দ্ধ হইতেও নিম্নের জিনিষ চিনিয়া লয়। বংশানুক্রমে চক্ষুর অতিব্যবহারে ইহাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও ভ্রাণশক্তি প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক বেশী তীক্ষ্ণ ও কার্য্যকরী হইয়াছে। সেই জন্ত পক্ষীদিগের চক্ষুদ্বয় বিশেষ সুগঠিত হইয়া থাকে। তাহার পর ইহাদের দেহ পালকে ঢাকা থাকায় স্পর্শবোধ ইহাদের মধ্যে তীক্ষ্ণ হয় না। রসবোধের প্রয়োজনীয়তাও কম। ইহারা গিলিয়াই আহাৰ করিয়া থাকে। জিহ্বার স্বল্প ব্যবহার হেতু ইহাদের জিহ্বার তলদেশের রসকোষগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

তাহার পর শ্রবণযন্ত্র বা “কোচেলা”রূপ যে যন্ত্র কর্ণমধ্যে থাকায় স্তম্ভপায়ী জীবগণের স্বরবোধ জন্মে, সেই শ্রবণ বা কোচেলা যন্ত্র পক্ষীদিগের নাই। ইহাদের কেহ কেহ হৃৎকথা বা শব্দ নকল করে বটে, কিন্তু ইহাদের কদাপি স্বরবোধ জন্মে না। স্বরবোধ ও স্বরবোধ এক জিনিষ নয়। স্বরের তারতম্যের জ্ঞান ইহাদের মধ্যে নাই। সর্পাদির গ্রায মিষ্ট স্বর ইহাদিগকে কখনও আকুল করে না। অতি সূক্ষ্ম স্বর ইহারা কখনও গ্রহণ করিতে পারে না। অপর দিকে একটী স্বর হইতে অপর একটী স্বরের পার্থক্য ইহারা কখনও বুঝে না। ইহাদের স্বরবোধ নাই বলিলেই চলে। বন্দুকের গ্ৰায উৎকট শব্দ ব্যতিরেকে স্বল্প শব্দে পক্ষিকুল বিশেষ বিচলিতও হয় না। সেই জন্ত কাঁকাদি তাড়াইবার সময় কেবলমাত্র চীৎকার করিলে বিশেষ ফল হয় না। কিন্তু চীৎকারের সঙ্গে হাত-পা নাড়িলে নীচে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবামাত্র কাঁক পলায়ন করে। তাহার পর পক্ষিকুল দূরের শব্দ ভাল করিয়া শুনিতে পায় না। কিন্তু দূরের দ্রব্যাদি তাহারা ভাল করিয়াই দেখিতে পায়। দ্রব্যাদির স্বরূপও তাহারা বুঝিতে পারে। কারণ, তাহারা রূপবেদী জীব।

ডারোইন সাহেবের যৌন মতও (sexual selection) আৰ্য্য মনুষ্যগণের এই মত কিয়ৎপরিমাণে সমর্থন করে। ডারোইনের মতে পক্ষিকুলের রূপজ্ঞান তাহাদের যৌন মিলনের সহায়ক হয়। বিশেষ করিয়া পুংময়ূরের রূপচ্ছটা নাকি স্ত্রীময়ূরের

মন ভুলাইবার জন্ত সৃষ্ট হইয়াছে। ভারোহিনের মতের বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতগণ রূপবান্ পুংকীটাদির পক্ষচ্ছেদ ও তাহাদিগকে বস্তুবৃত্ত করিয়া, তাঁহার এই যৌন জনন-মতটীর খণ্ড করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। • কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান (জানিতেন না) যে, পতঙ্গ জীবগণ গন্ধবেদী জীব, রূপবেদী জীব নয়। পতঙ্গ জীব সম্বন্ধে যাহা সত্য, রূপবেদী পক্ষিকুল সম্বন্ধে তাহা সত্য নাও হইতে পারে। স্ত্রীপক্ষী, পুংপক্ষীর রূপচ্ছটা দেখিয়া যে আকৃষ্ট হয়, তাহা খুবই সত্য। বিশেষ অবলোকন দ্বারা উহার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। এমন কি, পুং ও স্ত্রীকোকিল, উভয়েই কুম্ভবর্ণের হইলেও তাহাদের দেহাবয়বের গঠন এবং বর্ণসামঞ্জস্যের প্রভেদ ও তারতম্য লক্ষিত হয়। পুংকোকিলের গাত্রবর্ণের জলুস কিছু অধিক হইয়া থাকে। পক্ষিকুলের দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতাহেতু, পুংকোকিলের দেহের এই জলুস স্ত্রীকোকিলের চোখে ধরা পড়ে। পক্ষিকুলের মধ্যে এই জননপ্রথা সম্বন্ধে ভারোহিনের মতের কেহ প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু কোকিল সম্বন্ধে ভারোহিন সাহেব তাহাদের বর্ণসামঞ্জস্য উপেক্ষা করিয়া, তাহাদের গলার স্বরের কথা আনিয়াছেন। তাঁহার মতে পুংকোকিলের মিষ্ট গলা স্ত্রীকোকিলকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু উহা ভুল। পক্ষিকুল রূপবেদী জীব, শব্দবেদী নয়। পক্ষীর গ্রায় নিম্ন প্রাণীর মধ্যে একমাত্র দৃষ্টিবোধই সম্ভব হয়। মনুষ্য ব্যতীত স্বরবোধ আর কোন জীবের থাকিতে পারে না। দৃষ্টিবোধ চক্ষুর উপর নির্ভর করে, আর স্বরবোধ নির্ভর করে স্রুগঠিত মস্তিষ্কের উপর। স্বরের ভাল মন্দ ও তারতম্য বিচার সভ্যতার উচ্চ শিখরে না উঠিলে মানুষের ভিতরও থাকে না। স্বরবোধ ও স্বরবোধ বিভিন্ন জিনিব। পক্ষীদিগের মধ্যে স্বরবোধ (অর্থাৎ একটি স্বর হইতে অপর একটি স্বরের প্রার্থক্য বোধ) নাই, স্বরবোধ ত দূরের কথা। শব্দ বা স্বর কোন কোন পক্ষী নকল করে বটে, কিন্তু একটি স্বর হইতে অপর একটি স্বরের পার্থক্য তাহারা বুঝে না। স্বরবোধ সর্বস্বপদের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু পক্ষীদিগের মধ্যে দেখা যায় না। তাহা ছাড়া মনে রাখিতে হইবে যে, পৃথিবীর দশ হাজার প্রকার পক্ষীর মধ্যে মাত্র কাকাতুয়া, ময়না প্রভৃতি কয়টা মাত্র পক্ষী শব্দ নকল করিতে পারে। ইহাদের শব্দশিক্ষা অনেকটা মুকবধির বালকদের শিক্ষার অনুরূপী হইয়া থাকে। শব্দশিক্ষকের মুখনির্গত শব্দের সহিত তাহার জিহ্বাও সমানে নড়িতে না দেখিলে পক্ষীরা সেই শব্দ নকল করিতে পারে না। তাই খাঁচা ঢাকা থাকিলে পক্ষীরা বাহিরের শব্দ নকল করে না। জিহ্বার সঞ্চালন দেখিয়াই তাহারা শব্দের নকল করিয়া থাকে।

পুংকোকিলের স্বর শুনিয়া, স্ত্রীকোকিল তাহার কাছে আসিতে পারে, কিন্তু তাহাকে পছন্দ করা বা না কক্ষা তাহার স্বরের উপর নির্ভর করে না। অনেক সময় দেখা যায় যে, একটি পুংকোকিলের কাছে আসিয়াও স্ত্রীকোকিলটা যখন অপর একটি পুংকোকিলের স্বর শুনে, তখন সে আবার তাহার কাছে উড়িয়া যায়। তবে এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পুংকোকিলের দেহকান্তি (grace and built) দেখিয়াই স্ত্রীকোকিল তাহাকে পছন্দে বরণ করে। দুইটি কোকিলের মধ্যে কাহার গলার স্বর অধিকতর মিষ্ট, তাহা উচ্চ-

শিক্ষিত মনুষ্যগণই বলিতে পারে না। তবে দুইটা কোকিলের মধ্যে কাহার দেহ অধিকতর কাস্তিযুক্ত, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। রূপবেদী পক্ষিকুলের রূপবোধ সহজেই হইয়া থাকে। গলার স্বর পক্ষীদিগের স্বরস্বরের অবস্থানস্থান বুঝাইয়া দেয় বটে; কিন্তু যৌন মিলন সব সময়েই পুংপক্ষীদিগের রূপের উপর নির্ভর করে, তাহাদের গলার স্বরের উপর নয়।

এখানেও ডারোইন সাহেব আর একটা ভুল করিয়াছেন। সেই জন্ত বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতগণ তাঁহার জননমতটা উত্তরপাশ্চাত্য যুক্তি দেখাইয়া অত সহজে খণ্ডন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না যে, পক্ষিকুল রূপবেদী জীব, শব্দবেদী নয়। অত্যাধিক বিশেষ করিয়া পুংপতঙ্গ, পুংমংস্য (মংস্যবিশেষ) ও পুংময়ূরের রূপচ্ছটার কারণস্বরূপ পণ্ডিতগণ বলেন যে, কি জ্বী বা কি পুরুষ, সমান তেজ লইয়া সকলেই জন্মগ্রহণ করে। তবে সেই তেজ জ্বীজীবগণের জননময় ধারণ, সন্তান প্রসব ও পালনাদি কার্যে ব্যয়িত হয়। পুংজীবের এই সব বালাই নাই, সেই জন্ত তাহাদের সেই অতিরিক্ত তেজ পুংময়ূরের, পুংমংস্যের ও পুংপতঙ্গের রূপচ্ছটায়, পুংহরিণের শৃঙ্গের বাহুল্যে, পুংহস্তীর দন্তে, মনুষ্যের গুণ্ণশ্মশ্রুতে ও পুংকোকিলের গলার স্বরে পর্যাবসিত হয়। তবে আমার মতে গলার স্বর সম্বন্ধে এক কথা বলা চলে না। কারণ, গলার স্বর একটা কার্যবিশেষ। অন্য দিকে বর্ণবিজ্ঞান বা শব্দ দস্তাদি জীবদিগের দেহের অংশবিশেষ। অতিরিক্ত তেজ দৈহিক বর্দ্ধনেই পর্যাবসিত হইতে পারে মাত্র। তাহা ছাড়া শব্দ করার ক্ষমতা শুধু কোকিল কেন, সকল জীবের মধ্যেই আছে। তবে মানুষের কাছে কোনটা কর্কশ, কোনটা বা মিষ্ট বলিয়া মনে হয়। কারণ, মানুষ বুদ্ধিজীবী জীব। মানুষের সঙ্গে পক্ষীর তুলনা চলে না।*

যাহা হউক, দৃষ্টবেদী জীবের মধ্যে এই যৌন বাহুল্য (secondary sexual character) পুংজীবের দেহের সাধারণ কাস্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া যৌন জননের সহায়ক হয়। কিন্তু মংস্তাদি রসবেদী ও পতঙ্গাদি গন্ধবেদী জীবের উহা কোনও কাজে আসে না।

এইবার রূপবেদী জীবের উপবিভাগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। প্রধানতঃ দুইটা উপবিভাগে রূপবেদী জীবকে মানসিক পন্থায়ে ভাগ করা যাইতে পারে। এইরূপ উপবিভাগের স্থানাঙ্ক নিম্নের শ্লোকটীতে পাওয়া যায়।

* স্বরের ভারতম্য জীবদিগের স্বরযন্ত্র বা vocal cord এর গঠন অনুসারে হইয়া থাকে। হিন্দু মনীষিগণ জীবদিগের গলার বিভিন্নরূপ স্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনার জন্ত তাঁহারা জীবমাত্রেরই স্বর লক্ষ্য করিতেন। কোন্ কোন্ জীবের গলার স্বরে কোন্ কোন্ স্বরের সৃষ্টি হয়, বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া তাহা তাঁহারা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ময়ূরঃ ষড়্ভুজমাখ্যাতি ঋষভঃ বক্তি চাতকঃ। ছাগো গাক্ষারমাচষ্টে ক্রৌঞ্চো বদতি মধ্যমঃ ॥

কোকিলঃ পঞ্চমং রুতে মেঘো বদতি ধেবতম্। নিমদঃ ভাষতে হস্তী হেতদ্রক্ষাদিসম্বতম্ ॥

ময়ূরঃ ঋষভঃ-মেষঃ-কাকঃ-কোকিলবাজিনঃ। মাতঙ্গাশ্চ ক্রমেণাঃ পরানেতান্ স্বহৃগমান্ ॥

আরোহী বৃষভো বক্তি চাবরোহী চ কেশরী। বাহারস্ত্রিধু লোকেষু আরোহী ভগবান্ শুকম্ ॥—নারদসংহিতা।

দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্ রাত্রাবন্ধাস্থতাহপরে।

কেচিদ্ দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তল্যদৃষ্টয়ঃ ॥—মার্কণ্ডেয়পুৰাণ, সপ্তশতী চণ্ডী।

এই ভাবে আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি পাখীর দিবালোক বা সাদা আলো ভিন্ন উপায় নাই। অন্ধকার বা কুম্ভালোকে তাহাদের চক্ষু নিষ্ক্রিয় থাকে। আবার পেচকাদি কতকগুলি পক্ষীর পক্ষে অন্ধকার বা কুম্ভালোকই প্রয়োজনীয়। দিবালোকে তাহাদের চক্ষু সক্রিয় হয় না। এক দল আলো চায় না, অপর দল আলো চায়। ইহা ছাড়া ইউরোপীয় পণ্ডিত Hess ও Breed* পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পক্ষী জীব একটা বর্ণ অপেক্ষা অপর একটা বর্ণ বেশী পছন্দ করে। অর্থাৎ ইহাদের বর্ণবোধ বর্তমান ৭ রাত্রিচর ও দিবাচর, উভয়বিধ পক্ষী সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য।

দেশবিদেশের আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী প্রকৃতিরাজী এক এক প্রকার বর্ণবিজ্ঞাস ধারণ করেন। ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে এই বর্ণবিজ্ঞাসের পরিবর্তন ঘটে। ফলে যে সকল পক্ষী পূর্বতন বর্ণবিজ্ঞাসের পক্ষপাতী, তাহারা এই নূতন বর্ণবিজ্ঞাস সহ্য করিতে পারে না। তখন অভীষ্ট বর্ণবিজ্ঞাসের লোভে তাহারা অপর প্রদেশে প্রস্থান করে। বসন্ত ঋতুতে যে বর্ণবিজ্ঞাস প্রকৃতিরাজী ধারণ করেন, শীতের আগমনে তাহা তিনি পরিত্যাগ করেন। কোকিল জীবগণও তৎক্ষণাৎ যে দেশে বসন্ত তখনও আছে বা নূতন আসিতেছে, এইরূপ অপর কোনও দেশের উদ্দেশে প্রস্থান করে। পক্ষাবৃত ও উষ্ণশোণিত হইয়াও পক্ষিগণ যে শীতের সহিত যুঝিতে অক্ষম, এ কথা সত্য নয়। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাইব, এক এক জাতীয় পক্ষী এক একপ্রকার বর্ণ বা বর্ণবিজ্ঞাস পছন্দ করে। রাত্রিচর পক্ষী সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যাইতে পারে। রাত্রি বর্ণসমৃদ্ধ বিকৃতরূপে প্রতীত হয় বটে, কিন্তু রাত্রিচর পক্ষীর পক্ষে উহার স্বরূপ বাছিয়া লওয়া অসম্ভব নয়। ইহা ছাড়া দিবাচর পক্ষী আলোর তারতম্য (degree of light) ও রাত্রিচর পক্ষী অন্ধকারের তারতম্য অনুযায়ীও চালিত হয়। ইহা ছাড়া রাত্রিচর ও দিবাচর পক্ষীর মধ্যে স্বভাবের বিভিন্নতার সহিত আকৃতিগত পার্থক্যও দৃষ্ট হয়। পেচক আদি রাত্রিচর পক্ষীর মুখ চেপ্টা হইয়া থাকে। রূপবোধের বিভিন্নতাই কি ইহার কারণ?

শ্রীপঞ্চানন বোষাল

* 1908. Unter Suchungen über die Ausdehnung des pupillomotorisch wirksamen Bezirkes der Netzhaut und über pupillomotorischen Aufnahmsorgane Ibid. Bd. 58, S 182.

Breed, F. S., 1911. The development of certain instincts and habits in Chicks. Behav. Monographs, Vol. 1. No. 1 Serial No. 1.

1912. Reactions of Chicks to Optical Stimuli. Jour. Animal Behav., Vol. 2. P. 280.

† (a) "Breed using coloured screens through which colour passed and offering a choice of passages differently illuminated obtained evidence of colour discrimination in the chick."

(b) For days, Hess found that the makinal effect was produced by the yellow rays, for the owls by the yellow-green.—Animal Mind.

বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের বয়স

বীরশ্রেষ্ঠ মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন কত বৎসর জীবিত ছিলেন, বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের সময়ে তাঁহার বয়স কত ছিল, সে বিষয়ে আধুনিক লেখকগণের নানা জনে নানা-প্রকার উক্তি করিয়াছেন। চিন্তামণি বিনায়ক বৈद्य মহাশয় লিখিয়াছেন,—“মহাভারতে লিখিত আছে, যুদ্ধের সময়ে অর্জুনের বয়স ৬৫ বৎসর ছিল। হরিবংশ ও অষ্টাদশ পুরাণের মতে কৃষ্ণ অর্জুন হইতে ১৮ বৎসরের বড়।”^১ শ্রীকেশবলক্ষ্মণ দত্তরী অনুমান করেন, যুদ্ধকালে অর্জুনের বয়স ৫৪ কিম্বা ৫৮ বর্ষ ছিল, তাহার বেশী নহে^২। অপর পক্ষে ডক্টর শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু মনে করেন, “যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণের বয়স ৪২ বৎসরের অধিক হইতে পারে না।...যুদ্ধকালে পরীক্ষিতপিতা অভিমুখ্যার বয়স ১৬র কম হইতে পারে না। অভিমুখ্য অপেক্ষা অর্জুন অন্ততঃ ২৫ বৎসরের বড়।...যুদ্ধকালে অর্জুনের বয়স ৪১এর কম হইতে পারে না। অর্জুন অপেক্ষা কৃষ্ণ ছয় মাসের বড়। অতএব ঠিক ৪২ বৎসর বয়সেই কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন।...আর এক দিক্ দিয়াও এই গণনা সমর্থিত হইবে। যুধিষ্ঠির অর্জুন অপেক্ষা তিন চারি বৎসরের বড়। অর্থাৎ যুদ্ধকালে যুধিষ্ঠিরের বয়স অন্ততঃ ৪৫। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির অপেক্ষা অন্ততঃ ২০ বৎসর বড় ও ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র অপেক্ষা অন্ততঃ ২০ বৎসর বড়। যুদ্ধকালে ভীষ্মের বয়স আনুমানিক ৮৫। যুধিষ্ঠিরের বয়স আরও অধিক হইলে ভীষ্মের বয়সও বেশী ধরিতে হইত। ৮৫ বয়সের পরেও যুদ্ধ করা বিশেষ সম্ভব মনে হয় না^৩।”

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করেন, ১৫০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কৃষ্ণের জন্ম এবং ১৪৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভারতযুদ্ধ হয়^৪। এই অনুমান সত্য হইলে বলিতে হয়, কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের সময়ে অর্জুনের বয়স ৫৬ বৎসর প্রায় ছিল। কেন না, অর্জুন কৃষ্ণের প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন।

‘মহাভারতে’র কোন কোন সংস্করণে দেখা যায়,^৫ মহারাজ জনমেজয়ের প্রায়ের উত্তরে মহর্ষি বৈশম্পায়ন বলেন,—

১। ‘কল্যাণ’, কৃষ্ণাঙ্ক, ৩৩১ পৃষ্ঠা। তৎপূর্বে ‘হিন্দী মহাভারত মীমাংসা’য় তিনি লিখিয়াছেন, “যুদ্ধের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ৮৩ বর্ষবয়স্ক ছিলেন এবং অর্জুনের বয়স ৬৫ বা ততোধিক ছিল।” (১৬৮ পৃষ্ঠা)। যুদ্ধের সময়ে অর্জুনের বয়স যে ৬৫ ছিল, ‘মহাভারতে’র কোথায় তাহা পাইয়াছিলেন, তিনি লেখেন নাই।

২। শ্রীকেশবলক্ষ্মণ দত্তরী, “কংসবধকালনির্ণয়,” ‘বিবিধবিজ্ঞানবিস্তার’ (নাগপুর) ৬০ বর্ষ, ২০২ পৃষ্ঠা।

৩। শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত ‘পুরাণপ্রবেশ’, ৯২ পৃষ্ঠা।

৪। ‘ভারতবর্ষ’, ২১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা।

৫। মুম্বাইস্থ নির্ঘনাসাগরযন্ত্রে মুদ্রিত এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কর্তৃক সংস্কৃত।

• ‘মহাভারতে’ এই প্রস্তোতর আছে। কিন্তু বঙ্গবাসী এবং পুণা সংস্করণে উহা নাই।

“পাণ্ডবানামিহাযুযাং শৃণু কৌরবনন্দন ।
 জগাম হাস্তিনপুরং যোড়শাকৌ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১১ ॥
 ভীমসেনঃ পঞ্চদশো বীভৎসুর্বে চতুর্দশঃ ।
 ত্রয়োদশাকৌ চ যমৌ জগ্মতুর্নাগসাহস্রম্ ॥ ১২ ॥
 তত্র ত্রয়োদশাকানি ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিতাঃ ।
 যথাসান্ জাতুষগৃহান্মুক্তা জাতো ঘটোৎকচঃ ॥ ১৩ ॥
 যথাসানেকচক্রায়াং বর্ষং পাঞ্চালকে গৃহে ।
 ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিতা পঞ্চ বর্ষাণি ভারত ! ॥ ১৪ ॥
 ইন্দ্রপ্রস্থে বসন্তস্তে ত্রীণি বর্ষাণি বিংশতিম্ ।
 দ্বাদশানানথৈকঞ্চ বভূবুর্দ্যুতিনির্জিতাঃ ॥ ১৫ ॥
 ভুক্ত্বা ষট্‌ত্রিংশতং রাজন্ ! সাগরান্তাং বহুধ্রুবাং ।
 মাসৈঃ ষড়্‌ভির্শ্বহাদ্বানঃ সর্বে কৃষ্ণপরায়ণাঃ ॥ ১৬ ॥
 রাজ্যে পরীক্ষিতং স্থাপ্য দিষ্টাং গতিমবাপু বন ।
 এবং যুধিষ্ঠিরশাসীদায়ুরষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ১৭ ॥”^৬

এই বচনমূলে মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বলেন, “কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময়ে যুধিষ্ঠির প্রভৃতির বয়স যথাক্রমে ৭২, ৭১, ৭০ ও ৬৯ বৎসর এবং কয়েক মাস ও দিন ততীত হইয়াছিল।”^৭

আচাৰ্য্য দ্রোণের উক্তি হইতে জানা যায়, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে অর্জুন “তরুণ” ছিলেন।^৮ বীরবর কর্ণও সেইরূপ বলিয়াছেন, অর্জুন তখন “যুবা”।^৯ ঐ যুদ্ধের কিঞ্চিৎ কাল পূর্বে, উত্তরগোগৃহযুদ্ধের সময়ে, বৃহন্নলাছদ্মবেশী অর্জুন “বজ্রসংহননো যুবা,” “সিংহসংহননো যুবা” বলিয়া বিরাটরাজপুত্র উত্তর বর্ণনা করিয়াছেন।^{১০} ৬৫ কিম্বা ৭০ বর্ষবয়স্ক ব্যক্তিকে ‘তরুণ’ বা ‘যুবা’ বলা যায় কি? মহাযুদ্ধকালে দ্রোণাচার্য্যের বয়স ৮৫ হইয়াছিল। ‘মহাভারতে’ অতি স্পষ্টবাক্যে তাহা উক্ত হইয়াছে। তাঁহাকে “আকর্ণ-পলিতশ্চাম...বৃদ্ধ” বলা হইয়াছে।^{১১} সুতরাং ৭০ বছরের লোককে ‘যুবা’ বলা যাইতে পারে কি?

৬। সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ, ১২০ অধ্যায়। নির্ণয়মাগর সংস্করণ, ১৩৪ অধ্যায়।

৭। শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ লিখিত “যুধিষ্ঠিরের সময়” ‘ভারতবর্ষ’, ২৪শ বর্ষ, ২য় খণ্ড (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ),

৮ পৃষ্ঠা। তৎসম্পাদিত ‘মহাভারত’র আদিপর্বের ১৭শ খণ্ডের শেষেও তিনি ঐ প্রকার উক্তি করিয়াছেন।

৮। ‘মহাভারত’ বঙ্গবাসী সংস্করণ, জ্যোতিষপর্ব, ১১২২। অতঃপর ‘মহাভারত’র উল্লেখে যেখানে কোন বিশেষ সংস্করণের নাম স্পষ্টত নিদিষ্ট হয় নাই, সেখানে এই বঙ্গবাসী সংস্করণই বুঝিতে হইবে।

৯। ঐ, জ্যোতিষপর্ব, ১৫০।১৬।

১০। ঐ, বিরাটপর্ব, ৬৯২ ও ১৯; আরও দেখুন, “বৃহদ্বারপাভো যুবা” ঐ (৩৬।১৬) “যুবা বারণ-

যুগপোপমঃ” (৭১।১৫) ইত্যাদি।

১১। আকর্ণপলিতশ্চামো বয়সশীতিপঞ্চকঃ। রণে পর্য্যচরদ্রোণো বৃদ্ধঃ যোড়শবর্ষবৎ।—জ্যোতিষপর্ব, ১৯২।৪৩

“যে যুবান আসপ্ততেঃ” এবং

“আষোড়শাদ্ভবেদালস্তরুণস্ততঃ উচ্যতে ।

বৃদ্ধঃ স্তাং সপ্ততেরুর্দ্ধং কীর্যমান্ নবতেঃ পরম্ ॥”

এই দুইটি আধুনিক স্থতিবচনের আধারে শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন, ৭০ বছরের লোককে যুবা বলা যাইতে পারে। অধিকন্তু তিনি বলেন, অর্জুন ১০৬ বছর জীবিত ছিলেন; স্মৃতির ৭০ বছর বয়সে তাঁহার যৌবন থাকার সম্ভব।^{১২} কিন্তু তাঁহার এই যুক্তি সমীচীন কি না বিবেচ্য। ঐ হিসাব মতে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ১+৫+২৩+১৩ অর্থাৎ ৪২ বৎসর পরে মহাযুদ্ধ বাধে, যুদ্ধকালে দ্রোণাচার্য্যের বয়স ৮৫ ছিল। স্মৃতির ৭০ বছরের সময় তাঁহার বয়স ৪৩ ছিল। অতএব উক্ত স্থতিবচন অনুসারে, তখন তাঁহাকে যুবা বলিতে হয়। কিন্তু তাহার কিক্কাংকাল পরে—বৎসরের অধিক নহে—বিদুর দ্বারাষ্ট্রের নিকট তাঁহাকে “বৃদ্ধ” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।^{১৩}

পূর্বোক্ত ‘মহাভারত’-বচনে অপর একটিও আছে। তন্মতে পাণ্ডবেরা জতুগৃহে ৬ মাস ছিলেন। অতঃ পরে আছে, তাঁহারা সেখানে “পরিসংবৎসর” ছিলেন।^{১৪} উহার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার্থ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় টীকা করিলেন, “পরিশব্দোহত্র বর্জনার্থঃ...তেন যথা-সাবস্থিতানিত্যর্থঃ।” ইহা কষ্টকল্পনা মাত্র। ‘পরি’ যদি ঐ স্থলে বর্জনার্থই হয়, তবে কি বর্জন করিতে হইবে? ‘সংবৎসর’ শব্দের সঙ্গে যুক্ত থাকায় উহাকেই বর্জন করিতে হয়। কিন্তু তাহা ত হইতে পারে না। ছয় মাস যে বাদ দিতে হইবে, তাহা তিনি কোথায় পাইলেন?

আরও বিশেষ কথা। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা সকলে এক এক বৎসরের বড় ছোট ছিলেন না।^{১৫} অর্জুন, ভীম অপেক্ষা অন্ততঃ দুই বৎসরের ছোট ছিলেন। তাহা অনায়াসে প্রমাণ করা যায়। ‘মহাভারতে’ স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে যে, ভীম ও দুর্ধোদন

আকর্ণপলিতস্ত্রামো বয়সানীতিপঞ্চকঃ। তৎকৃতে ব্যচরং সংখ্যে সতু ষোড়শবর্ষবৎ ॥—ঐ, ১২১।৬৪

আরও দেখুন—আচার্য্যস্ব বৃদ্ধস্ত—ঐ, ১২৫।৪৯

১২। তৎসংস্কৃত মহাভারত, বিরাট পর্ব, ৪২।৫-৭ শ্লোকের তৎকৃত টীকা।

১৩। ভীম ও দ্রোণকে লক্ষ্য করিয়া বিদুর বলিয়াছিলেন,—

“ইমৌ হি বৃদ্ধৌ বয়সা প্রজয়া চ শ্রভেন চ”—আদি পর্ব, ২০।৫৫

১৪। আদিপর্ব, ১৪৮।১।

১৫। মহাভারতে আছে,—

“অনুসংবৎসরং জাতা অপি তে কুরুসন্তমাঃ।

পাণ্ডুপুত্র্য বারাজন্ত পঞ্চ সংবৎসরা ইব ॥”—আদিপর্ব, ১২৪।১২

ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন, পাণ্ডবেরা সকলে এক এক বৎসরের বড় ছোট ছিলেন। কিন্তু উহার প্রকৃত তাৎপৰ্য্য এই যে, এক এক বছর বয়সে পাণ্ডবদিগকে পাঁচ পাঁচ বছরের সন্তান দেখাইত। টীকাকার নীলকণ্ঠ উভয় প্রকারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম ব্যাখ্যা যে সঙ্গত নহে, তাহা পরে প্রমাণিত হইবে।

একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।^{১৬} যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের অপেক্ষা বৎসরাধিক বড় ছিলেন। কেন না, গান্ধারীর গর্ভ হওয়ার এক বছর পরে কুন্তী “গর্ভার্থে” ধর্ম্মরাজকে আহ্বান করেন।^{১৭} দুই বৎসর পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণ সত্ত্বেও গান্ধারীর কোন সন্তান উৎপন্ন হয় নাই। তার পর কুন্তীর পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া মনোদুঃখে কর্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গান্ধারী আপন গর্ভ শাত করেন। তাহার এক বৎসর পরে, পরমমি ব্যাসের তপঃপ্রভাবে, ঐ মাংসপিণ্ড হইতে প্রথমে দুর্য্যোধনের জন্ম হয়।^{১৮} এই উপাখ্যান অলৌকিক হইলেও ‘মহাভারতে’ বিবৃত আছে। উহার সহজ মর্ম্ম এই লওয়া যাইতে পারে যে, ভীম যুধিষ্ঠির হইতে বৎসরাধিক ছোট। ভীমের জন্মের পর পাণ্ডুর আদেশে কুন্তী একবৎসরব্যাপী এক মাঙ্গলিক ব্রত অনুষ্ঠান করেন। পাণ্ডু নিজেও কঠোর তপস্যা করেন। দীর্ঘকাল পরে (‘কালেন মহতা’) তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র যথাভিলষিত সর্বগুণসম্পন্ন পুত্র বর দেন। তৎপরে কুন্তী গর্ভার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করেন।^{১৯} স্বতরাং উহার বৎসরের পরে অর্জুনের জন্ম হয়। এইরূপে দেখা যায়, অর্জুন ভীম অপেক্ষা অন্ততঃ দুই বৎসরের ছোট। ‘দীর্ঘকাল’ যদি ২১ বছর হয়, তবে ৩৪ বছরের ছোট। অথচ ঐ হিসাব মতে, অর্জুন ভীম হইতে এক বছরের ছোট।

গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধন নিহত হইলে, পুত্রশোকে বিলাপ করিতে করিতে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন,—

“বালভাবমতিক্রান্তানু যৌবনস্থান্শচ তানহম্।

মধ্যপ্রাপ্তান্তুথা শ্রদ্ধা হৃষ্ট আসনু তদানঘ ॥

তানন্ত নিহতানু শ্রদ্ধা হতৈশ্বর্য্যানু হতোজসঃ ॥”^{২০}

‘হে অনঘ, তাহারা বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনাবস্থায়, তথা (যৌবনাবস্থা অতিক্রম করিয়া) প্রৌঢ়াবস্থায় পড়িয়াছে শুনিয়া তখন আমি আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আজ তাহাদিগকে হতৈশ্বর্য্য, হতবীৰ্য্য ও নিহত শ্রবণ করিয়া’ ইত্যাদি। ‘মধ্যপ্রাপ্ত’ অর্থ, নীলকণ্ঠ বলেন, “প্রৌঢ়াবস্থায় পতিত”। মানুষের পূর্ব্ণ আয়ু শত বৎসর। স্বতরাং মধ্য বয়স ৫০ বৎসর। পঞ্চাশের পরেই মধ্যাবস্থা আরম্ভ। অতএব ঐ ধৃতরাষ্ট্রবাক্য হইতে বোঝা যায়, মৃত্যুসময়ে দুর্য্যোধন সবে ৫০ বৎসর পার হইয়াছিলেন মাত্র। যদি তাহার বয়স মোট ৫১ ধরা যায়—তদপেক্ষা বেশী অধিক হইতে পারে না,^{২১}—যুদ্ধকালে অর্জুনের বয়স ৪৮।৪৯ বৎসর হয়।

১৬। আদিপর্ব্ব, ১১৫।২৬; ১২৩।১৯।

১৭। আদিপর্ব্ব, ১২৩।১।

১৮। আদিপর্ব্ব, ১১৫।১৯।

১৯। আদিপর্ব্ব, ১২৩।২৫।

২০। শল্যপর্ব্ব, ২।৭।

২১। কেন না, ঐ বিলাপ প্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে “বজ্রসংহননো যুবা” বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছিলেন। (সৌপ্তিকপর্ব্ব, ১।৭)। তাহাতে অনুমান হয়, দুর্য্যোধন মৃত্যুসময়ে সবে মাত্র যৌবনাবস্থা অতিক্রম করিয়া মধ্যাবস্থা পড়িয়াছিলেন। অন্তথা ধৃতরাষ্ট্রের এই উক্তিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। বাল্য, যৌবন, মধ্য এবং জর্য বা বৃদ্ধ, মানুষের এই চারি অবস্থার গণনা ‘মহাভারতে’র একাধিক স্থলে পাওয়া যায়। যথা, সৌপ্তিকপর্ব্ব, ৩।১১, স্ত্রীপর্ব্ব, ৩।১৫।

উপরে প্রদর্শিত কারণে পাণ্ডবগণের বয়সবিষয়ক পূর্বোক্তত শ্লোকসমূহের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ হয়। সেই হেতু আমরা স্বতন্ত্রভাবে বীরবর অর্জুনের বয়স নিরূপণ করিতে প্রয়াস করিব। তৎপূর্বে আর একটা বিষয়ে প্রণিধান করিতে বলি।

কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও ভীম অপেক্ষা বয়সে ছোট এবং নকুল ও সহদেব অপেক্ষা বড়। সেই হেতু তিনি যুধিষ্ঠির ও ভীমকে প্রণাম করিতেন; তাঁহাদের পাদস্পর্শ করিতেন। নকুল ও সহদেব তাঁহাকে প্রণাম করিতেন।^{২২} অর্জুনের সখা হিসাবেই যে তিনি এরূপ করিতেন, তাঁহার গুরুজনকে গুরুবৎ মাগ্ন করিতেন, তাহা নহে। কৃষ্ণ সত্যই অর্জুনের সমবয়স্ক ছিলেন। এমন কি, তাঁহার বড় ভাই বলরামও যুধিষ্ঠিরের পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিতেন।^{২৩} যুধিষ্ঠির অর্জুন হইতে ৩৪ বছরের বেশী বড় নহে। স্মরণ্য বৈষ্ণব মহাশয় যে মনে করেন, কৃষ্ণ অর্জুন হইতে ১৮ বৎসর বড়, ‘মহাভারত’ের মতে উহা সত্য নহে। কেন না, তাহাতে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির হইতে বড় হন। আরও দেখুন, মহাযুদ্ধকালে কৃষ্ণও অর্জুনের হায়ে “তরুণ” ছিলেন।^{২৪} ৮৫ বৎসরের দ্রোণাচার্য্য যদি “বৃদ্ধ” হন, ৮৩ বৎসরবয়স্ক কৃষ্ণ “তরুণ” হইতে পারেন না।

কুরুক্ষেত্রমহাসমরের প্রাক্কালে পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীরগণের শৌর্য্য বীৰ্য্য আলোচনা-প্রসঙ্গে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র অর্জুন সম্বন্ধে সঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন,—

“একান্তবিজয়শ্চৈব শ্রয়তে ফাল্গুনস্য চ।

ত্রয়স্বিংশংসমাহুয় খাণ্ডবেহগ্নিমতর্পর্যং ॥”^{২৫} ইত্যাদি।

‘কিন্তু ফাল্গুনীর কেবল বিজয়েরই কথা শুনা যায়। ত্রয়স্বিংশবর্ষবয়স্ক (ফাল্গুনী) খাণ্ডবারণ্যে অগ্নিকে আহুতি দিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন।’ এখানে ত্রয়স্বিংশংসমাঃ + আহুয় = ত্রয়স্বিংশংসমাহুয়, এই সন্ধি আর্ষ প্রয়োগ। টীকাকার নীলকণ্ঠ তাহাই বলিয়াছেন।

কেহ কেহ উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধের অগ্র প্রকার ব্যাখ্যা করেন। যথা, “তিনি খাণ্ডবারণ্যে ত্রয়স্বিংশং বৎসর হতাশনের তৃপ্তিসাধন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।” কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় এই প্রকারে উহার ভাষান্তর করিয়াছেন।^{২৬} নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যার মর্ম্ম দুর্বোধ্য। তিনি লিখিয়াছেন, “ত্রয়স্বিংশং সমাঃ বর্ষাণি অতীতা ইত্যর্থঃ।” উহাকে তিন ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে;—(১) তেত্রিশ বৎসর অতীত হইলে ফাল্গুনী খাণ্ডবারণ্যে অগ্নিকে আহুতি দিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন; (২) ‘ফাল্গুনী খাণ্ডবারণ্যে তেত্রিশ বৎসর ধরিয়া অগ্নিকে আহুতি দিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন; অথবা (৩) ‘তেত্রিশ বৎসর অতীত হইল, ফাল্গুনী

২২। বনপর্ব, ২২।৪৫; আরও দেখুন, আদিপর্ব, ২২।১৪০; সভাপর্ব, ২।২১ ইত্যাদি।

২৩। আদিপর্ব, ১৯।১২০।

২৪। মহাযুদ্ধের উদ্যোগের সময়ে সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্রকে কৃষ্ণাৰ্জুন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—“ছামৌ বৃহস্তৌ তরুণৌ” ইত্যাদি। (উদ্যোগপর্ব, ৫৯।১০।)

২৫। ‘মহাভারত’, বঙ্গবাসী সংস্করণ, উদ্যোগপর্ব, ৫২।১০; সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ ৫২।২।

২৬। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুদিত ‘মহাভারত’, হিতবাদী সংস্করণ, ১৩১০ বঙ্গাব্দ, ৫১ম অধ্যায়, ৪৭০ পৃষ্ঠা।

থাণ্ডবারণ্যে অগ্নিকে আহুতি দিয়া তৃপ্ত করিয়াছিলেন।^{১৭} এই তৃতীয় ব্যাখ্যাই নীলকণ্ঠের অভিপ্রেত মনে হয়। বৈষ্ণব মহাশয়ও তাহাই বুঝিয়াছিলেন।^{১৮}

‘মহাভারতে’ অতি স্পষ্ট বাক্যে বিবৃত হইয়াছে যে; থাণ্ডববনদাহ পনের দিন ধরিয়া হইয়াছিল।

“তদ্বনং প্লাবকো ধীমন্ দিনানি দশ পঞ্চ চ।

দদাহ কৃষ্ণপার্থাভ্যাং রক্ষিতঃ পাকশাসনাং ॥২৮

• ‘হে ধীমান্, কৃষ্ণ এবং পার্থকর্তৃক ইন্দ্র হইতে পরিরক্ষিত হইয়া অগ্নি পঞ্চদশ দিনে সেই বন দগ্ধ করিয়াছিল।’ সুতরাং থাণ্ডববনদাহে হতাশনের তেত্রিশ বৎসর লাগিয়াছিল, এ কথা সত্য নহে। যে সময়ে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে ঐ উক্তি করিয়াছিলেন, সে সময়ের—কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের উদ্যোগকালের—তেত্রিশ বৎসর পূর্বে থাণ্ডবদাহ হইয়াছিল, এ ব্যাখ্যাও সমীচীন নহে। কিঞ্চিৎ পরে তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইবে। ঐ সকল কারণে আমরা প্রথম ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে পাণ্ডা যায়, থাণ্ডবারণ্যদাহের সময়ে মহাবীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের বয়স ৩৩ বৎসর হইয়াছিল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় “ত্রয়স্বিংশৎসমাহুয়” বাক্যের ভিন্নার্থ করিয়াছেন।^{২৯} নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যাকে তিনি “হেয়” বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। তন্মতে, ‘ত্রয়স্বিংশৎ’=তেত্রিশ দেবতা, ‘সমাহুয়’=আহ্বান করিয়া। তেত্রিশ দেবতা বুঝাইতে তেত্রিশ সংখ্যার প্রয়োগ অসঙ্গত নহে। কিন্তু উহার দৃষ্টান্ত ‘মহাভারতে’র অপর কোত্রাপি পাই নাই। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে থাণ্ডববন দাহের সময়ে অর্জুনের বয়স ৫৫ বৎসর ছিল।

থাণ্ডববনদাহের প্রাক্কালে অগ্নির প্রার্থনায় বরুণ অর্জুনকে স্বদ্বিবা গাণ্ডীব ধনু, তথা অক্ষয় তুণীরদ্বয় এবং কপিধ্বজ রথ প্রদান করেন।^{৩০} তদবধি গাণ্ডীব ধনু বরাবর তাঁহারই নিকটে ছিল। মহাপ্রস্থানের পরই উহা অগ্নিকে প্রত্যর্পিত হইয়াছিল।^{৩১} উত্তরগোগৃহের যুদ্ধের প্রারম্ভে বৃহন্নলাছদ্মবেশী অর্জুন বিরাটরাজপুত্র উত্তরের নিকট গাণ্ডীব ধনুর পুরাতন কাহিনী বিবৃত করেন।

“এতদ্বর্ষসহস্রন্ত ব্রহ্মা পূর্বমধারয়ৎ।

ততোহনন্তরমেবাথ প্রজাপতিরধারয়ৎ ॥

২৭। ‘হিন্দী মহাভারত সীমাংসা’।

২৮। ‘মহাভারত’, আদিপর্ব, ২২।৪৬; আরও দেখুন, ২৩৪।১২। এই বিষয়ে লেখকের “মহাভারতে স্থানীয়মানভব” নামক প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য। (‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৬১-২ পৃষ্ঠা)।

২৯। তিনি লিখিয়াছেন, “ত্রয়স্বিংশদিতি বিভক্তিলোপ আৰ্হঃ। দ্বাদশাদিত্যাঃ, একাদশ রজাঃ, অষ্টৌ বসবঃ, ধাতা, ইন্দ্রেতি ত্রয়স্বিংশতঃ স্মরান্ থাণ্ডবে সমাহুয়” ইত্যাদি।

৩০। ‘মহাভারত’ আদিপর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২২৫।৪; সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ; ২১৮।৬।

৩১। ঐ, মহাপ্রস্থানিকপর্ব, ১।৩৪।

ত্রীণি পঞ্চশতকৈব শক্ৰোহশীতিক পঞ্চ বৈ ।

সোমঃ পঞ্চশতং রাজা তথৈব বরুণঃ শতম্ ॥

পার্থঃ পঞ্চ চ যষ্টিঞ্চ বর্ষাণি শ্বেতবাহনঃ ॥” ৩২

‘প্রথমে ব্রহ্মা উহা (গাণ্ডীব ধনু) সহস্র বর্ষ ধারণ করিয়াছিলেন । তদনন্তর প্রজাপতি ৫০৩ বর্ষ, ইন্দ্র ৮৫ বর্ষ, চন্দ্র ৫০০ বর্ষ, ৩৩ রাজা বরুণ ১০০ বর্ষ এবং শ্বেতবাহন অর্জুন ৬৫ (?) বর্ষ উহা পর পর ধারণ করিয়াছিলেন ।’

টীকাকার নীলকণ্ঠ মনে করেন যে, এইখানে ব্রহ্মাদির বেলায় “বর্ষ” শব্দে ‘দৈব বর্ষ’ বুঝিতে হইবে । হিন্দু জ্যোতিষের মতে, মানুষের এক সৌর সংবৎসরে দেবতাদিগের এক দিন; ৩৬০ সৌর সংবৎসরে এক দৈব বর্ষ । সুতরাং ব্রহ্মাদির বেলায় মূলের বর্ষ শব্দ ৩৬০ সৌর সংবৎসরাত্মক । কিন্তু পার্থের বেলায় “বর্ষ” শব্দ “বৃষ্টিপর,” সুতরাং ‘অর্দ্ধসংবৎসরাত্মক’ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । ৩৪ বর্ষ শব্দ বৃষ্টিপর হইতে পারে । ‘আখ্যায়ন ক্রতি’, ‘অমরকোষ’ এবং ‘মেদিনীকোষ’ের প্রমাণ সাহায্যে নীলকণ্ঠ তাহা নিশ্চিতরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন । এইরূপে তাহার মতে, উত্তরগোগৃহ-যুদ্ধের পূর্বে ৩২২ বৎসর যাবৎ গাণ্ডীব ধনু অর্জুনের নিকট ছিল ।

নীলকণ্ঠ এ বিষয়ে জনৈক প্রাচীন টীকাকারের ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন । তন্মতে গাণ্ডীব ধনু অর্জুনের নিকট প্রকৃত পক্ষে ৬৫ সংবৎসর ছিল । কিন্তু ঐ কালের সমস্তটাই উত্তরগোগৃহযুদ্ধের পূর্ববর্তী নহে । কতকটা পরবর্তীও । এই অতীত এবং অনাগত উভয় কাল একত্রে লইয়া মোট ৬৫ সংবৎসর পার্থ গাণ্ডীব ধনু ধারণ করিয়াছিলেন । “পার্থঃ পঞ্চ চ যষ্টিঞ্চ” ইত্যাদি বাক্যে বৃহন্নলা তাহাই উত্তরকে বিবৃত করিয়াছিলেন । ইহাই ঐ প্রাচীন টীকাকারের অভিमत ।

নীলকণ্ঠ ঐ প্রাচীন ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়াছেন । তিনি বলেন, উহা সত্য হইলে, মূলে “অধারয়ং” (‘ধারণ করিয়াছিল’) এই অতীত কাল প্রয়োগের কোন সার্থক্য থাকে না । দ্বিতীয়তঃ বৃহন্নলা (অর্জুন) পার্থের আয়ুষ্কাল জানিতেন, এ কথা কল্পনা করিয়া লইলেও ঐ প্রাচীন ব্যাখ্যাতা কি প্রকারে তাহা অবগত হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই । কার্যতঃ তাহা প্রতিপাদন করাও যায় না । সুতরাং নীলকণ্ঠ বলেন, তাহার ব্যাখ্যা সমাদরযোগ্য কি না বিচার্য্য । অপর পক্ষে তিনি বলেন, তৎকৃত ব্যাখ্যা—

৩২ । ঐ, বিরাট পর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৪৩৫-৬ ; সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ, ৩৯৫—৬২ ।

৩৩ । ‘যটশতং’ = ১০৬, এই প্রকার বৈদিক প্রয়োগও ‘মহাভারতে’ পাওয়া যায় । (বিরাট পর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২৩৩৩) । সুতরাং “পঞ্চশতং” শব্দে ১০৫ বুঝাইতে পারে । এই অর্থ গ্রহণ করিলে পাওয়া যায়, প্রজাপতি ১০৮ এবং সোম ১০৫ বৎসর গাণ্ডীবধনু ধারণ করিয়াছিলেন ।

৩৪ । “অত্র ব্রহ্মাদীনং বর্ষাণি দেবমানেনৈব জ্ঞেয়ানি, যো হুস্মাকং সৌরঃ সংবৎসরঃ, স তেবামেকং দিনমিতি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধম্ । পার্থঃ পঞ্চ চ যষ্টিং চেত্যত্র তু বর্ষশকো বৃষ্টিপরঃ তথা চ সংবৎসরে বর্ষদ্বয়ং জায়তে ।”— (নীলকণ্ঠ) ।

যায়ী ৩২ই বৎসরের হিসাব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১৩ বৎসর দ্যুতক্রীড়ায় পরাজয় হেতু বনবাসে ও অজ্ঞাতবাসে এবং ১২ বৎসর দ্রৌপদীবিশয়ক ব্রতভঙ্গাপরাধজনিত, বনবাসে ব্যতীত হইয়াছিল। বাকী ৭ই বৎসর দিগ্বিজয়, রাজস্বয় যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতিতে কাটিয়াছিল।

যাহা হউক, “পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ বর্ষাণি” বাক্যের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া নীলকণ্ঠ “ত্রয়স্তিংশংসমাহুয়” বাক্যের তুদগৃহীত ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উভয় বাক্যেরই তৎকৃত ব্যাখ্যার সার মর্ম্ম এই, যুদ্ধোদ্যোগের ৩০ বৎসর পূর্বে খাণ্ডবদাহ হইয়াছিল। এই সামঞ্জস্য দেখিয়াই বৈদ্য মহাশয় নীলকণ্ঠের অহুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু নীলকণ্ঠের অহুমান বিচারসহ নহে। আমরা ক্রমে তাহা দেখাইব।

একই বাক্যের প্রথম পাঁচ স্থলে ‘বর্ষ’ শব্দ একার্থক, শেষ এক স্থলে ভিন্নার্থক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে কেন, তাহার কোন যুক্তি নীলকণ্ঠ দেন নাই। যে হিসাব মিলাইবার অভিপ্রায়ে তিনি ঐ প্রকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার লেখা হইতে বোধ হয়, সে হিসাব ভুল। দ্রৌপদী বিষয়ে পঞ্চ পাণ্ডবেরা নিজেদের মধ্যে যে নিয়ম নির্ধারণ করিয়াছিলেন, দৈবক্রমে মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনকে উহা ভঙ্গ করিতে হয়। সেই অপরাধে তাঁহাকে ১২ বৎসর বনবাস করিতে হইয়াছিল। খাণ্ডবদাহের, স্মরণ্য গাণ্ডীব ধনু লাভের পূর্বেই ঐ ঘটনা ঘটে; পরে নহে। অতএব নীলকণ্ঠের প্রদত্ত হিসাব গ্রাহ্য নহে। স্মরণ্য প্রাচীন ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে নীলকণ্ঠ-কৃত দ্বিতীয় শঙ্কা তাঁহার বিরুদ্ধেও করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, এই বিষয়ে নীলকণ্ঠের মত এবং তদুল্লিখিত প্রাচীন মত, উভয়ই ভ্রান্ত। কেন না, উত্তরগোগৃহযুদ্ধের পূর্বে গাণ্ডীব ধনু অর্জুনের নিবর্ত ১৫ বৎসরের বেশী থাকিতে পারে না। এবং তৎপরে তিনি ৩৬ বৎসর উহা ধারণ করিয়াছিলেন। তাহা প্রমাণ করা যায়। যথা—

(ক) খাণ্ডববনদাহের পূর্বে অর্জুন স্মভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুত পক্ষে দ্রৌপদীবিশয়ক ব্রতভঙ্গাপরাধজনিত বনবাসকালের শেষ ভাগে অর্জুন দ্বারকায় গিয়া স্মভদ্রাকে হরণ করত বিবাহ করেন। বিবাহের পর অর্জুন কিছু কাল দ্বারকাতে এবং কিছু কাল পুষ্করে বাস করেন। তৎপরে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্তন করেন।^{৩৫} ঐ সময়ে স্মভদ্রা বরাবর তাঁহার সঙ্গেরই ছিলেন। কেন না, বাড়ী ফিরিয়া তিনি যখন মাতা কুন্তী ও পত্নী দ্রৌপদীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখনও “লাল চেলী পরা” স্মভদ্রা তাঁহার পার্শ্বে ছিলেন, দেখা যায়।^{৩৬} অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়াছেন শুনিয়া দ্বারকা হইতে বলরাম ও কৃষ্ণ, বৃষ্ণি ও ঋকবংশীয় বীরগণ এবং অগ্ন্যাত্ম লোকজন সমভিব্যাহারে নানাবিধ যৌতুক লইয়া তথায় আগমন করেন। “বহুদিন” আনন্দে ও উল্লাসে ব্যতীত করিয়া, বলরাম অপরাপর সকলকে লইয়া দ্বারকা যাত্রা করেন। কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রিয়থমা অর্জুনের

৩৫। ‘মহাভারত,’ আদিপর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২২১।১৩। সিদ্ধান্তবাসীশ সংস্করণ, ২১৪ অধ্যায়।

৩৬। ঐ, আদিপর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২২১।১৯।

নিকট থাকিয়া যান। তাঁহারা কখন কখন যমুনা নদীর তীরে মৃগয়া করিতে যাইতেন। অতি আশ্চর্য্য আফ্রাদের মধ্যে তাঁহাদের দিন কাটিতেছিল। ঐ সময়ে বীর বালক অভিমত্ন্যর জন্ম হয়।^{৩৭} তাহার কিছু দিন পরে গ্রীষ্মকালসমাগমে কৃষ্ণ ও অর্জুন, শ্রদ্ধদর্বাগাদি সহ প্রতিদিন যমুনায় জলবিহার করিতে যাইতেন।

“ততঃ কতিপয়াহস্য বীভৎসুঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ।

উষ্ণমনি কৃষ্ণ বর্তন্তে গচ্ছাবো যমুনাং প্রতি ॥” ইত্যাদি।^{৩৮}

তথায় এক দিন একান্তে অগ্নি তাঁহাদের নিকটে সমুপস্থিত হইয়া খাণ্ডববনদাহে সাহায্য প্রার্থনা করেন। অনন্তর কৃষ্ণার্জুনের সাহায্যে উহা প্রকৃতই সম্পাদিত হয়। এইরূপে দেখা যায়, খাণ্ডবারণ্যদাহের কিয়ৎকাল পূর্বে অভিমত্ন্যর জন্ম হয়।^{৩৯} ঐ সময়টা উর্দ্ধতম পক্ষে কত হইতে পারে, তাহাও একপ্রকার অল্পমান করা যায়। উহা আট মাসের বেশী হইতে পারে না। কেন না, বর্ষাকালে মৃগয়া সম্ভব নহে। হস্তরাং কৃষ্ণার্জুন বর্ষান্তে যমুনা নদীর তীরে মৃগয়ায় যাইতেন; তৎপূর্বে নহে ধরা যায়। বর্ষান্ত হইতে গ্রীষ্মসমাগম আট মাস মাত্র। অথবা বর্ষাকালে মৃগয়া করিতেন ধরিলে, ঐ সময়ের পরিমাণ ৯ কি ১০ মাস হয়। খাণ্ডবদাহের ঠিক আট, কি দশ মাস পূর্বে অভিমত্ন্যর জন্ম হইয়াছিল, এ কথা আমরা বলিতেছি না। যখন কুরুক্ষেত্র-মহাসমর হয়, তখন বীর বালক অভিমত্ন্য ১৬ বৎসরে পড়িয়াছে।

“তস্যাং ভবিতা পুত্রো বালো ভুবি মহারথঃ।

ততঃ ষোড়শবর্ষাণি স্থাস্যত্যমরসত্তমাঃ ॥

অস্য ষোড়শবর্ষস্য স সংগ্রামো ভবিষ্যতি ॥”^{৪০}

‘ইনি তাঁহারই (অর্জুনেরই) পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। বাল্যকালেই তিনি মহারথ বলিয়া জগতে প্রখ্যাত হইবেন। হে দেবগণ! তিনি ষোল বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন। তিনি ষোল বৎসরে পড়িলে সেই যুদ্ধ (কুরুক্ষেত্র-মহাসমর) হইবে।’ উত্তরগোপ্ত্রযুদ্ধের কয়েক মাস পরেই মহাসমর আরম্ভ হয়। পূর্বোক্ত যুদ্ধের অব্যবহিত পরে অভিমত্ন্যর সহিত উত্তরার পরিণয় হয়। বিবাহের পর সপ্তম মাসে অভিমত্ন্য নিহত হন। উত্তরা বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—

“এতাবানিহ সংবাসো বিহিতস্তে ময়া সহ।

যস্মান্ সপ্তমে মাসি ত্বং বীর নিধনং গতঃ ॥”^{৪১}

৩৭। ঐ, ২২১। ৬৫-৬।

৩৮। ঐ, ২২২। ১৪।

৩৯। কৃষ্ণার্জুনের জলবিহারে শ্রদ্ধদর্বাও যোগ দিতেন। (আদিপর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২২২। ২৩, সিদ্ধান্ত-বাগীশ সংস্করণ, ২১৫। ২৬), দ্রৌপদীবিষয়ক ব্রতভঙ্গের নিমিত্ত অর্জুনের বনবাসকালের শেষ ভাগে অর্জুন শ্রদ্ধদর্বার পাণিগ্রহণ করেন। হস্তরাং ঐ বনবাস খাণ্ডবদাহের পূর্বেই ঘটয়াছিল। তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। নীলকণ্ঠ অশ্বথী বলিয়া তুল করিয়াছেন।

৪০। ‘মহাভারত,’ আদিপর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৬৭। ১১৭। সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ, ৬২। ১১৮।

৪১। ঐ, জ্ঞীপর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২০। ২৮।

সুতরাং উত্তরগোগৃহযুদ্ধের ছয় মাস পরে মহাসমর হয়। অতএব খাণ্ডববনদাহের হইতে উত্তরগোগৃহযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত পনের বৎসরের অধিক হইতে পারে না।

(৫) খাণ্ডববনদাহের অবসানে সুপ্রসিদ্ধ দানব শিল্পী ময়, কৃষ্ণকর্তৃক মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এক অপূর্ব সুন্দর সভা নির্মাণ করিতে আদিষ্ট হন। তিনি সানন্দচিত্তে উহাতে হন। চৌদ্দ মাসে (“মাসৈঃ পারিচতুর্দশৈঃ”)^{৪২} তিনি ঐ মহৎ কার্য শেষ করেন। জ যুধিষ্ঠির ঐ সভায় প্রবেশ করিবার পর দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে রাজস্বয় মহাযজ্ঞ ন করিতে বলেন। পরমর্ষি দ্বৈপায়ন এবং কৃষ্ণ ঐ প্রস্তাবের সমর্থন করেন। তখন ঐ যজ্ঞ করিতে মনস্থ করেন। উহা সম্পন্ন করিতে কত সময় লাগিয়াছিল, তাহা বৃত হয় নাই। জরাসন্ধবধ, দিগ্বিজয় ও যজ্ঞক্রিয়া, সমস্ত ব্যাপারগুলিতে মোটামুটি মরেক কাল লাগিয়াছিল ধরিলে বেশী হয় না, বরং অতি কমই হয়। ঐ যজ্ঞের পর বৎসরাধিক পরে উত্তরগোগৃহের যুদ্ধ হয়। এই প্রকারেও পাওয়া যায় যে, খাণ্ডবারণ্য হর পনের বৎসর পরে ঐ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটা শঙ্কা করা যাইতে পারে। ‘মহাভারতে’ বিবৃত আছে যে, রাজস্বয় মহাযজ্ঞান্তে অভিমন্যু দ্রৌপদীর পুত্রগণের সহিত পার্বত্য রাজা-গকে পৌছাইতে গিয়াছিলেন।

“দ্রৌপদেয়াঃ সসৌভদ্রাঃ পার্বতীয়ান্ মহীপতীন্ ॥

অশ্বগচ্ছৎ.....”^{৪৩}

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত মতে ঐ সময়ে অভিমন্যুর বয়স আড়াই বৎসরের বেশী হইতে পারে না। আড়াই বৎসরের শিশুর পক্ষে রাজাদিগকে পৌছাইতে যাওয়া সম্ভব কি? ঐ সময়ে অভিমন্যু বড় হইয়াছিল অনুমান করিলে একটা সামঞ্জস্য হইতে পারে বটে। মৃত্যুসময়ে অভিমন্যু ষোল বৎসরে পড়িয়াছিল, এই বচনের সঙ্গে ঐ অনুমানের বিরোধ হয়। যুদ্ধকালে দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও অভিমন্যু যে অপ্রাপ্তবর্ষাবন শিশু বা “বালক”মাত্র ছিল, তাহার বহু প্রমাণ ‘মহাভারতে’ পাওয়া যায়।^{৪৪}

শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মনে করেন, “পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ বর্ষাণি”=পঞ্চানি বর্ষাণি চ ষষ্টিং বর্ষাণি চ। প্রথম ‘বর্ষ’ শব্দের অর্থ ‘সংবৎসর’; দ্বিতীয় ‘বর্ষ’ শব্দের অর্থ ‘ঋতু’। বৎসরে ছয় ঋতু। সুতরাং ৬০ ঋতুতে ১০ বৎসর। সুতরাং এইরূপে পাওয়া যায়, অর্জুন পনের বৎসর গাণ্ডীব ধারণ করিয়াছিলেন।

‘বর্ষ’ শব্দ যে ছয় মাসাত্মক হইতে পারে, তাহার প্রমাণ নীলকণ্ঠ উপস্থিত করিয়া-লেন। কিন্তু ‘ঋতু’ অর্থে যে উহা প্রযুক্ত হইত, তাহার কোন প্রমাণ সিদ্ধান্তবাগীশ হাশয় দেন নাই। তিনি মনে করেন যে, ঐ প্রকার উভয়পর অর্থই মহাভারতকারের ভিপ্রোত ছিল। “পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ” এই দ্বিপদ প্রয়োগ হইতেই তাহা বুঝা যায়। অতথা,

৪২। ঐ, সভাপর্ব, ৩৩৭।

৪৩। সভাপর্ব, ৪৫।৪২।

৪৪। আদিপর্ব, ১।১৯১; উদ্যোগপর্ব, ৪৮।২৭, ৩৩; ৫০।৪২। দ্রৌপদপর্ব, ৪৮।৩২, ৩২।২১-৩।

তিনি ‘পঞ্চযষ্টিক’ বলিতেন। এই যুক্তি একেবারেই নিঃসার। ঐ বাক্যের পূর্বেই ৮৫ বরাহ্মিতে মহাভারতকার ‘পঞ্চাশীতি’ না বলিয়া “অশীতিক পঞ্চ চ” বলিয়া ছন্দের খাতিরেই তাঁহাকে পদভাগ করিতে হইয়াছে।

আমাদের মনে হয়, “পার্থঃ পঞ্চ চ যষ্টিক বর্ষাণি শ্বেতবাহনঃ” উক্ত শ্লোকের শেষাংশ এই প্রচলিত পাঠ ভুল। প্রাচীন আচার্য্যগণ উহাকে বিনা সন্দেহে শুদ্ধ বলিয়া করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। সেই হেতু নানা প্রকারে কষ্টকল্পনা করিয়া এবং গৌজা দিয়াও উহার অর্থসামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই। আধুনিক টীকাকারের কল্পনা আ উদ্ভট। সত্য বটে, ঐ পাঠ অনেক পুরাতন। টীকাকার নীলকণ্ঠ স্থরি ১৫০০ প্রায়কালে জীবিত ছিলেন। স্তুরাং প্রায় চারি শত বৎসর ধরিয়া উহা প্রচলিত আছে। তথাপি অর্থসামঞ্জস্য হয় না বিধায় উহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। উহাকে প্রকারে সংশোধন করা যায়। যথা,—

(১) “পার্থঃ পঞ্চদশকৈব বর্ষাণি শ্বেতবাহনঃ।”

(২) “পার্থঃ হি পঞ্চ চৈকক বর্ষাণি শ্বেতবাহনঃ।”

ইহাদের যে-কোনটি দ্বারা অর্থসঙ্গতি হয়। “পঞ্চ চৈকক”=১৫, এই প্রমাণ ‘মহাভারতে’ আছে। আমরা ইতিপূর্বে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি।^{৮৫} এই প্রমাণ সংশোধনে মূলের ছন্দোভঙ্গ হয় না।^{৮৬} প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে, প্রচলিত পাঠ ও আমাদের সংশোধিত পাঠের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। লেখকের ভ্রমে “পঞ্চদশকৈব” বা “হি পঞ্চ চৈকক” স্থলে “পঞ্চ চ যষ্টিক” হওয়া অসম্ভব নহে। তাহাতে মনে হয়, সংশোধিত পাঠদ্বয়ের একটি আদিত ‘মহাভারতের’ প্রকৃত পাঠ ছিল। লেখকদোষে উহা প্রচলিত পাঠে পরিণত হইয়াছে।

রাজস্বয় যজ্ঞ হইতে চৌদ্দ বৎসরে, স্তুরাং উত্তরগোগৃহযুদ্ধের কয়েক মাস পরে মহাযুদ্ধ বাধে। তাহার ছত্রিশ বৎসর পরে মহাবীর অজ্জুন মহাপ্রস্থান করেন। ‘মহাভারতে’ উহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। নরসিংহ স্বামী লিখিয়াছেন, মহাযুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির ১৫ বৎসর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাধীন থাকিয়া এবং ৩৬ বৎসর স্বতন্ত্রভাবে, মোট ৫১ বৎসর রাজত্ব করেন।^{৮৭} এ কথা সত্য নহে। মহাযুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরেই যুধিষ্ঠির রাজ্য ত্যাগ করত মহাপ্রস্থান করেন। কুরুক্ষেত্রমহাযুদ্ধের অবসানে পুত্র-শোকাতুরা গান্ধারী কৃষ্ণকে অভিষাপ দিয়াছিলেন যে,—

“অমপ্যুপস্থিতে বর্ষে ষট্‌ত্রিংশে মধুসূদন।

হতজ্ঞাতিহঁতামাত্যো হতপুত্রো বনেচরঃ ॥

কুংসিতেনাভ্যুপায়েন নিধনং সমবাপ্যসি ॥^{৮৮}

৮৫। ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,’ ১৪৪৩ বঙ্গাব্দ।

৮৬। প্রচলিত পাঠের ছন্দোও নির্দোষ। প্রাচীন ব্যাখ্যাভূগণ যে উহাকে সন্দেহ করেন নাই, তাহার একটি কারণ ইহা হইতে পারে।

৮৭। S. P. L. Narasimha Swami, “The Kaliyuga, Yudhisthira and Bharatayuddha Eras,” *Ind an Antiquary*, Vol. 40, pp. 167, ৮৮। জীপর্ক, ২৩।৪৪।

‘হে মধুসূদন! ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর সমুপস্থিত হইলে তুমিও নিশ্চয়ই জাতি, অমাত্য, পুত্রহারা হইয়া বনচারী হওত অতি কুৎসিত উপায়ে নিধন প্রাপ্ত হইবে।’ ঐ শাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলিরাছিল। বস্তুতই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ হইতে ছত্রিশ বৎসরে বুধি-মদের নেশায় উন্নত হইয়া আত্মকলঙ্ক ধংস হয়। তদৃষ্টে নির্বিগ্ন হইয়া কৃষ্ণ তপস্যার্থ বনে গমন করেন।^{৪০} তথায় ব্যাধশরে আহত হইয়া দেহত্যাগ করেন।

“ষট্‌ত্রিংশেহত ততো বর্ষে বুধীনাগমনয়ো মহান।

অত্রোন্মত্তং মুখলৈন্তে তু নিজম্নঃ কালচোদিতাঃ ॥”^{৪১}

“বিমূশমেব কালং তং পরিচিন্ত্য জনার্দনঃ।

মেনে প্রাপ্তং স ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষং বৈ কেশিসূদনঃ ॥

পুত্রশোকান্ধিসন্তপ্তা গান্ধারী হতবাক্‌ববা।

যদন্তব্যাজহারাত্তা তদিদং সমুপাগমং ॥”^{৪২} ইত্যাদি।

ঐ ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসরে হস্তিনাপুরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিবিধ দুর্নিমিত্ত দেখিয়া কোন ইর্ষ্যানার আশঙ্কা করিতেছিলেন।

“ষট্‌ত্রিংশে তথ সম্প্রাপ্তে বর্ষে কৌরবনন্দনঃ।

দদর্শ বিপরীতানি নিমিত্তানি যুধিষ্ঠিরঃ ॥”^{৪৩}

যুদ্দিন পরে তিনি ঐ ভীষণ সংবাদ অবগত হন।

ঐ সংবাদ শ্রবণে নির্বিগ্ন হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সংসার পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে এবং অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ তিনি পত্নী ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে ধর্ম্ম কামনায় প্রব্রজ্যা করেন।^{৪৪} তাহার কিছুকাল পরে মহাবীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন মেরুপর্ব্বতের সন্নিকটে বালুকাময় ভূমিতে দেহত্যাগ করেন।^{৪৫}

কৃষ্ণের দেহত্যাগের কত কাল পরে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করেন এবং তদনন্তর কত ময়ে অর্জুন প্রাণত্যাগ করেন, এবার তাহা আলোচনা করা যাইবে। ‘মহাভারত’ হইতে ঐ বিষয়ে কি সন্ধান পাওয়া যায়, দেখিতে হইবে। কুরুপাণ্ডবের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে হার প্রামাণ্যই সর্বাপেক্ষা অধিক। সাংক্ষাৎভাবে ‘মহাভারতে’ ঐ বিষয়ে কিছু লিপিবদ্ধ নাই। স্তবরাং পরোক্ষ উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

‘মহাভারতে’ বিবৃত আছে, কৃষ্ণের দেহত্যাগের সপ্তম দিবসে (“সপ্তমে দিবসে প্রায়াৎ”) অর্জুন অন্ধক ও বুধিবংশীয় কালকবালিকা এবং নারীগণকে লইয়া দ্বারকা হইতে যাত্রা

৪০। বনযাত্রার পূর্বে কৃষ্ণ বহুদেবকে বলেন, —“নাহং বিনা যজ্ঞভির্বাদবান্যঃ পুরীমিমাশকং দ্রষ্টুং সত্ত্ব।

তপশ্চরিয়ামি নিবোধ তমে রৌমেন সার্কঃ বনমভ্যুপেত্য ॥”—মৌঘল পর্ব, ৪১০

৪১। মৌঘল পর্ব, ১১৩।

৪২। ঐ, ১১১।

৪৩। মহাপ্রস্থানিকপর্ব, প্রথম অধ্যায়।

৪৪। ঐ, ২১২—১।

৪৫। ঐ, ২১৮।

করেন।^{৫৫} পঞ্চনদের পথে আসিতে দস্থ্যরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। কতিপয় হত্যা করে এবং কতিপয়কে ধনরত্ন সহ লুণ্ঠন করে। অবশিষ্ট লোকজন সমভিব্যাহা তিনি কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। এবং তথায় তাঁহাদিগের বাসস্থান নিশ্চয় করিয়া দেন। কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থরাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়।^{৫৬} এসময় ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া বিষাদকাতর অর্জুন মহর্ষি ব্যাসের দর্শনার্থ তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানের পর মহর্ষি বলেন, এখন তোমাদের সংগ্রহ হইতে যাওয়ার সময় আসিয়াছে।

“গমনং প্রাপ্তকালং ব ইদং শ্রেয়স্করং বিভো।”^{৫৭}

অর্জুন তৎপূর্বেই উহা বুঝিয়াছিলেন। দ্বারকা থাকিতেই তিনি বহুদেবের নিকট প্রকাশ করেন।

“রাজঃ সংক্রমণে চাপি কালোহয়ং বর্ততে ধ্রুবম্।

তমিমাং বিদ্ধি সম্প্রাপ্তং কালং কালবিদাং বরঃ॥”^{৫৮}

ব্যাসাশ্রম হইতে অর্জুন হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার মুখে বৃষ্ণিবংশীয় আত্মকলহে নিধন ও কৃষ্ণের দেহত্যাগের বার্তা শ্রবণ করিয়াই মহারাজ যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান সঙ্কল্প করেন। প্রথমে অর্জুন, পরে অপর ভ্রাতৃগণের সমক্ষে তিনি উহা প্রকাশ করে। তাঁহারা বিনা আপত্তিতে তাহাতে সম্মত হন। তখন পরীক্ষিতংকে সিংহাসনে বসাই পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ ধর্ম্মার্থে প্রব্রজ্য করেন (‘‘প্রব্রজন ধর্ম্মকাম্যয়া’’)।

অর্জুনের দ্বারকা হইতে যাত্রার পর মহাপ্রস্থান পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণ কোন কাজে দীর্ঘস্থততা করিয়াছিলেন, মনে হয় না। সমস্ত কাজ তাঁহারা যথাসম্ভব সত্বর সম্পাদন করিয়াছিলেন। কেন না, কৃষ্ণবিরহে তাঁহারা সংসার শূন্য বোধ করিতেছিলেন। প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলেন।^{৫৯} সেই হেতু সংসার ছাড়িয়া যাওয়ার জন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ অবস্থায় কোন কাজে বৃথা সময়ক্ষেপ সম্ভব নহে। এ সকল বিচার করিয়া বলা যাইতে পারে যে, কৃষ্ণের দেহত্যাগ হইতে মহাপ্রস্থান পর্য্যন্ত ছয় মাস না হয় বৎসরেক সময় লাগিয়াছিল, ততোধিক নহে। ‘ভাগবতে’ আছে, অর্জুনের হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকায় গমন এবং পুনরায় হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত মোট সাত মাস লাগিয়াছিল।^{৬০} এই উক্তি কতটা নির্ভরযোগ্য, বলা যায় না। কেন না, কাহিনী হিসাবে ‘মহাভারত’ এবং অপর পুরাণের সঙ্গে ‘ভাগবতে’র এ সম্বন্ধে বহু পার্থক্য আছে।^{৬১}

৫৫। মৌষলপর্ব, ৭।৩২।

৫৬। মৌষলপর্ব, ৭ম অধ্যায়।

৫৭। ঐ, ৮।৩২।

৫৮। ঐ, ৭।৪।

৫৯। অর্জুন পরমর্ষি ব্যাসকে বলিয়াছিলেন,—

“ন চেহ স্বাত্মমিচ্ছামি লোকে কৃষ্ণবিনাকৃতঃ।”—(মৌষলপর্ব, ৮।১৫)

৬০। ‘ভাগবত’, ১।১৪।৭।

৬১। যথা, ‘ভাগবতে’ বিবৃত হইয়াছে যে, বিদুর তীর্থযাত্রায় গমন করিয়া বহুকুলধ্বংস দেখিয়া আসিয়াছিলেন (‘‘যথাস্থিত’’), কিন্তু যুধিষ্ঠিরের নিকট তাহা গোপন করেন (১।১৩।১২); যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের

টক, আলোচ্য স্থলে সাত মাস লাগা বেশী মনে হয় না। তৎপরে পরীক্ষিতের ভিত্তিতে ইত্যাদি ব্যাপারে তিন চারি মাস অতীত হইয়াছিল ধরিলে, পাণ্ডবা যায়, দেহভ্যাগের সাত আট মাস পরে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করেন।

বকলাদি ধারণ করতঃ সম্যাসীর বেশে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করেন এবং যোগযুক্ত অ্যাসধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে বহু দেশ, নদী ও সাগর পর্য্যটন করেন।

“যোগযুক্তা মহাত্মানস্ত্যাগধর্ম্মমুপেযুঃ।

অভিজগ্মূর্বহুন্ দেশান্ সরিতঃ সাগরাস্তথা॥” ৬২

স্তিনাপুর হইতে তাঁহারা পূর্বাভিমুখে যাত্রা করেন। ক্রমে “লৌহিত্য সাগরে”র তীরে ত হন। নীলকণ্ঠ মনে করেন, উদয়াচলপ্রান্তস্থ সাগরই লৌহিত্য সাগর। তাহা হে। ‘মহাভারতে’ই আছে, লৌহিত্য নদীবিশেষ। মহাকবি কালিদাসের ‘রঘুবংশে’ও া নদীর উল্লেখ আছে।^{৬৩} বর্তমান ব্রহ্মপুত্র নদেরই প্রাচীন নাম লৌহিত্য। দা পাণ্ডবগণ পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহারা দক্ষিণ ানতে থাকেন। তদনন্তর লবণসমুদ্রের উত্তর তীর দিয়া পাণ্ডবগণ ক্রমশ দক্ষিণ- াভিমুখে গমন করেন। অতঃপর আবার আবর্তন করতঃ পশ্চিম দিকে গিয়া, সমুদ্র- াবত দ্বারকা নগরী সন্দর্শন করেন। তথা হইতে পুনরায় ঘুরিয়া তাঁহারা উত্তর দিকে াকরিতে থাকেন। যোগধর্ম্মী পাণ্ডবগণ এইরূপে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে ইচ্ছা াছিলেন। (“প্রদক্ষিণাং চিকীর্ষন্তঃ পৃথিব্যা যোগধর্ম্মিনঃ”)। অতঃপর বরাবর া দিকে চলিতে চলিতে তাঁহারা হিমালয় পর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উহা াক্রম করিতে করিতে তাঁহারা “বালুকার্ণব” ও মেরুপর্বত দেখিতে পাইলেন।

“দদৃশুর্যোগযুক্তাশ্চ হিমবন্তং মহাগিরিং॥

তং চাপ্যতিক্রমন্তস্তে দদৃশুর্বালুকার্ণবম্।

অবৈক্ষন্ত মহাশৈলং মেরুং শিখরিণাং বরম্॥”^{৬৪}

ঐ স্থলে তাঁহারা তাড়াতাড়ি চলিতেছিলেন। সেই সময়ে দ্রৌপদী ধরাতে লিত হন। ক্রমে যুধিষ্ঠির ব্যতীত অপর পাণ্ডবগণও পথভ্রষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। ষ্টর স্বর্গারোহণ করেন।^{৬৫}

এই বর্ণনা পড়িয়া অনায়াসে প্রতীতি হয় যে, পাণ্ডবগণ সমগ্র উত্তরভারত ক্ষণ করিয়াছিলেন। মূল আছে, তাঁহারা “পৃথিবী” প্রদক্ষিণ করিতে মানস করিয়া-

মথুরার রাজা করেন (১১৫৭৩৯)। কিন্তু ‘মহাভারত’র মতে, যদুকুলনাশের প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে দেহভ্যাগ করেন; বজ্র ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হন। ‘ভাগবত’র অন্তর্ভুক্ত (১১৩০।৪৮; ১১৩১।২৫) আছে, ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যাভিষিক্ত করা হইয়াছিল। স্তরং এ বিষয়ে ‘ভাগবত’ আত্মবিরোধ করিয়াছে। অধিক াদর্শন করা নিপ্রয়োজন।

৬৩। মহাপ্রস্থানিকপর্ব, ১।৩০।

৬৩। রঘুবংশ, ৪।৮১।

৬৪। মহাপ্রস্থানিকপর্ব, ১।১-২।

৬৫। ঐ, ১-২ অধ্যায়।

ছিলেন। আর্য্যাবর্তকেই পৃথিবী বলা হইয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে তাঁহারা যাহা দক্ষিণাত্যে গমন করিয়া থাকিলে তাঁহাদিগকে পশ্চিম দিকে যাত্রার পর দ্বারকা পৌঁছাইয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে বা প্রায় উত্তর অভিমুখে চলিতে হইত। কিন্তু বর্ণিত হইয়াছে তাঁহারা বরাবর পশ্চিম দিকে চলিয়াই দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখান হইতে উত্তরাভিমুখে আবর্তন করেন। হিমালয় অতিক্রম করতঃ তাঁহারা মেরুপর্বতের সন্ধি “বালুকার্গবে” গিয়াছিলেন। মধ্য এশিয়ার বালুকাময় মরুভূমি ব্যতীত এ বালুকার আর কিছু নহে। মেরুপর্বত মধ্য এশিয়াতেই। তাঁহারা এ স্থলে শীঘ্র শীঘ্র করিতেছিলেন (“গচ্ছতাং শীঘ্রং”) বলাতে এ অল্পমান আরও দৃঢ় হয়। উত্তপ্ত মরুভূমি যাত্রীদিগকে তাড়াতাড়িই পথ অতিক্রম করিতে হয়। এইরূপে দেখা যায়, মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতে মেরুপর্বতের সন্নিহিতে প্রাণত্যাগ করেন।

সমগ্র উত্তরভারত প্রদক্ষিণপূর্বক হিমালয় অতিক্রম করতঃ মধ্য এশিয়ায় গমন করা অবশ্যই দীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল। পদব্রজেই তাঁহারা পর্যটন করিতেছিলেন। কোথা বিশ্রাম না করিয়া বরাবর চলিতেছিলেন, এরূপ মনে করার কোন হেতু নাই। তাড়াতাড়ি করার কোন প্রয়োজনও ছিল না। কোন নির্দিষ্ট কালের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট পৌঁছিবার লক্ষ্যও তাঁহাদের ছিল বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। ধর্ম্মার্জনের অভিপ্রায়ে তাঁহারা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন (“প্রব্রজন্ ধর্ম্মকাম্যয়া”)। স্ততরাং স্থানে বিশ্রাম করতঃ সাধন ভজন করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। করাই স্বাভাবিক। অধিকন্তু বালুকার্গবে পৌঁছিয়া শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতেছিলেন বলাতে বুঝা যায় যে, তৎপূর্বে তাঁহারা শীঘ্র গমন করেন নাই। স্ততরাং মহাপ্রস্থানের পর অন্তঃ অন্ততঃ তিন চারি বৎসর জীবিত ছিলেন, বলা যাইতে পারে। ঐ সময়ের কমে স উত্তরভারত পদব্রজে প্রদক্ষিণ করত মেরুপর্বত পর্য্যন্ত পৌঁছা যায় কি?

এইরূপে অজ্ঞানের জীবিতকালের নিম্ন হিসাব পাওয়া যায়,—

জন্ম	হইতে	থাণ্ডবদাহ	পর্য্যন্ত = ৩৩ বৎসর
থাণ্ডবদাহ	„	উত্তরগোগৃহ যুদ্ধ	„ = ১৫ বৎসর (প্রায়)
উত্তরগোগৃহযুদ্ধ	„	কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ	„ = ২ „ „
কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ	„	মহাপ্রস্থান	„ = ৩৬ „ „
মহাপ্রস্থান	„	দেহত্যাগ	„ = ৩ „ „
জন্ম	হইতে	দেহত্যাগ	পর্য্যন্ত = ৮৭ বৎসর (প্রায়)

শ্রীবিভূতিভূষণ-দ